উপন্যাস বিচিত্রা
২

জলতরঙ্গ : অশোক গুহ
যে ফুলে কাঁটা নেই : রণজিৎকুমার সেন
মন-মহুয়া : দক্ষিণারঞ্জন বসু

পরিবেশক
ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭০

প্রকাশিকা
শান্তি দেবী
সুকান্ত প্রকাশন
১৫৭ বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

মুদ্রক
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দুপালিত লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

পাকিস্তানের পরিবেশক
নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলাবাজার, ঢাকা

দাম ৪'০০

জলতরঙ্গ

অশোক গুহ

॥ এক ॥

সিঁড়ি।

সরু সিঁড়ি। সিঁড়ির ঘূর্ণা।

ধাপের পর ধাপ উঠে গেছে। তারপর মোড় ঘুরেছে। ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে উর্ধ্বে।

সিঁড়ির সুমুখে এসে দাঁড়াল কমল আর অনীতা।

অনীতা তাকালে। সরু ধাপের ধাঁধা। শুধু ঘোর আর প্যাঁচ।

এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে? অনীতা বললে।

হ্যাঁ, এই সিঁড়ি পার হলেই স্বর্গ, কমল হাসলে।

কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি এত সরু?

হ্যাঁ, স্বর্গ আছে বলেই তো সরু। চেটালো সিঁড়ি স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে না। এই সিঁড়ির বন্ধুরতা পার হলেই তুমি স্বর্গে উঠবে।

কণ্ট্রাক্টরদের কিন্তু বাহাদুরি আছে, বেশ সিঁড়ি ফুটিয়েছে।

বাহাদুরি না থাকলে কি চলে! কমল আবার হাসলে। ওরা আলাদীনের প্রদীপটাকে কেড়ে নিয়েছে। দু-তিন কাঠা জমির উপর মস্ত ইমারত ফাঁদছে।

ইমারত না হাতি—পায়রার খুপরি! অনীতা মুখ বাঁকালে।

এই জনারণ্যে পায়রার খুপরিই তো আমাদের কামনা। সেখানেই তো আমরা নীড় বাঁধি। বাদাকশানের চুনী-পান্না হয় তো সেখানেও মেলে।

থাক—তোমার আর কবিত্ব করতে হবে না! অনীতা হাসলে, এখন চল তো!

রামখেলাওন বিহারী দরোয়ান। গাঁট্টাগোট্টা। সে এর মধ্যে চাবির থোলো নিয়ে হাজির হল।

ভাঙা বাংলায় বিহারী বুলি মিশিয়ে বললে, আইয়েন বাবুজী!

সে আগে আগে চলল, পিছনে কমল আর অনীতা।

একতলার ঘোরালো পথটা এসেছে দোতলায়, দোতলা থেকে তেতলায় চলে গেছে। তেতলা থেকে বুঝি চারতলায়।

সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মতো। সিঁড়ি আর সিঁড়ি।

বাবাঃ, এ যে কুতুবের সিঁড়ির চেয়েও বেশি! অনীতা বললে।

কুতুব সে দেখেছে কয়েকবার, সেইটেই জাহির করলে।

কমল হেসে বললে, আমি ঘরকুনো, কুতুব দেখিনি। তবে মনুমেণ্টের সিঁড়িটায় উঠে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে পারতাম বটে, কিন্তু ওটা আমার ধাতে নেই।

এবার তো ধাতস্থ হলে—অনীতা বললে।

তা স্বর্গে যখন বাসা করতে যাচ্ছি, আরো কত ব্যাপারে ধাতস্থ হতে হবে।

তাই না কি—মনে থাকে যেন! আর কত বাকি! কথাটা একটু জোরেই বলে ফেললে অনীতা।

রামখেলাওন হেসে বললে, আর তো বেশি বাকি নেই মাইজী —এই তো।

সত্যিই, ওরা তাকিয়ে দেখলে, সত্যিই সিঁড়ি এসে চারতলায় মিশেছে, তারপরেও সিঁড়ি আছে—তবে তা ছাদের। সেখানে দরজা খোলা। মুক্ত আকাশের স্পর্শ সেখানে মেলে। তারই আলোর তরঙ্গ বুঝি চোখ ঝলসে দিলে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে অনীতা, যাহোক, বাঁচা গেল। এই তাহলে—

হ্যাঁ, এই স্বর্গ! কমল কথাটা শেষ করলে।

আমি যে স্বর্গের রানী, একথা ঠাওরালে কি করে ঐ দরোয়ান? কনুই দিয়ে কমলকে একটু ঠেলে বললে অনীতা।

রানীকে কি চিনিয়ে দিতে হয়, তিনি নিজেই চেনান বলনে-চলনে।

যাও। অনীতা একটু মুখ বাঁকালে।

রামখেলাওন এরই মধ্যে দরজার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের চাবির থোলো থেকে একটা চাবি নিয়ে তালায় লাগাচ্ছে।

কমল আর অনীতা কাছে এল।

একেবারে স্বর্গের দ্বারে দু-জনে।

স্বর্গের দ্বারে উঠে এল দু-জনে। তা আজকাল ফ্ল্যাটবাড়িই স্বর্গ। সেখানেই তো নাগরিক-নাগরিকারা স্বর্গ রচনা করে। নন্দনকানন ঘেরা স্বর্গ তো দূরে, ভূস্বর্গও দূর অস্ত। তাই এই তাদের স্বর্গ।

স্বর্গের দ্বারপাল রামখেলাওন তালায় চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিলে।

আইয়ে!

দু-জনে এসে ঢুকল।

চারিদিকে বদ্ধঘরের সোঁদা গন্ধ। তার সঙ্গে মিশেছে নতুন কলি-ফেরানোর খোশবায়। বোধ হয় বার্নিশের উগ্রতাও জড়িয়ে আছে।

রামখেলাওন এখানে-ওখানে দরজা জানালা খুলে দিলে। আর ওরা তার অনুসরণ করলে।

দুখানি ঘর নিয়ে ফ্ল্যাট, একটা রান্নাঘর আছে, একটা বাথরুম। সবই মডার্ন বন্দোবস্ত। কিন্তু সবই ছোট।

এতো ফ্ল্যাট নয়, ক্যাশবাক্স। অনীতা সব দেখে-শুনে মন্তব্য করলে।

যা বলেছ, ঠিক আমার ঠাকুমার ক্যাশবাক্সটির মতো বড় আঁটো-সাঁটো। জবাব দিলে কমল।

তা হোক, এতেই আমি স্বর্গ তৈরি করব। খেলনার বাক্সে অমন কত স্বর্গ বানিয়েছি।

সে পুতুলের স্বর্গ। কমল হাসলে।

তা সংসারও তো পুতুলের খেলাঘর।

তুমি আবার কাব্য করছ অনীতা? কমল বললে।

তা করব বই কি। কাব্যই এই ক্যাশবাক্সকে স্বর্গ বানাতে পারে, অন্য কিছু নয়।

অনীতা চারিদিকে আবার ঘুরপাক খেলে। কমল পেছনে গাধাবোটের মতো চলল।

ভাড়া ফ্ল্যাটের পক্ষে চড়া কিন্তু নীড় বাঁধতে হলে চড়া মাসুলই দিতে হয়। আর তারা তা দেবেও। দরোয়ান রামখেলাওনকেও খুশী করে দিতে হবে। তাতে সঞ্চিত পুঁজির প্রায় সবখানিই যে উবে যাবে, তা এখন একজনও ভাবছে না।

অনীতা হাল ফ্যাসানের মেমেলি হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বের করলে একখানা ছোট্ট নোটবুক। একটা স্টেইনলেস স্টীলের পার্কার পেন্সিলও বেরিয়ে এল।

কমল শুধালে, ওকি নোটবুক বের করছ কেন?

স্বর্গ তো আর এমনি এমনি গড়া চলে না, দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন চাই, নানা সরঞ্জাম চাই।

দাঁড়াও, আগে টাকাটা গুনে দিয়ে রিসিট নিয়ে আসি।

তুমি যাও, আমি বসে ফর্দ করি। তুমি এলে এখান থেকেই কিনতে বেরুব।

একা এই ঘরে থাকতে পারবে?

পারব না? সারা জীবনটা একা কাটালাম এক ঘরে।

বটে! তাই বুঝি দোসর জোটাবার সাধ গেল?

তা নয় তো কি! আর বোর্ডিং ভাল লাগে না। আমি আর ফিরব না গো, ফিরবো না!

গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল অনীতা।

কিন্তু এখানেই বা থাকবে কি করে?

কেন ?

রামখেলাওন বাথরুমে ঢুকেছিল কি কাজে, সে বেরিয়ে এল।

সে বললে, বাবু, পসন্দ হইল ?

হ্যাঁ, অনীতা বললে, এখন বাবু তোমার সঙ্গে গিয়ে আগাম ভাড়াটা দিয়ে আসবেন। আমরা আজ থেকেই এ ফ্ল্যাট নিলাম, এখন থেকেই নিলাম, তুমি তোমার ঘরে যাও, আমরা আসছি।

রামখেলাওন চলে গেল, যাবার সময় বললে, ঐ তালা-চাবি রইল বাবু।

আচ্ছা, আচ্ছা। অনীতা দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে।

তারপর মেঝেয় বসে পড়ল কাঞ্জিভরমের মায়া ত্যাগ করে, বললে, কি যেন বলছিলে ?

কি ? কমল দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে শুধালে।

সেই যে এখানে থাকার কথা ?

ওঃ—এখনো তো বিয়ে হয় নি !

না হয়েছে তো কি হয়েছে, অনীতা হাসলে, গন্ধর্ব বিবাহ তো অনেক দিন হয়ে গেছে। রেজিস্ট্রীটা—তা একদিন সেরে নিলেই হবে।

না, না ! মাথা নাড়লে কমল।

বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালে অনীতা।

তার মানে ?

মানে—তোমার আমার আত্মীয়-স্বজনের কথা বাদ দাও, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব তো আছে। তারা কত কথা বলবে।

তুমি বড় সেকেলে ! ঝক্‌ঝক্ করে উঠল অনীতার ক'টি দাঁত।

তা হিন্দুর ছেলে মাত্রই সেকেলে, নইলে অমন যে 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ, সেও বিমলার হাত ধরতে গিয়ে কেমন পায়ে হাত দিলে।

তুমি তো ফস্ করে কপালে হাত দিয়েছিলে। তুমি তো সেকেলে নও !

তা কি করব! কমল বললে, এক অফিসে কাজ করি, প্রায় পাশাপাশি বসি। মাঝে মাঝে নিজের কাজের বোঝা ঘাড়ে চাপায়। তাই অসুখের চিঠি পেয়ে দেখতে যেতে হয়েছিল দায়ে পড়ে।

হাঁগো মশাই, দায়ে পড়ে গিয়ে খাটের পাশে চেয়ার নিয়ে না হয় বসেছিলেন, দেড় টাকা সেরের ঝড়তি-পড়তি আঙুরের ঠোঙাটাও পাশে রেখেছিলেন। কিন্তু তাই বলে আঙুর খাইয়ে দিতে কে বলেছিল?

বলেছিলেন রোগিনী; ক্ষীণকণ্ঠে অনুনয় জানিয়েছিলেন। কমল উত্তর দিলে।

তাই অমনি গায়ে হাত দিয়েছিলে—না!

ছিঃ ছিঃ, ঠোঁটেই তো খাইয়েছিলাম, আঙুরের রস তো চেখে নিই নি। ঠোঁট ছোঁয়া কি গায়ে হাত দেওয়া!

বেয়াদপ কোথাকার! কৃত্রিম ক্রোধভরে কিল দেখালে অনীতা।

বটে, আমিও ঘুষি দেখাতে পারি! কমল জানালে।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

কেন—আজকাল নতুন থিয়োরী জান তো, যত চটা তত—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আবার রোয়াকবাজের মতো কথা শুরু করলে। অনীতার চোখে ভর্ৎসনার ছায়া।

কমল আর ঘাঁটাতে চায় না, তাই সে হাতজোড় করে বললে,

অপরাধ করিয়াছি
হুজুরে হাজির আছি
ভূজপাশে বাঁধি কর দণ্ড।

কমল কাছে এগিয়ে এল, অনীতা বললে, যাঃ!

যাঃ মানেই হ্যাঁ। কমল হেসে বললে।

না গো না, ওকথা সত্যি নয়, অনীতা ঝংকার তুললে। যাঃ মানে যাঃ।

যাঃ মানে তাহলে হ্যাঁ হয় না ?

হয়। তবে বিয়ের আগে নয়।

তাহলে বিয়েটাই হয়ে যাক আজ। কমল বললে।

ওমা—কাউকে যে বলা হল না! আজ কি করে হবে ?

না হোক, তবু আজই বিয়ে হোক। নইলে আজ তো নীড় বাঁধা যাবে না।

মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল অনীতার, তোমার যেন আর তর সয় না।

সয়ই তো না।

কিন্তু ফর্দ ?

চুলোয় যাক ফর্দ। আগে বিয়ে করতে চল।

ওমা—এযে ওঠ্ মেয়ে তোর বিয়ে!

হ্যাঁ, তাই তো। টান মেরে অনীতার হাত থেকে কাগজ আর পেন্সিল কেড়ে নিয়ে হাত ধরে টেনে তুলল।

চেনাশোনা ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। তাই দরখাস্তের তারিখটা পিছিয়ে দিয়ে সেইদিনই বিয়ে দিয়ে দিলেন। তিনটি সাক্ষীরও অভাব হল না। কমলের দুই বন্ধু আর অনীতার একটি বান্ধবী সে-কাজ করলে। শুধু একটি গোল বেধেছিল। রজনীগন্ধা আর গোড়েমালা আর তবক মোড়া সন্দেশ অনেক আনা হয়েছিল, কিন্তু একটা জিনিস আনা হয় নি। সেটা কারো মনে ছিল না।

রেজিস্ট্রার হেসে বললেন, শুভবিবাহ তো হয়ে গেল, আংটি এনেছেন তো? এবার দুজনে দুজনকে পরিয়ে দিন!

কমল অনীতার মুখের দিকে তাকালে, অনীতা কমলের মুখের দিকে।

রেজিস্ট্রার আবার তাড়া লাগালেন, দিন, আংটি পরিয়ে দিন!

আজ্ঞে ভুলে আনা হয়নি! কমল লজ্জিত হয়ে জানালে।

ঐ তো আপনাদের দোষ, মুরুব্বীয়ানা চালে মাথা নাড়লেন রেজিস্ট্রার। বিয়ে করতে এসেছেন, আসল জিনিসটাতেই ভুল!

কমলের বন্ধু অসিত ভারি স্মার্ট। সে বললে, আংটি নেই বটে, মালা তো আছে। মালা বদল হোক! ঐটেই তো সাবেক রীতি। আংটি তো অনেক পরের আমদানী।

রেজিস্ট্রার গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তাই-ই দিন।

ছুটি গোড়েমালা পরস্পর পরস্পরের গলায় দান করলে। একটিতে তাজা একটা গোলাপ আর একটিতে একটি লাল পদ্ম। গোলাপে পদ্মতে মিলন হল।

অসিত বললে, এবার কিন্তু অস্ফুটে উলু দেওয়া চলে। এই বলে সে অনীতার বন্ধু রানী রায়ের দিকে তাকালে। রানী রায় তার কথায় আমল দিলে না। সে বি, এস্‌সি; বি, টি শিক্ষিকা। একটু রাশভারী। ইস্কুলের চৌহদ্দীর বাইরেও সে রাশ ঢিলে দেয় না। তাই একটু ঝাঁঝালো কটাক্ষই নিক্ষেপ করলে। অসিত নিবে গেল।

শুধু বৈদিক মন্ত্রের সার কথাটি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার পাখী-পড়া করে পড়িয়ে দিলেন—

বলুন—শ্রীমতী অনীতা দাশগুপ্তা, আমি তোমাকে আইনত বিবাহিতা পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম।

কমল তোতাপাখীর মতো আওড়ালে। বৈদিক মন্ত্রের সেই তুমি আমার সখা হও, আমি তোমার সখী হই, সে সব নেই। এ বড় বাস্তব, বড় কাটছাঁট। বৈদিক মন্ত্র হলেও অমনি আওড়াত।

আবার অনীতাকেও আওড়াতে হল, শ্রীমান কমল বসু, আমি তোমাকে আমার আইনসম্মত স্বামীরূপে গ্রহণ করিলাম।

তারপরে ছু-জনের স্বাক্ষর, সাক্ষীদের স্বাক্ষর।

গোধূলির আলো-ছায়া নেই, নেই শানাইয়ের তান। নেই

লাল চেলীর ঝলসানি, নারীদের কলধ্বনি, পুরোহিতের সেই মন্ত্র—

ওং মম তে হৃদয়ং দধতু।

আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ে মিলুক, আমার হৃদয় তোমার হোক!

এখন দুপুর। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। ঘন্টি দিতে দিতে চলেছে ট্রাম, হুস্‌হুস্‌ করে চলেছে বাস। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কামরায় খানিকটা রোদ এসে পড়েছে। পাখা ঘুরছে বন্‌বন্‌ করে। টেবিল চেয়ার আলমারি ফাইলে আপিসের আবহাওয়া। এখানে বিবাহ-মণ্ডপ নেই, নহবৎ বাজে না। তবু এই-ই আধুনিক বিবাহ। তাই গোড়েমালা, তাই রজনীগন্ধার ঝাড়, প্লেটে প্লেটে তবক মোড়া সন্দেশের স্তূপ।

এই কাটছাঁট বিবাহ। মডার্ন বিবাহ। বিবাহের অঙ্গ স্বাক্ষরিত ফর্মখানা রেজিস্ট্রার ভাঁজ করে এগিয়ে দিলেন অনীতার দিকে। যেন সন্ধির চুক্তিপত্র এগিয়ে দেওয়া হল জাঁকজমকে—হেসে বললেন,

এই আপনার হাতিয়ার।

কমল নীরব।

অনীতা হাত বাড়িয়ে নিলে।

হাতিয়ারই বটে! বিবাহের যে প্রাণ তা রইল এই কাগজে। যদি চিড়ফাট ধরে, সেদিন এই হাতিয়ার শাঁখের করাতের মতো কাটবে, দুভাগ করে দেবে। আইনে তার নাম বিচ্ছেদ। আইনত পৃথক হওয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ। ডিভোর্স।

অনীতার হাত কাঁপছে তবু সে নিলে হাতিয়ার। শুধু মনে মনে বুঝি বললে, এ হাতিয়ার যেন ট্রাঙ্কের তলায় থাকে, একে যেন বের করতে না হয়! হে ঈশ্বর!

হয়তো অত কথা মনেও হল না, সে যন্ত্রচালিতের মতো গ্রহণ করলে।

বিয়ে হয়ে গেল।

উলু দিতে জানে না অসিত, তার জিভ চলে, কিন্তু অমন করে নড়ে না। তাই আর একবার রানী রায়ের দিকে তাকাল। কিন্তু রানী রায় নির্বিকার। তিনি যে শিক্ষিকা এবং অতি গম্ভীর, সেকথা ভুলতে পারলেন না।

এবার নমস্কার জানিয়ে ওরা বেরিয়ে এল।

ট্যাক্সি ডাকতে হবে, তারপরে রেঁস্তোরা। সেখানে পোলাউ দিয়ে বিয়ের ভোজ জমবে ভাল। আর সঙ্গে মোরগমসল্লাম।

বিয়ের পুরুত ঠাকুর ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে দশটাকা দক্ষিণা দিলে অসিত।

দশ টাকা দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু অনেক রেজিস্ট্রার বেশি চান। বলেন, শুভ কাজে আরও কিছু না হয় খসালেন। কিন্তু ইনি যুবক, তার উপরে অতি স্মার্ট—অসিত টাকাটা দিতেই না দেখে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর ধন্যবাদ দিয়ে শুভ কামনা করলেন দম্পতির।

নীল আলো স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরি করেছে ঘরে।

নিশিগন্ধার গন্ধে ঘর গন্ধমদির।

নীরব ঘর, নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা ঘর।

কমল উঠে বসল। চোখ রগড়াল।

নীলমায়া ছেয়ে আছে ঘরে, কলি-ফেরানো সাদা দেয়ালেও নীল ছায়া। ড্রেসিং আলমারির আরশিখানায়ও যেন টলটল করছে ছায়া। রুপোলী ঢেউয়ে নীল দ্যুতি। সমস্ত ঘরই নীল। এমন কি দুধের মতো সাদা চাদরেও নীল সাগরের ঢেউ।

কমল স্বপ্ন দেখছে নাকি!

এ কোন ঘর?

মেসের চার সীটের ঘর তো নয়।

না, আবার চোখ রগড়ালে কমল।

এবার মনে পড়ল।

এ তাদেরই ফ্ল্যাট—অনীতা-কমলের তেতলার স্বপ্ন নীড়—স্বর্গ।

ঐ স্বর্গ রচনা করে দিয়ে গেছে মডার্ন ফার্নিশিং কোম্পানী ভাড়া-করা আসবাবে; এসেছে আলমারি চেয়ার, টেবিল, এমন কি ডবল বেড পর্যন্ত। ঐ যে সাদা ব্যাকেলাইটের ঝক্‌ঝকে রেডিও সেটটা, ওটাও কিস্তিবন্দীর মাল। ভাড়া আর কিস্তিবন্দীতেই মধ্যবিত্তের এই স্বর্গ গড়ে উঠেছে। শুধু এর মধ্যে ভাড়া বা কিস্তিবন্দী খরিদ নয় ঐ ভাসগুলো, আর ভাসের মধ্যে রজনীগন্ধার ঝাড়গুলো। আর কিস্তিবন্দী নয় অনীতা।

কমল হাসল—তারপর ফিরে তাকালে অনীতার দিকে।

বেচারী ঘুমিয়ে গেছে। সারা দিন গেছে ধকল। তারপর বিবাহ-বাসরের ধকল। বাসর জাগানিয়া নারীরা কেউ ছিল না। কিন্তু বন্ধু আর বান্ধবীরা এগারোটা পর্যন্ত হৈ-হৈ করে গেছে। কেউ বা গেয়েছে গান, কেউ বা দিয়েছে স্রেফ আড্ডা। চা-খাবার-সিগারেট-পান সে আড্ডায় স্টীম যুগিয়েছে। তারপর তাদের মনে পড়েছে, এই শহরে এগারোটার পরেই স্তব্ধ হয়ে যায় যান-বাহন। তখন সবাই দেখেছে হাত-ঘড়ি। যাদের ঘড়ি নেই, তারা অপরের ঘড়ির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মুখে হতাশাও ঘনিয়ে এসেছে। তারপরে জল্পনা চলেছে, কোন দিকের কে যাত্রী; ট্যাক্সি নিলে ক'জন যেতে পারবে। তারপর তাড়াহুড়ো করে বিদায়।

তাদের বিদায় দিয়ে এসেছে কমল ও অনীতা। বাড়ির গেট অবধি যায় নি, দরজা থেকেই বিদায় দিয়েছে। সবাই তাতেই খুশী। এই তাড়াহুড়োর সময়ে আবার ফটকের সুমুখে দাঁড়িয়ে গেঁজানো চললেই হয়েছে আর কি! শুধু সুমিতাই বলেছিল, নেমে আয় না! তোর যে আর তর সইছে না!

তা সারারাত তো আড়ি পাতবার কেউ নেই। চুটিয়ে প্রেম করিস!

যাঃ—হাই তুলে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলেছিল অনীতা।

যাঃ কি লো, তুই তো মুখিয়ে আছিস!

কি যে বলিস! আবার হাই তুলেছিল অনীতা।

যাঃ যাঃ শুয়ে পড়গে! তবে ঘুমুতে কি আর দেবে কমল?

কমল কথাটা শুনেছিল, আরো কেউ কেউ শুনে থাকবে। কিন্তু তাদের কান অবধি রক্ত ছুটে আসে নি। কমলের কান দুটো কেমন গরম গরম ঠেকছিল।

যাহোক মুখরা সুমিতা অনেক জ্বালিয়ে তবে বিদায় নিলে। তার ভাইয়ের তাড়ায়ই বিদায় নিতে হল।

অনীতা স্খলিত পদে একরকম টলতে টলতে ল্যাণ্ডিং থেকে এসে ফ্ল্যাটের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালে। কমলও মিনিট খানেকের মধ্যে এসে জুটল।

দরজাটা বন্ধ করতে হবে।

একবার আশেপাশে তাকালে কমল।

সিঁড়িতে শুধু বাতি জ্বলছে। করিডোর আঁধার। ফ্ল্যাটের সারের তেল-বার্নিশ খাওয়া দরজাগুলো বন্ধ। টুঁশব্দটি কোথাও নেই। হয়তো আছে, কানে আসছে না।

কমল বললে, চল!

দু-জনেই ভিতরে এল, দরজা বন্ধ হল।

অনীতা বললে, আমার ঘুম পাচ্ছে।

আজ রাতে ঘুম! In such a night as this! এমন—এমন রাতে!

আমি বড় ঘুম-কাতুরে! সলজ্জ হাসি হাসলে অনীতা।

আমারও খুব ঘুম। কিন্তু একটু তো জাগতে হবে লক্ষ্মীটি!

আগে তো শুয়ে পড়ি—বলে অনীতা সটান গিয়ে ডবল বেডের এক কোণে ভেঙে পড়েছিল।

কমল কাছে এসে তার চুলে বিলি কেটে বলেছিল—

অনী—অনু!

একটু ঘুমোও! ঘুমন্ত হাসি ঠিকরে পড়েছিল অনীতার ঠোঁট থেকে।

ঘুমোব?

হ্যাঁ।

তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোব?

না গো, এখন নয়! অনুনয় করেছিল অনীতা। তার চেয়ে একটা ছোট্ট হামি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

অগত্যা তাই।

মুখ নামিয়ে এনেছিল কমল অনীতার মুখের কাছে।

প্রথম দিন আঙুর খেতে খেতে যেমন অনীতা জ্বরের ঘোরে চুমু খেয়েছিল হাতের আঙুলে, ঠোঁটে, তেমনি হাল্‌কা চুমু। ফুর ফুর করে যেন একটা প্রজাপতি উড়ে গেল। কমল তৃপ্ত হয়নি। সে পরিপূর্ণ চুম্বন এঁকে দিলে।

হেসে বলেছিল অনীতা—উঃ, দম বন্ধ হয়ে গেল!

কমল ঠোঁট তুলে নিলে।

অনীতা তার হাত ধরে বললে, আর নয়! এখন ঘুমোও! কাল—

সে ঘুমিয়ে পড়ল। নাক ডাকে না অনীতার।

শুধু নাকের বাঁশীটা ফুলে ফুলে ওঠে, কেমন যেন হিস্‌হিস্ শব্দ হয়। ঠোঁট দুখানা একটু খুলে যায়।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে কমল। তারপর সেও শুয়ে পড়ল।

ঘুম সহজে আসে নি। পাশে নারী, পুরুষের ঘুম কি আসে! তায় আবার সেণ্টের গন্ধ ম-ম করছে।

কমল বাথরুমে গিয়ে মাথায় কানে জল বুলিয়ে এসেছিল। কাচের পল-কাটা সোরাই থেকে জল খেতেও ভোলে নি। তারপরে সাদা ভেড়া গোনা।

কোথায় যেন পড়েছিল কমল। ঘুম যখন আসবে না, ধবধবে সাদা ভেড়ার পাল চোখ বুজে ভাবতে হবে। এক, দুই করে গুনতে হবে, গুনতে-গুনতেই জুড়িয়ে যাবে শরীর, ঘুম নামবে চোখে। জীবনে বহুবার এমনি করে সে ঘুম নামিয়েছে চোখে। এবারও নামিয়েছিল।

কিন্তু সাড়ে-তিনটে-চারটেয় ঘুম কোনোদিনই তার চোখে থাকে না।

আজও রইল না।

কাছেই ট্রাম-ডিপো। সেখানে ট্রামের বেরুবার আগেই প্রস্তুতি। ঘন্টির শব্দ।

গঙ্গা-স্নানার্থীরা এখন স্টপে স্টপে দাঁড়িয়ে আছে, ময়দান-ভ্রমণকারীরাও তাই। আবার হয় তো আছে কোন ট্রেন যাত্রী, কি কারখানার শ্রমিক।

কমল দু-একদিন প্রথম ট্রামের সোয়ারী হয়েছে, সে জানে।

হঠাৎ তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। একখানা হাত এসে পড়েছে তার বুকের উপর। কাঁটাল-কাঁটা কঙ্কনের ধারালো খাঁজ লাগছে। কমল চমকে উঠল।

অনীতা!—আর কেউ নয়!

সে বুকের উপর হাতখানা আল্‌তো করে চেপে ধরল।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি। হিমেল হাওয়া দিয়েছে। শেষ রাতে একটু একটু শীত করে। তাই উষ্ণ হাতের স্পর্শ পেয়ে অনীতা কাছে এল, কমলকে জড়িয়ে ধরল।

কমল ডাকলে, অনু!

উঁঃ—ঘুমের ঘোরে ঝরে পড়ল অনীতার স্বর!

নলিনী খোল গো আঁখি। কমল গেয়ে উঠল।

এখন খুলতে পারব না, একটু ঘুমোতে দাও!

কমল আর কিছু বললে না!

অনীতার বাহুবন্ধনে সে আবদ্ধ, তার দেহের সুগন্ধিতে তার দেহ বিবশ। কমলেরও চোখ মুদে এল।

॥ দুই ॥

স্বর্গ রচনা শুরু হয়ে গেল।

অনীতা ছুটি নিলে।

কমলকে সে বললে, অনেক ছুটি পাওনা। দু-মাস নিলাম, আমি বাপু সিঁদুর পরে তোমার পাশে গিয়ে বসতে পারব না!

কমল বললে, তাহলে সার্কেল টুতে বদলি হও।

তারই চেষ্টা করতে হবে, আমি বলেওছি।

কেন—স্বামী-স্ত্রীতে পাশাশাশি বসলে এমন কি বেমানান?

না গো, এমনিই তো পাশাপাশি আছি। অনীতা ঝংকার তুললে।

সবার সামনে পারবে না?—এই তো?

ওরা ঠাট্টা করবে।

কিন্তু অফিসের পরে গিয়ে সার্কেল-টুতে ধরনা দিতে হবে তো?

তা তো দিতেই হবে, অনীতা হাসলে, ওটা তো কর্তব্য।

স্ত্রৈণ স্বামীর কর্তব্য, তায়িত স্বামীর কর্তব্য। কমল বুঝি বা বিদ্রূপ করল।

তার মানে?

মানে কি—যে স্বামীকে ডিমের মতো তা দিয়ে রাখে স্ত্রী। এক কথায় হেনপেকড্।

তা তুমি না হয় তায়িত স্বামী হলে, তোমাকে না হয়, বুড়ো আঙুলের শাসনেই রাখলাম।

তা আমি রাজী।

মনে থাকে যেন, গরবড় হলে কিন্তু শাস্তি পেতে হবে।

তা শাস্তি তো পেতে রাজী। সে তো তোমার মুখের মধু।

যাঃ—অনীতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

অনীতা ছুটি নিয়ে স্বর্গ রচনা শুরু করে দিলে।

এটা কেনে, ওটা কেনে; নিজেই গড়িয়া হাট, আর নিউ মার্কেটে যায়। বড়বাজারে যেতে হলে সঙ্গে নেয় কমলকে। কিন্তু সে সাক্ষী-গোপাল। নিজেই দরদাম করে কেনে। আসবাব ভাড়া করেছে, কিন্তু রঙীন পর্দা, টেবিল ঢাকা, সোফার মখমলের কুশন তার নিজের। এমন কি দেয়ালে যে প্লাস্টিকের লতায় নাম-না-জানা ফুল ফুটেছে—সেটিও নিজেরই কেনা।

কমল লতাটা দেখে একটু নাক উঁচু করেছিল।

তা অনীতার চোখ এড়ায়নি, এমন নাক উঁচু করলে কেন?

কই না তো।

আমি দেখেছি।

প্লাস্টিকের ফুল কিনা, ফুলের দেশের মানুষ—তাই ভাল লাগে নি।

তা কি করবে, এখনে ডেইজীলতা তো তুলে দেওয়া যায় না। পরের বাড়ি, অমনি দরোয়ান এসে তম্বি করবে, যস্মিন দেশে কদাচার।

তাহলে লতা বাদ দিলেই হত।

না, তা হয় না। দৃঢ় স্বরে বললে অনীতা, লতা না থাকলে নেড়া নেড়া লাগে।

কমল আর কিছু বলে নি। সে স্বর্গ রচনার দর্শক, সে আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

কর্ত্রীর ইচ্ছায়ই কর্ম চলতে লাগল।

শুধু নতুন বাজার নয়, চোরা বাজারও আমদানি হল, জয়পুরী বিবর্ণ ফুলদানী ব্রাসোর দৌলতে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল, আরো কত এল, তার হিসেব রাখে না কমল। জানেও না।

শুধু অনীতা দেখায়, আর বলে, ঐ ঘড়িটার দাম কত বল তো?

ঘড়ি কিনলে? ঘড়ি তো ছিল। তোমার হাত-ঘড়ি, আমার হাত-ঘড়ি। দেয়ালে আছে দেয়াল-ঘড়ি। আবার?

তাই বলে সস্তায় ক্লকটা পেয়ে গেলাম, নেব না? অনীতা হাসলে।

কাক্কু ক্লক।

এই দেখ না, এই বলে একটা পুরনো বড় ঘড়ির কি একটা টিপে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল এক কলের কোকিল। ডাকতে শুরু করে দিল—কুহু-কুহু।

কমলের মুখের দিকে চেয়ে হাসলে অনীতা।

কোকিলের ডাক শুনতে পাবে অকালে।

নাইটিঙ্গেল তো আছেই, আবার কোকিল কেন? কমল বললে।

আহা—আর আদিখ্যেতা করতে হবে না! একটু হাসলে অনীতা।

নীড়-রচনা এমনি করেই এগিয়ে চলল।

কমল একখানা 'দেবশিশুদলের' ছবি পেয়েছিল। পুরনো প্রবাসীতে ইউ রায় য়্যাণ্ড সন্সের ব্লক আর সুন্দর ছাপা ছবি। তেমন ছবি এখন আর মেলে না। সে রঙও নেই। দেবশিশুদের গোলাপী রং, রামধনু রঙের পাখা। সেই ছবিখানা সোনালী রঙের ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনেছিল অনীতা।

দেয়ালে ছবি বড় নেই। শুধু কমল আর অনীতার ফটো। কমলের ফটোতে ফটোগ্রাফার তার সুশ্রী মুখখানি ফুটিয়ে তুলেছে। অনীতার ফটোতে আবার রঙের তুলি বুলিয়েছে। মাঝখানের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ফটো। সেখানি একক। আর এক দেয়ালে

সেই প্লাস্টিকের লতা। বসবার ঘরের দেওয়াল তাতেই ভরে গেছে। তাই দেবশিশুদলের ছবিখানা এনে টাঙিয়ে রাখা হল শোবার ঘরে। মাঝে মাঝে তার দিকে নজর পড়ে, আবার পড়েও না। একদিন বা বেমালুম ভুলেও গেল।

অনীতা সেদিন রাতে হঠাৎ জেগে উঠল কি একটা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের কথা তার মনে নেই, কিন্তু তার মধুর আবেশটুকু এখনও মনে। সে উঠে বসে চারিদিকে তাকাল।

নীল আলো ঘরে জ্বলে। সারারাতই জ্বলে। অনীতা বলে, সে কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে আচমকা জেগে ওঠে। তখন আলো না দেখলে, কেমন হয়ে যায়।

সেদিনও নীল আলোটা জ্বলছিল। টেবিল ল্যাম্পের ঢাকনা-দেওয়া আলো, অন্ধকারে যেন নীল আলোর পরাগ ছড়িয়ে দিয়েছিল ঘরে।

অনীতা খানিকটা চুপ করে শুয়ে রইল, তারপর উঠে বসল। হঠাৎ চোখ পড়ল দেবশিশুদের উপর। দেহে তার শিরশিরানি। কেমন এক আনন্দ। সে আনন্দে অধীর হয়ে কমলের কাছে এগিয়ে গেল। তার মাথাটা টেনে বুকের উপর চেপে ধরল। শিরশিরানি যেন বাড়ছে। কমল জেগে উঠেছে। এখনো চোখ আধবোজা। অনীতা আধবোজা চোখে চুমু খেলে।

কি হল ? কমল শুধোলে। ভয় পেলে নাকি ?

মাগো, কি মানুষ ! হেসে উঠল অনীতা। ভয় কেন পাব ? ভয় পেলে মানুষ হাসি দেয়।

তবে ?

বলছি শোন !

আমার ঘুম পাচ্ছে।

তোমার ঘুম এখন শিকেয় তোলা থাক মশাই, আগে আমার কথা শোন !

বিরক্তি চেপে রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে কমল বললে, বল। আমি তৈয়ার।

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কি বললে অনীতা।

কমল বুঝতে পারলে না ; বললে, শুধু ফিসফিসানিই শুনলাম।

যাও—আমার বলতে লজ্জা করে!

তাহলে আমারও শোনা হল না, পাশ ফিরে শুতে গেল কমল।

না, না, ঐ যে দেবশিশু—অমনি একটি—?

তোমার কোলে চাই—এই তো ?

বুকে মুখ লুকিয়ে বললে অনীতা—হ্যাঁ।

কিন্তু ওরা দেবশিশুই, ওরা সাতশো বছর আগের এক ছবি-লিখিয়ের কল্পনা—ওদের কোথায় পাব ?

তুমি যেন কেমন—আমি কি দেবশিশু বলেছি নাকি ?—অমনি একটি চাই।

একটিতেই হবে ?

না, না, দুটি ছেলে, একটি মেয়ে।

একেবারে পরিবার-পরিকল্পনা করতে চাও!

যাঃ—তোমার শুধু ঠাট্টা।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন ? কমল শুধোলে। তুমি না বলেছিলে, স্বামী-স্ত্রীর সংসারে সন্তান চাই-ই—কিন্তু ক'বছর ঝাড়া হাত-পা কাটাতে দিয়ো। বছর না পুরতেই সন্তান হলে তুমি আর আমাকে পাবে না, আমিও তোমাকে পাব না।

অনীতা চুপ করে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাস বুঝি ফোঁস করে বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে। কমলের মুখে এসে নিশ্বাসটুকু লাগল।

কমল তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, তিনটি কেন, বিয়ে যখন করেছ, তখন কত হবে। দ্বিজু রায়ের সেই গান শোননি—

বিয়ে করলেই পুত্রকন্যা
আসে যেন প্রবল বন্যা।

তোমার শুধু ঠাট্টা। তীব্র ঝংকারে অনীতা বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

বাঃ, এতো মজা মন্দ নয়। কমল বললে। তুমিই গাও, তুমিই বাজাও। কথাটা তো আমি বলিনি। আর তারজন্যে—একত্রে শয়ন, স্ত্রী দশযোজন দূরে! এযে ফুল্লরার বারমাস্যার চেয়েও বেশি হল।

ফুল্লরার বারমাস্যা কে শোনে! ওতো কালকেতুর বারমাস্যা।

কমল বললে, কালকেতু ব্যাধ বারমাস্যা গায় না, হা-হুতাশ করে না।

তবে কি গায়ের জোর ফলায়?

দরকার হলে ফলায় বই কি।

কমল নিজের হাত তুলে বাইসেপ দেখালে।

অনীতা হেসে ফেললে।

স্বামী-স্ত্রীতে ভাব হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

অফিস থেকে এসে কিন্তু ঘরের পরিবর্তন দেখলে কমল। ডবলবেড অন্তর্হিত; তার বদলে দুখানি সিংগল কট। তাতে গেরুয়া রঙের বেড কভার ঢাকা। দুখানি দুপ্রান্তে পড়ে আছে, মাঝখানে অনেক ব্যবধান। দেওয়ালের দিকে নজর পড়ল। সেখানে নেই দেবশিশুদের ছবি। তার বদলে একখানা সুইজারল্যাণ্ডের দৃশ্যচিত্র।

অনীতা দক্ষিণের জানলায় বসেছিল, তাকে দেখে নড়ল-চড়ল না। বাচ্চা নেপালী চাকরটা দরজা খুলে দিয়েছিল, অনীতা যায় নি। অন্যদিন অনীতাই যায়।

কমল কাপড় ছাড়ল না, এসে অনীতার কাছে দাঁড়াল, তাকে শুধোলে, হঠাৎ সব ওলট-পালট ব্যবস্থা?

এখন থেকে এই ব্যবস্থাই চলবে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানালে অনীতা।

না, চলবে না। উলট-পুরাণ আমি চালাতে দেব না।

হ্যাঁ, চলবে।

না। কমল অনীতার হাত ধরলে।

উঃ, ছাড় লাগে। কেঁদে উঠল অনীতা।

কমল অপ্রতিভ।

তাড়াতাড়ি অনীতাকে কাছে টেনে নিলে।

ছাড় বলছি। তখনো ফুঁপিয়ে উঠছে অনীতা।

শোন, কাঁদে না। কমল চোখ মুছিয়ে দিতে গেল।

কাপড়ের আঁচলে মুখ ঢেকে আরো জোরে কেঁদে উঠল অনীতা।

কমল বললে, কি হল ?

তুমি তো আমাকে চাও না—তবে বিয়ে করলে কেন ? তুমি তো সন্তান চাও না।

সে তো তোমার নিজের কথা। তুমিই বলেছিলে, কমল জানালে।

আমার নিজের কথা তো কি হয়েছে।

বেশ তো, তাহলে সন্তান চাই ?

লজ্জায় যেন কমলের বুকে মিশে গেল অনীতা।

একটু শান্ত হতে কমল বললে, কিন্তু দায়-দায়িত্ব আছে।

তা তো সকলেরই আছে, তাই বলে কারো সন্তান হয় না ?

হয় বটে, কিন্তু ঝামেলা তো আছে। ঐ বাহাদুরকে দিয়ে চলবে না। একটি বেশি বয়েসী মেয়েছেলে আনতে হবে। তাছাড়া তোমারও যখন তখন বেরুলে চলবে না।

অনীতা কি বলতে গিয়ে চুপ করে রইল।

কমল আবার বললে, তাছাড়া আমাদের হনিমুন তো হল না।

আমরা না যাব কাশ্মীর ? সেখানে ডালহ্রদে নৌকা ভাসিয়ে তোমার মুখের দিকে চেয়ে বলব—

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী
বল, কোনপারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

সে কথা কি ভুলে গেলে অনু ?

অনীতা চুপ করে রইল।

তখন কমল যেন আরো উৎসাহিত হয়ে বললে, যদি হঠাৎ কেঁদে ওঠে দেবশিশু—সব তো মাটি হয়ে যাবে। তুমি উঠে বলবে, কাব্য রাখো! আগে দেখে আসি, ও খাট থেকে পড়ে গেল কি না!

অনীতা তখনো চুপ।

কমল বলেই চলল, তাছাড়া, সংসারে একটু সিজিল-মিছিল চাই। খোকাখুকু তো আসবেই, তাদের জন্যে জমিও তৈরি করা চাই। সঙ্গে সঙ্গে চাই এডুকেশন পলিসী। তার জন্যে দুজনের মাইনের অঙ্কটা আর একটু ভদ্র হতে হবে।

সবাই বুঝি অত সব ভাবে ? অনীতা ফস করে বলে ফেললে।

সবাই না ভাবে, আমরা ভাবব না কেন ? আমরা মডার্ন দম্পতি।

কিন্তু তারপরেও যদি—

সে তো এয়ারক্রাশের মতো দৈব দুর্ঘটনা।

অনীতা চুপ করেই রইল।

ডবল বেড সেই যে অন্তর্ধান হয়েছিল, আর যি ঃ এল না। সিংগল বেডই বহাল রইল। আর গেরুয়ার নির্লিপ্ত ছড়িয়ে দিলে বেড-কভার।

দুপাশে দুখানি বেড, একই রঙের বেড-কভার মোড়া। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। যেন দুস্তর নদী। তার এক পাড়ে চখা আর এক পাড়ে চখী। নদী বুঝি নয়, দুস্তর সাগর। তবু বহু রাতে ঐ সাগরেও তৈরি হয় সেতু। সে-সেতু দুজনের

মিলন ঘটায়। মিলন মুহূর্ত মনোরম হয়ে ওঠে, হঠাৎ মনে পড়ে যায়, সংসারী সতর্কবাণী, আধুনিক জীবনের জটিলতা। কি এক নিষেধ। মিলন পূর্ণ হয় না। দুজনে সরে আসে।

নীল আলো নিবে যায়, আঁধারে ব্যবধানের সাগর দুলে ওঠে। দুজনেই শুয়ে থাকে। চোখ বোজা। ঘুম বুঝি আসে না। না, কমল ঘুমায়, ঘুমাতে পারে না অনীতা। ফাঁকা দেয়ালে যেখানটায় দেবশিশুর ছবি ছিল সেখানে একটা দাগ পড়ে আছে। সেই দাগের উপর পথের বিজলী আলো এসে পড়ে। দাগটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেন কাকের ঠ্যাং আঁকিবুকি কেটে গেছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে আর একবার তাকায় ওপাশের খাটে কমলের মুখের দিকে। একটু একটু নাক ডাকে কমলের। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অনীতা চাদর টেনে দেয় পা থেকে বুকে, তারপর মুড়ি দেয়।

॥ চার ॥

অফিস আর বাড়ি। বাড়ি আর অফিস।

সিনেমায় মাঝে মাঝে যায়। মাঝে মাঝে যায় ক্যানিং কি ঘুটিয়ারী শরিফে বেড়াতে। কখনও বা ডায়মণ্ডহারবারে। ব্যাগে ভর্তি করে নেয় খাবার। হ্যামক ভাড়া করে অনীতা দোল খায়। তারপর সন্ধ্যে না হতে ফিরে আসে। কখনো বা চিড়িয়াখানার নিরালায় গিয়ে বসে থাকে। কখনো বা উটরাম কেবিনে।

তারপরে তাতে ছেদ পড়ে।

অনীতা বলে, ভাল লাগছে না বাপু!

তাহলে এস মুখ বদলাই, চল আজ ব্যাণ্ডেল গীর্জা দেখতে। ইলেকট্রিক ট্রেনে।

আমার ভাল লাগছে না। শুধু টই-টই করে ঘোরা! মুখ বুঝি একটু বেঁকে যায়।

তাহলে আজ বাড়িতেই দু-চারজনকে ডাকি!

না, আমার মাথা ধরবে।

তাহলে চল থিয়েটারে।

না, না!

অনীতার যেন কোন বিষয়েই উৎসাহ নেই। কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে। মুখের সে রক্তিমাভা নেই, কেমন যেন ফ্যাকাশে ভাব।

কমল বললে, কি হল তোমার, অসুখ নাকি?

না, বেশ আছি। অনীতা উত্তর দেয়।

না, বেশ নেই। চোখ দুটো বসে গেছে, গালে রক্ত নেই। কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছে। যেন মূর্তিমতী আইডিয়া! একটা চুমু দেবে?

মুখ ঘুরিয়ে বলে অনীতা, ঢঙ দেখ না!

কমল তাকে কাছে টেনে নিতে যায়।

অনীতা বলে, ছিঃ, ঐ বাহাদুর আসছে!

বাহাদুর নেপালী ছোকরা চাকর। ওদের স্বর্গের সে একক ভৃত্য।

ওকে দোকানে পাঠাই!

না, না! ঝংকার দিয়ে ওঠে অনীতা।

রাতে এক একদিন কমল এসে অনীতার বিছানায় জাঁকিয়ে বসে বলে, আজ কিন্তু নড়ছিনে।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা!

চুলোয় যাক!

না, না, তা হয় না!

অনীতা তাকে ফিরিয়ে দেয়।

কমল পুরুষ, তার আড্ডা আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সে অফিস থেকে বাড়ি এসেই চা খেয়ে বেরোয়। আর ফেরে সেই রাত নটায়। আড্ডা সেরেই তবে ফেরে।

অনীতা একা থাকে। কমল এলে সে কিছু বলে না।

সহজভাবেই ভাত বেড়ে দেয় টেবিলের উপরে। নিজেও বসে।

তারপরে একটু-আধটু গল্পও হয়।

কমল বলে আজ আর তোমার অফিসে যেতে পারিনি। আর রোজ-রোজ ভালও দেখায় না।

কেন—বন্ধুরা তায়িত স্বামী বলে নাকি? অনীতা হাসে।

না, বন্ধুরা নয়, আমারই কেমন—

লজ্জা করে?

কমল চুপচাপ।

তাহলে আর যেয়ো না আমার অফিসে।

রাগ করলে না কি?

না।

কমল নিশ্চিন্ত, বলে, এবার কিন্তু কাশ্মীর যেতেই হবে।

আমরা যেদিন যাব, সেদিন কাশ্মীরে আর চেনার ফুল ফুটবে না।

কি বললে?

কিছু না।

তাহলে যাবে না?

নিয়ে গেলেই যাব।

তারপর থেকে কমল আর অনীতার সার্কেল-টুর অফিসে যায় না পাঁচটার পরে। সে বেরিয়ে যায় ব্রীজের আড্ডায়। অনীতা

একাএকাই ফেরে। এসে কোনদিন চা করে খায়, কোনদিন খায় না।

শূন্য ঘর খাঁ-খাঁ করে। সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে।

গুনগুন করে গান গায়, শূন্য মন্দির মোর।…

ভরা ভাদরেও শূন্য মন্দির, আবার ভরা শীতেও তাই। গ্রীষ্মেও তাই।

অনীতা আজকাল সংসারের কথা ছাড়া বলে না। কখনো বা অফিসের কথাও হয়। পে-কমিটি আর প্রমোশনের কথাই এখন আলাপের সূত্র। তাছাড়া এ-ফ্ল্যাটের ও-ফ্ল্যাটের খবর।

কমল হাঁ হুঁ দেয়, শোনে। তারপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

অনীতা ঘুমোয় না। ঘুম তার আসে না। সে হঠাৎ বুঝি বা ডাকতে চায়।

এই!

ডেকেও ফেলে, এই! এই কমল!

কমল শোনেও না। জবাবে নাক ডাকায়।

। পড়ে আবার অনীতা।

লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

শূন্য, শূন্য তার মন্দির।

এক ঘরে শয়ান স্বামী—

শ যোজন দূরে।

॥ পাঁচ ॥

সেদিন অনীতা অফিস যাবে না। কমল বেরুচ্ছিল, তাকে বললে, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো।

কেন! কোথাও যাবে নাকি?

যেতেও তো পারি।

তালাচাবি দিয়ে চলে যেয়ো। আমার কাছে বাড়তি চাবি আছে।

না সে জন্যে নয়।

তাহলে? কমল তাকিয়ে রইল অনীতার মুখের দিকে।

আজ কি তারিখ তা মনে আছে। অনীতা বললে। বুঝি স্বর তার একটু কেঁপে উঠল।

দাঁড়াও—দাঁড়াও! কমল একবার মাথাটা চুলকে নিলে। মনে পড়ছে, আবার পড়ছে না।

অনীতা বললে, আজ আমাদের বিয়ের তারিখ। বছর ঘুরে এল।

সত্যি? কমল যেন লাফিয়ে উঠল। সত্যি?

সত্যি না কি মিথ্যে?

দেখ তো, আগে বলতে হয়।

কেন—?

আমাদের আবার আজ ব্রীজ টুর্নামেন্টের ফাইন্যাল।

আজ থাক্ না।

টাই হয়ে গেছে, চারটে থেকে খেলা! এখন থাক্ না?

তুমি যেয়ো না, বোলো, অসুখ করেছে, অনীতা ধরা গলায় বললে।

এই দেখ, অমনি অভিমান হল! কাছে এগিয়ে এল কমল

একটু আদর করে বললে, আমি না গিয়ে পারব না। তাহলে চার-ইয়ারী ক্লাব হারবে। আটটার মধ্যে কাজ ফতে করে দিয়ে ফিরব।

কত ফিরবে জানা আছে। ভ্রূ বাঁকিয়ে বললে অনীতা।

না গো, না—সত্যি!

সত্যি?

সত্যি, সত্যি, সত্যি! তিন সত্যি!

অনীতার মুখে হাসি ফুটে উঠল, একটু বসো না! অফিস তো রোজই আছে, আজ না হয় লেট হলে।

বসল কমল।

আমাকে আজ কিছু দেবে না? অনীতা আবার শুধোলে।

কি চাই? তোমাকে অদেয় তো আমার কিছুই নেই অনু। নিজেকে পর্যন্ত দিয়েছি।

পুরুষ কথায় দড়ো! আমি বৈশ্য যুগের মেয়ে। অনীতা হাসলে, শুধু কথায় ভুলিনে, কি দেবে বল?

কি চাই তোমার বল রানী! কমল একটু অভিনয় করে বললে, বাদাকশানের চুনী না গোলকুণ্ডার হীরে?

হ্যাঁ—কত দিচ্ছ! ওসব কিছু না। একটা লকেট। তাতে দুটি অক্ষর অ আর ক।

কিন্তু টাকা?

সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেব।

কাশ্মীর যাবার কি হবে।

কাশ্মীর এখন দূরে থাক, এখন লকেট কিনব।

কেন কেন, কিন্তু—

ওসব কিন্তু-টিন্তু নয়। আর সুমিতাকে বলব ভেবেছি।

কি দরকার—কমল বললে—আজ লাল তারিখে, তুমি আর আমি—আর কেউ নয়।

বেশ তো বলব না, অনীতা বললে। কিন্তু মনে থাকে যেন রাত আটটায় আসবে। আমি বসে থাকব।

ঠিক আসব।

কমল অনীতাকে আবার আদর করতে গেল।

এখুনি বাহাদুর আসবে! অনীতা বাধা দিলে।

তবে ও-ঘরে চল।

তোমার অফিস আছে না?

যাব না।

সত্যি যাবে না?

না।

কিন্তু ব্রীজ টুর্নামেণ্ট? সেটায় না গেলে চলবে?

অনু, লক্ষ্মী, সেটায় না গেলে চলে না। তবে তুমি যদি বল, তাহলে—

থাক, আর মুখ কাচুমাচু করতে হবে না। অফিসে যাও, টুর্নামেণ্টে যাও, আটটায় এখানে হাজরে দিতে হবে কিন্তু।

দেব দেব! কমল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।

অনীতাকে একটু আদর করে উঠে দাঁড়াল।

একটু দাঁড়াও!

অনীতা চলে গেল ভিতরে, এক মুহূর্ত পরেই সেভিংস ব্যাঙ্কের চেক বইখানা নিয়ে ফিরে এল।

চেকে তোমার সই নেই—করে দিয়ে যাও!

কমল খস্‌খস্ করে সই করে দিয়ে চলে গেল।

অনীতা ল্যাণ্ডিং-এ এসে দাঁড়িয়ে বললে, মনে থাকে যেন, রাত আটটা!

থাকবে—কমল সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল।

॥ ছয় ॥

ব্রিজ টুর্নামেন্ট চলছে।

নতুন ছু প্যাকেট তাস ভাঁজা আর বিলি হচ্ছে।

আর ডাক চলছে।

হরতন চার তো রুহিতন পাঁচ, আবার নো-ট্রাম্পে সব কাবু। নো-ট্রাম্পই ডেকে বসল কমল।

তার খেড়ু তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলে। কিন্তু কমল অকুতোভয়। সে গ্রাহ্য করলে না।

খেলা শুরু হয়ে গেল।

অনীতা মার্কেট থেকে ফিরে এল। ট্যাক্সিতেই সে এসেছে।

বাহাতুর ছিল সঙ্গে। কেক-পেস্ট্রি-সন্দেশ কিনেছে। আবার লকেট আর শাড়ি। কমলের জন্যে কিনেছে এক টিন দামি সিগারেট আর একটা নকশীদার য়্যাশ-ট্রে।

সে হাত-ঘড়ি দেখলে, এখন পাঁচটা।

এরই মধ্যে সব গুছিয়ে নিতে হবে।

ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সে তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল :

ফ্ল্যাটের দরজা খুলল তালায় চাবি ঘুরিয়ে।

সাতটা বাজে।

কমলরা হারছে। ডাউনের পর ডাউন দিচ্ছে।

কমল মরিয়া। সে হাতের তাস দেখে পহেলা ডাক চড়ালে, থ্রী হার্টস্‌।

অপর পক্ষ হাঁকলে, থ্রী স্পেডস্‌।

কমলের খেড়ু আবার ইসারা করলে। কিন্তু কমল ফোর হার্টস ডেকে বসল।

খেলা শুরু হয়ে গেল।

সাতটা। অনীতার ঘড়িতেও সাতটা।

এরই মধ্যে ঘর-দোর সে সাজিয়ে ফেলেছে। সাদা রেশমী ফুল তোলা ঢাকনা পেতেছে টেবিলে। জয়পুরী ফুলদানিতে এক ঝাড় রজনী গন্ধা রেখেছে। প্লেটে প্লেটে সাজানো হয়েছে খাবার। হাল্কা-নীল রঙের চায়ের সেট্‌টিও টেবিলের উপর সাজানো।

সামাদানে একখানা মোমও আছে।

সব তৈরী, সব টিপটপ।

শোবার ঘরেও রজনীগন্ধার ঝাড়। তুগাছা বেলফুলের মালা আছে প্লেটে, জল ছিটিয়ে তাদের সতেজ রাখা হয়েছে।

সিংগল খাটের ব্যবধানটুকুও আর নেই। আজ জোড়া খাট। সেখানে নিভাজ সাদা চাদরের উপরে ফিরোজা রঙের বেড-কভার। ঝালর-দেওয়া বাঁকুড়ার নকশী অড়-পরানো তুজোড়া বালিশ পাশা-পাশি রয়েছে। নতুন পর্দা, ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ছে। রেডিও ঢাকনাটিও আজ নতুন। টিপয়ের ঢাকনাও তাই। সেখানে নকশীদার য়্যাশ-ট্রে আর সিগারেটের টিনটি। আর জ্বলছে, ধূপকাঠি নয় ধূপদানীতে সুগন্ধি ধূপ। ওটাও অনীতার বিলাস, ধূপকাঠিতে তার মনে ওঠে না সে তাই একটা পিতলের ধূপদানী কিনেছে, সেইটেই জ্বালায়। ধূপের গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে ঘর।

সাতটা। দেয়াল ঘড়িতে সাতটা বাজল।

সব কাজ শেষ! অনীতা এবার গিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

সাড়ে সাতটা।

তাদের ভাগ্য হঠাৎ ফিরে গেছে কমল আর তার খেড়ুর। এখন আর ডাউন দিতে হচ্ছে না। এখন ডাউন পাচ্ছে।

যা তোলে, তাতেই জিত। আশা, এমনি বরাত চললে, আজ জিততেও পারে।

কমল একবার ঘড়িটার দিকে তাকালে।

সাড়ে সাতটা। আটটায় আর বাড়ি পৌঁছনো হল না। যাক গে, আটটায় উঠতে পারলে সাড়ে আটটা-পৌনে নটায় পৌঁছে যাবে। না হয় ট্যাক্সিই নেবে।

ভাববারও ফুরসত নেই, ডাক শুরু হয়ে গেছে। কমল তাসে মন দিলে।

আটটার ঘর ছোঁয়-ছোঁয় ঘড়ি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল অনীতা।

ধারা স্নান করেছে শাওয়ারে, চুলও ভিজিয়েছে। ধূপের ধোঁয়া দেবার আজকাল রেওয়াজ নেই। তাই ধূপের ধোঁয়া সে দেয় না, কালাগুরুও মাখে না। তার জন্যে আছে নানা হেয়ার লোশন। সেই হেয়ার লোশনই মাখবে অনীতা। তার ড্রয়ারে আছে নানা লোশন, নানা রূপটানের সরঞ্জাম।

চাবির গোছা লাগানোই ছিল, সে খুলে ফেললে ড্রয়ার।

আলতার শিশিটা সামনেই, মডার্ন মেয়েরা যখন-তখন আলতা পরে না। তাই কলকাতার নাপতিনীদেরও ব্যবসা তেমন চালু নয়। আলতা পরতে গেলেও মুশকিল। আজকাল মেয়েরা পটের বিবি হয়ে ঘরে বসে থাকে না, বাইরে বেরুতে হয়। পা বাইরে চলাফেরায় একটু ফাটে। ফাটা পায়ে আলতা পরা বেমানান, অনীতার পা ফাটা, তাই সে আলতা পরে না। কিন্তু শিশি একটা রেখেছে। যদি সাধ জাগে, পরবে। আজ সাধ জাগল। সে পা ভাল করে ঘষে এসেছে, নখও কেটে নিয়েছে। এবার তুলির

অভাবে শিশির ছিপি দিয়ে টেনে দিলে দাগ। রং তার কালো নয়, ফরসাই। ছেলেবেলায় বেশ ফরসাই ছিল। যার জন্যে নাম হয়েছিল—বিবি। এখনো ফরসাই আছে, তবে সে জৌলুস নেই। সবাই বলত, বিয়ের জল পড়লে আবার জৌলুস ফুটবে। কিন্তু ফোটেনি। তাহলেও রংটি ভাল। ঠিক দুধে-আলতা নয়। সবরী কলার খোসার রংও নয়। তবে গৌর বরন যাকে বলে তাই। আর সেই বরনের গর্বেই ভাল সম্বন্ধের আশাও করেছিলেন বাপ-মা। যদিও গালে উনুনের ঝিকের মতো হাড় জাগে, চোখ দুটোও তেমন ভাসা-ভাসা নয়; তবু মোটামুটি লাবণ্যবতী। যাকে মেয়েরা বলেন, আল্‌গা-শ্রী। হ্যাঁ, তা তার আছে। আর সেই শ্রী দেখেই দু-চারটে সম্বন্ধ তার এসেছিল, তবে রুপোয় বনেনি বলে পাকে নি, জোটও বাঁধেনি। আল্‌গা-শ্রী বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা মিলিয়েও গেছে। কিন্তু এখনো সাজলে-গুজলে ভাল দেখায়। বাসে-ট্রামে অফিসে সবাই তাকিয়ে দেখে। কমল তো প্রথম দিন দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল। সেও মুগ্ধ হয়েছিল কমলকে দেখে।

কমল সুপুরুষ—সে-পুরুষকে একবারের জায়গায় দু-বার তাকিয়ে দেখতে হয়। বার বার দেখতে হয়। অনীতাও দেখেছিল। অবাক হয়েছিল, এমন পুরুষ চেহারা ভাঙিয়ে ছবির নায়ক না হয়ে করণিক হল কেন?

ঐ নিয়েই প্রথম আলাপ করবার ইচ্ছা হয়েছিল, পারেনি। বাধো বাধো ঠেকেছিল।

কিন্তু আলাপ তবু হয়ে গেল। আলাপ হতোই, কিন্তু প্রথম দিনে হত কিনা সন্দেহ।

কমল আলাপ করবার জন্যে উসখুস করলেও অতি সযত্নে অবহেলা করে যাচ্ছিল অনীতাকে। এমন কি অনীতাকে দেখবার জন্যে তার টেবিলে যখন ভিড় জমে উঠল, সে একটা ফাইল নিয়ে ছুটল অফিসরের ঘরে।

অনীতা ক্ষুব্ধ হল। তারপরেই রবীন্দ্রনাথের কথাটা মনে পড়ল, ও দেখে না বলেই ভাল করে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠল অনীতা।

সেও ঠিক করলে, কমলকে আমল দেবে না।

কিন্তু আমল দিতেই হল।

ড্রাফ্‌ট করতে হবে একখানা চিঠি। মাথা-মুণ্ডু ভেবে পাচ্ছে না অনীতা। সে বি-এ ডিগ্রিধারিণী। 'য়্যাজ ইউ লাইক ইটে'র যে কোন সীন মুখস্ত বলতে পারে। রোসালিণ্ড হবারও তার সাধ। কিন্তু তা হলে কি হবে, ড্রাফ্‌ট করতে পারে না। মুখ শুকিয়ে গেল, এক গোছা চুল এসে পড়ল কপালে। কেমন বিভ্রান্তভাব।

কমল বুঝি তাকিয়ে দেখছিল। কোন্ পুরুষ নারীর এই রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়, এগিয়ে না আসে! সেও এগিয়ে এল, বললে, কোন অসুবিধে হচ্ছে ?

হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল অনীতা। সেই দিনই প্রথম আলাপ।

অনীতা নিশ্বাস ছাড়লে। তারপর আবার আলতা পরতে মন দিলে।

ঘড়িতে আটটা বাজে বাজে।

কমল একেবারে ডুবে গেছে, ড্র হয়-হয়।

আর কয়েক মিনিট, তারপরেই খেলা শেষ হবে।

ঘড়ি দেখলে।

আটটা বাজে। আর বড় জোর এক ঘণ্টা।

তারপরে ছুটবে।

এতক্ষণে তৈরী হয়ে আছে অনীতা। বকুনি খেতে হবে। তা বৌয়ের বকুনি তো মিষ্টি। খেলেই বা। চৌধুরী বলে—ও হচ্ছে আলুনি মেরে-যাওয়া জীবনের নুন, চাট।

ডীল এসে গেছে, কমল আবার তুলে নিলে তাসের প্যাকেট।

প্রসাধন শেষে হয়ে গেছে।

অনীতা উঠে দাঁড়াল।

সাজ-সাজ লাগছে কিন্তু তেমন সাজে নি। সাজতে সে জানে। দু'কানে টপ আছেই, হাতে ক'গাছা চুড়ি। গলায় পরেছে সদ্য-কেনা লকেট হার। আয়নায় মুখ দেখলে অনীতা। গোলাপ ফুল যেন ফুটেছে গালে। এ গোলাপ ফেস পাউডার ফরসা গালে ফোটাতে পারে। ফরাসী গন্ধরাজ কোটির এ-গুণ আছে। গলার খাঁজে খাঁজে, গ্রীবায়, কিউটিকিউরা পাউডারের প্রলেপ দিয়ে নিলে পাফ্ দিয়ে। চাঁপা গন্ধ বেরোয় পাউডার থেকে। ভাল লাগে।

সুন্দরী নয় অনীতা, বাংলাদেশে ক'টিই বা সুন্দরী! দু-একটি। কিন্তু সে সুশ্রী। সাজলে আরো সুশ্রী দেখায়।

ভাল করে নিজের মুখখানা দেখলে। কেমন যেন খালি খালি লাগছে। কোথায় যেন ত্রুটি আছে। ও-হরি, চোখে দেয়নি কাজল। কাজললতা থেকে কাজল আঙুলে করে নিয়ে টেনে দিলে চোখে। চোখের কোলে স্নায়ু কালো ছায়া ফেলে, কিন্তু সে-ছায়া ঢেকে দেয় কাজল। কে যেন এক কবি বলেছিল, ওগো কাজল দিয়ো না। কাজলে ঐ চটুল চোখকে আরো চটুল করে তুলো না! সে কবির ঐ মিনতিতে তার মানসী হয়তো হেসেছিল, কিন্তু কাজল পরা বাদ দেয় নি। কমলও বলে ঐ কবির মতো কথা, বলে, কাজল অমন করে পরো কেন?

পরি, ভাল লাগে। উত্তর দেয় অনীতা।

অথচ জ্বরের ঘোরে তোমাকে যখন দেখেছিলাম, কাজল তো ছিল না চোখে।

ওমা—তখন বলে মরে যাচ্ছি! কাজল পরব?

কিন্তু সেদিন চোখে যে মেঘনার ছায়া দেখেছিলাম, সে ছায়া তো কাজলের নয়। তাই তো তোমাকে ভাল লেগেছিল।

তোমার কবিত্ব রাখ! কিন্তু মেঘনার ছায়া কোথায় দেখলে?

চোখ বসে গেছে, চোখের কোলে কালি।

ওমা! সে তো শাকচুন্নীর মতো দেখাচ্ছিল!

কিন্তু ভাল লেগেছিল। সেদিন তোমাকে দেখে ভাল বেসেছিলাম।

তাই বুঝি ঝুঁকে পড়ে আঙুর খাওয়াতে গিছলে?

হ্যাঁ, ইচ্ছে করছিল ঐ চোখের কোলে ঠোঁট দুটি চেপে ধরি।

ধরলে না কেন?

ঠোঁট ঠোঁটের মধু চেখে আর ফুরসত পেলে না।

অনীতা কাজল-পরা চোখ দুটি আরশিতে মেলে ধরল। তার চোখ সফরী নয়, আবার খঞ্জনও নয়। তাই কাজল পরলে ভালই দেখায়। চোখের মণি দুটি কালো নয়, নীল। একেবারে নীল নয় বলেই ভাল, কালো তার সঙ্গে মিশোনো। তাই সে চোখকে বিড়াল আঁখি বলা যায় না, বলতে হয় নীলোৎপল। যদিও রামচন্দ্রের নীলোৎপল আঁখি কিনা কে বলবে! এ চোখের গর্ব অনীতার আছে। তাই চোখ দুটো দেখছে। কটাক্ষ চোখে ভেসে উঠছে। এ কটাক্ষে মদন মূর্ছা যায়, মানুষ তো কোন ছার!

বিয়ের পরে চোখ নিয়ে ঠাট্টাও করেছে কমল, বলেছে, বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী!

আছে—আছে! ঐ দেখে তো ভুলেছিলে! অনীতা ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দিয়েছে।

তা তোমার চোখে যে ফস্‌ফরাস আছে, ঐ ফস্‌ফরাস ঝলসে-ওটা চোখ দিয়ে অমন তাকালে ভুলব না?

বেশ, আমি বিড়াল আছি—আছি, তোমার কি?

আমার কি নয়? কমল অবাক হবার ভান করে বলে। ঐ লোভী চোখ আর একজনের উপর পড়লেই তো আমার সর্বনাশ!

অনীতা একটু বা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। পঁচিশটা বছর তার কুমারী জীবনে কেটেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা ইস্কুল-কলেজে পড়লেও আগে পুরুষের সঙ্গে মিশতে পেত না। পুরুষ বলতে ছিল তুতো ভাই আর বন্ধুদের দাদারা। তাদের সঙ্গে আলাপ হতে পারে কিন্তু মেলামেশা কখনো নয়। একসঙ্গে মেয়ে আর ছেলের পড়ার কলেজ ছিল দু-একটি। সেখানে ছোঁয়াছানি বাঁচিয়ে বসতে হত একেবারে একধারের বেঞ্চিতে, কখনো আলাপের সুযোগ হত না। যারা আলাপ করতে এগিয়ে আসত, তারা ইঙ্গবঙ্গ ঘরের মেয়ে।

কিন্তু অনীতার যুগে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা তাদের উপরে টেক্কা দিয়েছে। তারা- রাজনীতি করে, সমাজসেবা করে, সংস্কৃতিতেও তাদের দখল। তারা হৈ-চৈ করে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে, তুই-তোকারি করে। এমন কি লীলাচ্ছলে চারমিনারও টানে, আবার তা থেকে পুরুষবন্ধুদের অগ্নিচুম্বনও দেয়। জুটি বাঁধবার সময় কোনোদিকে দেখে না, রেজিস্টারী অফিসে ছুটে যায়, বিয়ে করে বসে। তারপর হ্যাপা সামলান দু-পক্ষের বাপ-মা!

অনীতাও একালের মেয়ে। চেহারাও মোটামুটি ভাল। কিন্তু রাজনীতি তার মাথায় কস্মিনকালে আসে নি। তাছাড়া পুরুষ যে ঘি আর মেয়ে যে আগুন একথাটা ছেলেবেলা থেকে তার শোনা তাই এড়িয়েই চলেছে, কিন্তু দু-একজনের সঙ্গে যে আলাপ হয় নি এমন নয়। তবে মাখামাখি নয়। হতে পারত। হয় নি। তার কারণ ঐ ঘি আর আগুন।

তবু রঞ্জনকে তার ভাল লাগত।

রঞ্জন তার পিসিমার ননদের ছেলে।

আঠারো-উনিশ বছর বয়স তখন। রঞ্জন একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিন অনীতা। রঞ্জন কখন এসেছে দেখেনি।

রঞ্জন মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ শিরশিরানি উঠেছিল অনীতার দেহে। চোখও বুঝি চকচক করছিল।

সে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে বলেছিল, কে—রঞ্জনদা! এমন অসময়ে?

রঞ্জন কথা বলে নি।

অনীতা এগিয়ে গিয়েছিল তার কাছে।

তাকে ছোঁয়ার লোভ পেয়ে বসেছিল অনীতাকে।

পুরুষকে ছোঁয়ার লোভ, কুমারীর স্পর্শ-লোলুপতা।

হঠাৎ রঞ্জনের সার্টের গুটোনো হাত ধরে শুধোলে, উল্টো জামা পরেছেন কেন?

উল্‌টো! অবাক হয়ে তাকিয়ে উত্তর দিলে রঞ্জন। ওর কথায়, অবাক, না রূপে অবাক রঞ্জন?

অনীতার ভাল লাগছিল। শরীর যেন উত্তাপের ফানুস। সে-উত্তাপ যেন আরো বাড়ছে রঞ্জনের স্পর্শে। রঞ্জন তো ঘি। ঘি গলছে বুঝি তার স্পর্শে।

রঞ্জন এবার হাসলে।

অনীতার রোমে রোমে পুলক।

অমন করছ কেন? রঞ্জন বললে।

করবই তো!

আমি যদি কিছু একটা করে বসি!

মাকে ডাকব কিন্তু! অল্প হাসির ঝিলিক দিয়ে গেল অনীতার ঠোঁটে।

রঞ্জন হাত ধরতে সাহস পায়নি। তাই সরে দাঁড়ালো।

অনীতা তাকে ইডিয়ট বলতে পারত। কিন্তু হঠাৎ সে গম্ভীর

হয়ে গেল। ফানুসের উত্তাপ হুস্ করে মিলিয়ে গেছে। আত্মসম্বৃত নারী।

রঞ্জনকে শুধু সে বলেছিল, আপনি যান!

রঞ্জন চলেও গিয়েছিল। আর আসে নি!

কিন্তু অনীতা রাতে শুয়ে শুয়ে ঐ আঙুলের স্পর্শ অনুভব করত। চেপে ধরত ঠোঁটে, বুলিয়ে দিত।

অনীতা আজও ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দুই গালে, ঠোঁটে বুলিয়ে নিলে।

না—রঞ্জনের স্পর্শ আর নেই! কুমারী লোলুপতা আর নেই! কমলের স্পর্শে স্নায়ুতন্ত্রের সে অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ সে তো অপূর্ণ।

ঢং করে বাজল ঘড়ি।

ফিরে তাকাল অনীতা।

সাড়ে আটটা।

এখনি কমল আসবে। সে বেনারসীর ভাঁজখানা খুলে ফেললে। দুধের মতো সাদা বেনারসী, সাপের খোলসের মতো নরম বেনারসী! পাকে পাকে দেহে সেই খোলস জড়িয়ে নিলে। তার সময় নেই! এখুনি আসবে কমল।

শেষ 'টাচ্' দিতে হবে প্রসাধনে। একবার ঘুরে ফিরে দেখে নিলে অনীতা। হেলেদুলে দেখলে। বুকের আঁচলাটা ঠিক করে নিলে। মুখের পাউডারের প্রলেপে আর একটু ঘষা দিলে হাত দিয়ে। ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে। পাউডারের দাগ মুছে ফেলে লিপস্টিক লাগাতে গিয়ে একটু ভাবলে অনীতা। লিপস্টিক সে রাখে কিন্তু ব্যবহার করতে সাহস পায় না।

কমল হাসে আর বলে, লিপস্টিক মাখতে দেখলে আমার হাসি পায়। ওর চেয়ে পান খেলে তো পার।

দাঁত যে খারাপ হবে। অনীতা উত্তর দেয়।

তাও বটে, তাহলে ঐ ঠোঁটে ঠোঁট মেশাবে কে!

কেন—মেশালে ক্ষতি কি। সেই হলিউডী সিনেমার ঢঙে রুমাল দেব, মুছে ফেলবে।

না—তাতে আমার হাসি পায় অনীতা; যেমন হাসি, তেমনি বমি।

তারপর থেকে আর অনীতা লিপস্টিক মাখেনি।

আজ লিপস্টিক হাতে তুলে নিলে। বড্ড ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ঠোঁট। মুখের সঙ্গে মানায় না। কিন্তু একটা দাগ টেনে দিলেই কসাইয়ের কাটা মাংসের মতো দগদগে লাল হয়ে উঠবে। না, থাক! বিজ্ঞাপনে চুম্বনসহ বা কিস্-প্রুফ হলেও চুম্বনসহ নয়, বরং উঠবেই, লাগবেই। তার চেয়ে ঠোঁটে দাঁতে চেপে একটু কামড়ে নেওয়া ভাল। ওতে একটু রক্তালো হয়ে উঠবে ঠোঁট। আর কমল তাই ভালবাসে। লিপস্টিক রেখে দাঁতে চেপে ধরলে বার বার ঠোঁট, একটু রক্তালো হয়ে উঠল। এবার শুধু কানের দুল দুটি একটু ধরে দেখলে। গুনগুনিয়ে গান ঝরে পড়ল,

ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি……
পরম উৎসব রাতি

সাড়ে নটা।

খেলা শেষ। বেনিয়াপুকুর ব্রীজ ক্লাবের টেবিলে তাস ছড়ানো।

কমল ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠল। বললে, এবার উঠি!

সে কি! ক্লাবের কালবার্টসন হরুদা বললে, ড্র করেছ, ক্লাবের মান বাঁচিয়েছ। এবার এক কাপ খেয়ে যাও।

না হরুদা, বড় দেরি হয়ে গেছে।

খেড়ু অমল বাগচী ফোড়ন দিলে, কমল আজকাল বড় মেগ্‌গে হয়ে

গেছে। ওকে যেতে দিন। বৌ এখন ওর ভাত কোলে করে বসে ঝিমুচ্ছে।

সে কি হে! তোমার বৌ মডার্ন মেয়ে, সে-যুগ এখনো পার হয় নি? তিনি খেয়ে-দেয়ে ঢাকনা দিয়ে ভাত চাপা দিয়ে ঘুমোন না?

হরুদার যেমন কথা! অমল হাসলে। সবে তো একবছর ঘুরে এল। এখনো তেঁতো বেরোয় নি কুইনিনের বড়ির, চিনির মোড়কটুকু আছে।

জীতারহ বাবা! এক বছরে আছে, তাহলে দু-বছরেও থাকবে। কিন্তু থাকুক না থাকুক, এই ধকলের পরে এক পেয়ালা চা না খেয়ে যাবে কি করে?

আজ একটু তাড়া ছিল। কমল বললে, যাবার কথা আটটায় —এখন সাড়ে নটা। যেতে যেতে সাড়ে দশ হবে।

কেন হে, সিনেমায় যাবার কথা ছিল নাকি?

কমল ঘাড় নাড়লে।

তা আর কি, কাল যাবে। সিনেমা তো আর পালাচ্ছে না।

তা বটে! হাসল কমল। কিন্তু আজকের দিনটা সামলাব কি করে?

ওঃ, মানের কথা বলছ তো! তা ভাই বি-এ পাস মেয়ের কি করে মানভঞ্জন করতে হয়, আমরা জানি নে। আমাদের মুখ্যুসুখ্যু বৌ, দু-একটা সন্দেশ পেলেই জল হয়ে যেত। বাজুবন্ধের আবদার ধরত না। হরুদা উত্তর দিলে।

আর দু-একটা হামি! অমল বাগচী বললে।

সেটা তো বলাই বাহুল্য!

আজকাল টেকনিক পাল্‌টে গেছে হরুদা!

আরে না, না, টেকনিক চিরন্তন, তাকে একটু রকমফের করে নেওয়া। কেউ সন্দেশ ভালবাসে, কেউ বা দই, কেউ বা ডালমুট,

কেউ বা আচার। আর সবাই গহনা। আর সঙ্গে ঐটে তো আছেই। ওটারও টেকনিক সেই একই।

না, এক নয়, অমল বাগচী বললে, হরুদা, তোমারা হচ্ছ মোপাসাঁ-পড়ুয়া। এখন হামিরও নানা কসরত বেরিয়েছে। যেমন—

খ্যামা দে বাপু। হামির কসরত নিয়ে তুই থিসিস লিখিস।

তা লিখব! আর সে থিসিসে কিউপিড ইউনিভার্সিটির ডি-ফিলও পাব। বই হয়ে বেরুলে সে-বই গরম পিঠের মতো বিকোবেও।

এমন সময় কেটলীতে চা আর ক'টা ভাঁড় নিয়ে এসে ঢুকল ক্লাবের বেয়ারা।

কমল বললে, এই রাম, জলদি চা ঢালো!

রাম চা ভাঁড়ে ঢেলে কমলের দিকে এগিয়ে দিলে। কমল চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে হাত ঘড়িটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

পৌনে দশটা।

সাড়ে দশটা কখন বেজে গেছে।

কোটির পাউডার-প্রসাধন আর বোঝা যায় না। কপালে কুমকুমের টিপটা এখনো জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু মুখে ক্লান্তির কলঙ্ক। বেনারসী এখনো পরিধানে। খোঁপায় ডোনাট বা বিঁড়ে দিয়েছে, সে বিঁড়েও বুঝি শিথিল। বেলফুলের যে মালা খোঁপা ঘিরে ছিল, তাও এখন ম্রিয়মাণ। অনীতা নিজেও স্তিমিত। অনীতা আপন মনে বললে, আর একটু দেখবো! তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ব।

আবার চুপ করে রইল, কপালে দুর্ভাবনার খাঁজ ফুটিয়ে বললে, কি জানি! কলকাতা শহর, কোন য়্যাকসিডেণ্টই হল নাকি?

পরমুহূর্তেই ঝংকার দিয়ে উঠল, না, না, আড্ডাবাজ আড্ডা দিচ্ছেন! আচ্ছা আসুক তো আজ!

চুপ করে বসে রইল অনীতা।

সময় চুইয়ে পড়ছে, বয়ে যাচ্ছে। অনীতা বসে আছে।

মুখে বিরক্তি, হতাশা, নৈরাশ্য।

বাহাদুরও বসে।

অনীতা একবার বলতে গেল, যা তো, দেখে আয় তো পথে। আবার কি ভেবে চুপ করে গেল।

হাতের ঘড়িটা দেখলে। এগারোটা।

অনীতা উঠে দাঁড়াল। বাহাদুরকে বললে, বাবু যখন আসে, তুই জেগে থাকিস—দরজা খুলে দিস! আমি শুইগে। তুই খেয়ে নে যা!

বাহাদুর মাথা নাড়লে।

রান্নাঘরে তোর খাবার ঢাকা আছে।

অনীতা শোবার ঘরে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল নিজের বিছানায়।

মডার্ন মেয়ে মেঝেয় লুটোয়, তার ডোনাট-দেওয়া খোঁপাও ভাঙে। অনীতার খোঁপাও ভেঙে পড়ল।

ঢং ঢং ঢং করে বাজল এগারোটা।

চায়ের ভাঁড়ে ভাঁড়ে ভরতি টেবিল। তাতে তলানিতে ভাসছে সিগারেটের টুকরো। ছাই জমা হচ্ছে। আড্ডাও জমেছে।

এগারোটা বাজতেই উঠে দাঁড়াল কমল।

আর নয়, এবার উঠি।

আড্ডাটা জমেছে, ভেঙে দিবি বাছা! হরুদা বললে।

তোমরা জমাও, আমি চলি।

আরে তোর বি-এ পাস বৌ কি আর ভাত কোলে করে বসে আছে! তার এখন দুপুর রাত।

তা হোক, দুপুর রাতের ঘুম ভাঙলে ঝগড়ার ভয় তো আছে।

কমল হাসলে।

ঝগড়া থামাবার মন্তর জানিস নে ?

তা জানি।

হ্যাঁ কচু জানো! এক বছর ঘুরে গেল এখন পর্যন্ত কুমার কি কুমারী সম্ভব করতে পারলি নে!

তোমরা সেকেলে, অমল বাগচী বললে, তোমরা জানো না, মডার্ন স্বামী-স্ত্রীরা বিয়ের পরে দুজনে দুজনকে চায়। সন্তান চায় না।

দুজনে দুজনকে চায়? সন্তান চায় না! হরুদা অবাক হবার ভান করলে।

তাহলে শোন, অমল বাগচী এবার শুরু করলে।

এই রে, আমি কাট্ মারি! কমল হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

অনীতা ধড়মড় করে উঠে বসল। নীল আলো জ্বলছে ঘরে।

বিগ-বেন ঘড়িটায় রেডিয়াম-দেওয়া কাঁটাটা দেখা যায়। এগারোটার ঘর অনেকক্ষণ আগে পার হয়ে চলে গেছে।

সে উঠে বেনারসীখানা ছেড়ে আলনায় রাখলো, তারপর একখানা ধূপছায়া রঙের শাড়ি টেনে নিয়ে পরলে, ঘড়িটা খুলে রাখলে, লকেট-হারখানাও। খোঁপা থেকে ডোনাটখানাও সরিয়ে রাখলে। হাত থেকে ক-গাছা চুড়ি। উঠতে তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মেয়েদের ভাল শাড়ির প্রতি মমতাই তাকে তুলে ছাড়লে। এবার আলুল চুলে এসে শুয়ে পড়ল। মাটিতে শুতে পারত, গোসা করলে তাই তো নিয়ম। কিন্তু সে-নিয়ম মডার্ন মেয়ে মানে না, তার বিরহ শয়ানে গদি-তোষক তো চাইই, ডানলপিলো হলে ভাল হয়। নরম ফাঁপা অনুভূতিতে বিরহ তার জমে ভাল। বসুধা-আলিঙ্গিনী তাই সে হয় না, বরং শয্যায় পাশ-বালিশ-আলিঙ্গিনী হতে পারে। অনীতাও তাই হল। পাশ-বালিশ আঁকড়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। ও এসে যদি শত চেষ্টাও করে, বালিশের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করতে পারবে না। শত সোহাগেও না।

ও যদি না হত তার স্বামী, সে যদি একক জীবন কাটাত—তাহলে ?

তাহলে আজ তো এমনি দশা তার হত না।

রঞ্জনকে চিঠি লিখতে পারত। চিঠিতে বলতো, রঞ্জন, তুমি এসো! নয়তো অফিসেরই কাউকে ডাকত। সবাই তো অনীতার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে ব্যস্ত ছিল। যখন-তখন তার কাছে যে-কোনো অছিলায় আসত। সীমন্তে সিঁদুর দেখে এখন ওরা আর আসে না, ঐ যে বড় বড় চোখ কাজল, সেও না।

অনীতা প্রথম যেদিন সিঁদুর পরে যায়, সেদিন ওরা অবাক হয়েছিল।

আগেই ওরা জানত খবরটা। কমলই রটিয়েছে। নয় তো কমলের দিকের সাক্ষী ভবানী। কিন্তু তবু সিঁদুর দেখে যেন আঁতকে উঠল।

সবাই একবার দেখে গেল, কেউ-বা বললে, একটা খবর দিলেন না, নেমন্তন্ন খাওয়ালেন না!

অনুযোগের সুরে হতাশাকে ঢেকে রেখেছিল।

কিন্তু কাজল আসে নি।

একসময়ে বড়বাবুর কাছে ট্রান্সফারের দরখাস্তটা দিয়ে সে যখন ফিরে আসছিল, কাজলের টেবিলের ধারে সে দাঁড়িয়েছিল কি ভেবে একটুক্ষণ। কাজল কথা বলে নি, তাকে দেখছিল।

অনীতার সেদিনের বেশভূষার কথা মনে আছে।

প্রথম দিন অফিস, বিয়ের পরে, একটু বিশেষ করেই সেজেছিল অনীতা। কাশ্মীরী সাদা রেশমের শাড়ি পরেছিল, একটা ব্লাউস পরেছিল ঘি রঙের, তার ওপরে অল্প শীতে একখানা গ্রামোফোনের কাজ-করা রেশমী ওড়না। তার ছাপা নানাবর্ণি আঁচলা নড়ছিল হাওয়ায়, ইচ্ছে করেই এলোমেলো করে তাকে রেখেছিল অনীতা। তাই ফ্যানের হাওয়ায় পাখনা-মেলা পাখীর মতো ওড়ারও সুবিধে পেয়েছিল।

কাজল চোখ দিয়ে চুনিয়ে চুনিয়ে শ্রীময়ী অনীতার সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। হঠাৎ অনীতা হেসে উঠল, সে কি কাজলবাবু, বিয়ে করে এলাম, একটা অভিনন্দন জানাবেন—তাও জানালেন না?

কাজলের বড় বড় চোখে ফুটে উঠেছিল মৃদু ভৎর্সনা। সে একটু লজ্জিত হয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছিল—অভিনন্দন!

অনীতা চলে এসেছিল বিজয়িনীর গর্বে।

কমল স্বামী, কাজলও তো হতে পারত! কমল সুপুরুষ। ডাকসাইটে সুপুরুষ। কাজল তা নয়। সে ভীরু, সে বুঝি কবি! সে হয় তো এমন হত না। সে হয়তো পোষ মানত। কমল সুপুরুষ বলেই পোষ মানে না। আড্ডাবাজ বলেই নীড়ে থাকতে চায় না। অথচ—ও হয় তো থাকত!

অনীতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল।

সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কমল এসেছে। টের পেলে অনীতা।

কমল বাহাতুরকে শুধোচ্ছে—মাইজী নিদ্ গিয়া?

বাহাতুর কি যেন বললে।

কমল এসেই হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখলে জামা, আলনায় এলোমেলো করে রাখলে ধুতি। টান মেরে লুঙ্গিটা নিতে গিয়ে একরাশ শাড়ি-জামা ফেলে দিলে। সেগুলো আবার স্তূপাকারেই তুলে রাখলে।

অনীতা দেখছে, সে ঝংকার দিয়ে উঠতে গিয়ে আবার থেমে গেল।

কমল লুঙ্গি পরে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

জল ঢালার শব্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে বেরিয়ে এল কমল।

আবার শোবার ঘরে।

অনীতা দেখলে, সুইচ টিপে একশো পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে দিলে কমল।

অনীতা তবু ধড়মড় করে জেগে উঠল না।

আলো সহ্য হয় না অনীতার, তাই আলো জ্বালানো নিষেধ। ঐ নীল বাল্‌বটা ছাড়া অন্য কোন আলো রাতে জ্বলে না। কমল শুধু ঘুম ভাঙাতে গেলেই ঐটি জ্বালায়।

কিন্তু আজ অনীতা জেগে থেকেও জাগল না। কমল আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ ঝংকার উঠল প্লেট আর গ্লাসের। ঠন ঠন টং টং। কত কি যে ভাঙলে কমল! অকর্মার ঢেঁকি! অনীতা উঠতে গিয়েও উঠল না।

অনীতার মনে পড়ল, আর একদিন তার নেমন্তন্ন ছিল। নেমন্তন্ন সেরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কমল এসেছিল তারও পরে। সে এসে তাকে ডাকেনি, চাপা-দেওয়া খাবার খেতে গিয়ে কয়েকটা প্লেট আর গেলাস ভেঙে কীর্তি করে ছিল। উঠে এসেছিল অনীতা।

কমল হেসে বলেছিল, দেখ, কেমন বাজনা বাজালাম! ঘুম তো ভাঙলো।

অনীতা গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছিল, এই বুঝি তোমার বাজনা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—তুমি এমনি আনাড়ী! ভাত ঢাকা আছে, নিয়ে খেতেও পার না?

কমল হেসে বলেছিল, তা কি আর পারি না! কিন্তু তোমাকে জাগাতে চাইলাম যে অনু। আর সেই জাগাবার ঐ তো বাজনা। জান, মহাকবি গ্যোয়টের হাত থেকে একদিন একখানা প্লেট পড়ে যায়। তিনি তার ঝংকার শুনে মুগ্ধ হলেন। তারপর বাড়িসুদ্ধু প্লেট সব—

থাম! কাল প্লেট কিনে নিয়ে এস। এই বলে অনীতা চলে

যাচ্ছিল, কমল আর একখানা আস্ত প্লেট তুলে নিয়ে বলেছিল, আমাকে তেমন ছেলে পাওনি। তাহলে আরো বাজাব।

অগত্যা অনীতা বলেছিল, না বাপু, এমন ছেলের সঙ্গে আর পারিনে বাপু!

তারপরে ভাব হয়েছিল। সেদিন সন্দেশ এনেছিল কড়া পাকের, সন্দেশ ভেঙে ভেঙে খাইয়ে দিয়েছিল অনীতাকে। অনীতা খাবে না, বলে ছিল, আমাব পেট ভরতি, বমি হয়ে যাবে।

না, খেতেই হবে!

সেদিন আজ আর নেই। অথচ সে তো সেদিনের কথা।

কমল খানিকক্ষণ পরে আবার ঘরে এল।

নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অনীতার খাটের ব্যবধান আজ ঘুচেছে, দুই খাট জোড়া দেওয়া। কিন্তু খাটের সীমা বেড-কভারের খাঁজে মালুম হয়। সে উঠে সীমা ছাড়িয়ে অনীতার বিছানায় এল।

একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল। চুলের উপর হাত রাখল অনীতার। অনীতা নিঃসাড়।

কমল আবার উঠে গেল, নিজের সীমায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ডুকরে কেঁদে উঠল অনীতা। দেখালে না কমলকে, কিন্তু তবু কাঁদলে।

কমল, তুমি আমাদের লাল তারিখকে কেন কালো করে দিলে!

কেন অমন করলে?

বাঙালী মেয়ে ফ্লার্ট করতে তেমন করে জানে না। যার সঙ্গে মেশে তাকেই স্বামী বলে নির্বাচন করে বলে কি তোমাদের এই উদাসীনতা?

উত্তাপ তোমাদের থাকে বিয়ের আগে, বিয়ের পরে ক'মাস—তার পর তো থাকে না। ঘরে এনে পুরে তোমরা নিশ্চিন্ত হও। তখন চরতে

বেরোও বাইরে। আগেকার জীবনে ফিরে যেতে চাও। কিন্তু মেয়েরা তো সেই কুমারী জীবনে ফিরে যেতে পারে না। তাদের নিজের হাতে গড়া নীড় তাদের টেনে রাখে—আর রাখে অনাগত সন্তানের আশা।

……অনীতা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে কমলের নাক ডাকানি ভেসে এল। অনীতা পাশ-বালিশে মুখ গুঁজে দিলে।

॥ সাত ॥

পরদিন।

থমথমে ভাব নিয়েই সকাল এল।

কমল ভোরে উঠতে পারে না। অনীতা চা নিয়ে এসে তাকে জাগায়। ধূমায়িত চায়ে চুমুক দিয়েই সে চোখ মেলে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। কিন্তু চা নিয়ে এল বাহাদুর।

কমল চায়ে চুমুক দিয়ে চোখ মেললে। অনীতা নেই।

সে চা শেষ করে বাথরুমে যাবার আগে একবার রান্নাঘরটা দেখে এল।

না, সেখানে অনীতা নেই।

বাথরুমের ভেজানো দরজাটা একটু ঠেলে দিলে। খুলে গেল দরজা। অনীতা সেখানেও নেই।

এবার পর্দা ফাঁক করে উঁকি মারলে বসবার ঘরে। অনীতা বেতের সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে কাগজ পড়ছে।

এমনি কাগজ পড়ে না অনীতা, কিন্তু রোজ সকালে কাগজ নিয়ে তার বসা চাই। হেডলাইনগুলো দেখে। তারপর অফিসেও নিয়ে যায়। সেখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখে। ওতেই যথেষ্ট, আলাপ-আলোচনায় যোগ দেবার সুবিধে হয়।

কমলেরও সেই দশা। আজকাল কাগজ পড়বার ফুরসত হয় না।

তবে হেডলাইনে তারও চোখ বোলানো চাই। অন্তত বিশ্বের বার্তার আন্দাজটা থাকা চাই চোখের সুমুখে। আজকাল ভাতের ভিতরেও রাজনীতি ঢুকেছে। তাই কথাবার্তার মোড় যে কোন সময়ে ঐ দিকেই ঘুরে যায়। না জানা থাকলে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে হয়। অন্যের কাছে না বলুক, নিজের কাছে ইডিয়ট বনতে হয়।

কিন্তু আজ কাগজ হাতে পাওয়া দুর্ঘট। অনীতা সেটির মৌরসী স্বত্ব নিয়ে বসে আছে।

অন্যদিন বসে থাকলে কেড়ে নেওয়া যায়, চেয়েও নেওয়া যায়—কিন্তু আজ তা চলে না।

তবু উসখুসানি নিয়ে কমল এল তার কাছে।

অনীতা কাগজে মুখ ঢেকে ছিল। মুখ ঢেকেই রইল।

কমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হেডলাইন দেখতে লাগল।

কাগজ সরিয়ে নেয় না অনীতা, প্রথম পাতাটা একরকম দেখা সারা। কিন্তু এবার পাতা তো ওলটাতেই হবে।

একটু বা টানই দিলে কমল।

কাগজটা তার হাতে ঠেলে দিয়ে অনীতা উঠে দাঁড়াল।

আরে না, না, তুমি যে শীটটা পড়ছ, পড় না!

অনীতা কথা বললে না, শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। তার মুখে ভ্রূকুটি। কমলকে এবার মান ভাঙাতে হবে। একটা পুঁতির ব্যাগ করছে অনীতা। ম্যাজেণ্টা রঙের পুঁতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে সাদা পুঁতি। নকশা তুলছে ঘর গুণে গুণে। সেইটেই সে নিয়ে বসল।

কমল গিয়ে বসল গ্যাঁট হয়ে।

অনীতা তাকিয়েও দেখলে না।

কমল হেসে বললে, তোমার পুঁতিতে মন নেই। মনটা আমার দিকে। ঘর গোনায় ভুল হচ্ছে।

অনীতা পুঁতি গাঁথা থামিয়ে বললে, তোমার দিকে মনটা থাকতে পারে, কিন্তু সে মন বিষমন।

তা কি আর জানি না! কিন্তু কাল আমার কোন দোষ ছিল না।

তোমার কৈফিয়ত তো আমি চাইনি।

বাঃ রে, কৈফিয়ত দেব না! কমল উত্তর দিলে, আমার অন্যায়, কৈফিয়ত তো আমাকেই দিতে হবে।

তোমার ন্যায়-অন্যায় তোমার ব্যাপার, আমার কিছু নয়। অনীতা তীব্র স্বরে জানালে।

তোমার না হয়েও কিন্তু পারে না। তুমি আমি তো আর ভিন্ন নই।

কে বললে, ভিন্ন নই?

বলেছে, বিয়ের রেজিস্ট্রারী দলিল।

সে দলিল আবার ভিন্ন করেও দিতে জানে।

তা বটে, সে তো হাতিয়ার।

সেই হাতিয়ার আমার হেফাজতে, আমি তা ব্যবহার করব। অনীতা বললে।

তা কর! কিন্তু যাদের হাতে আঁশবটি, তাদের হাতে ও হাতিয়ার মানাবে কেন? হাতিয়ার দোলাতে গেলে বিপদ হবে।

সে-বিপদ এই বাংলাদেশে হাজার হাজার মেয়ে বরণ করছে, আমিও করব।

কমল বললে, হ্যাঁ, হিন্দুকোড বিলের দৌলতে তা হয়েছে বটে কিন্তু তুমি তো কোডবিলে পড় না, তুমি তিন আইনের মানুষ।

কিন্তু দুটোই বিবাহ-বিচ্ছেদ।

দুটোতেই নানা ফ্যাকড়া, হুট্ করে সুরাহা হবার জো নেই।

নেই? হতাশ হয়ে বললে অনীতা।

কমল হেসে বললে, হাতিয়ার দোলাতে চাও, অথচ তামেচা-বাহেরাও জান না, প্যাঁচ তো দূরের কথা !

আমি না জানি, য়্যাটর্নি ধরব।

হ্যাঁ, তা ধরতে পার, কিন্তু সাত মণ ঘি পুড়বে।

পুড়ুক গে, সে আমি বুঝব।

বুঝতে হয় বোঝ, কিন্তু চেনা য়্যাটর্নি হলেও হাজারটি টাকা খরচা। তাতে আবার যদি আমার নিজের পক্ষ সমর্থন করি, তখন তো আরো খরচা হবে। আর ঐ সিঁথির সিঁদুরটুকু ঘুচতে সময়ও ঢের নেবে।

তুমি বল—কি করব ? নিজের অজান্তেই বলে ফেলল অনীতা।

তাহলে আমার উপদেশ চাও ?

অনীতা কথা বলল না, চুপ করে রইল। আবার তেমনি থমথমে ভাব।

কমল বলতে লাগল, কিন্তু কি এমন ব্যাপার হয়েছে, যাতে অমনি ডাইভোর্সের কথা উঠলো ?

তুমি বুঝবে না, কি ব্যাপার! অনীতা মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলে।

বলেছি তো, হাতিয়ার আনাড়ীর হাতে পড়লে বিপদ হয়।

অনীতা বসে রইল।

কমল বসবার ঘরে গিয়ে ততক্ষণে খবরের কাগজে মন দিয়েছে।

কাটাঙ্গা আর রাশিয়ার মেগাটোনের খবরে তার মন চলে গেছে।

সকালটা যাহোক করে কেটে গেল। খাওয়া-দাওয়া হল না। অরন্ধন। অনীতা শুয়ে আছে, কমলও বসে রইল।

বিয়ের পরে অফিসে যাবার আগে স্বামী-স্ত্রী সম্ভাষণ জানাত

অনেকক্ষণ ধরে। তারপর দুজনেই একসঙ্গে বেরুত। সার্কেল টুর অফিসের সুমুখে অনীতাকে ছেড়ে দিয়ে কমল যেত তার অফিসে। আজকাল আর তা হয় না। কমলই একদিন বলেছিল, আমার কেমন লজ্জা করে!

কেন—আমি সুন্দরী নই বলে? অনীতা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল।

সুন্দর-অসুন্দরের কথা নয়, কমল মাথা নাড়লে, কথা হচ্ছে স্ত্রী নিয়ে অমন করলে সবাই—

স্ত্রৈণ বলে—এই তো?

হ্যাঁ, তাই।

তাহলে যেয়ো না! অনীতা বলেছিল। দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছিল।

তারপর থেকে দুজনে একসঙ্গে বেরোয় না। কমল সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানে, আর অনীতা বেরিয়ে যায়। অনীতা যাবার সময় বলে, যাই।

কমল মাথা নেড়ে বলে, আচ্ছা!

এক-একদিন অনীতার বেরুবার মুখে কমল ডাকে, এই শোন!

কাছে এগিয়ে আসে অনীতা। কি ব্যাপার?

আজ যে বিজয়িনীর সাজ, কাকে বিজয় করতে চললে?

আমার আবার বিজয় কি! তদানাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়, অনীতার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শুষ্ক হাসি ঝরে পড়ে।

না না, হাত ধরে একেবারে কোলের উপর বসাতে চায় কমল, একটু থাকো!

ওরে বাবাঃ, থাকব কি করে? আমাদের সাহেব ভারি কড়া। সাড়ে দশটার পরেই হাজিরে বই নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দেন।

রেখে দেয় তো দেয়! আজ যেয়ো না!

জানো, আমার আর্নড্ লিভ সব ফুরিয়ে গেছে! না গেলে মুশকিল।

যে কথা রাখতে চায় না, কমল বলে, তার ছলের অভাব নেই।

তাহলে আমি দুরাত্মা। অনীতা হাসে।

না, না, তুমি দুরাত্মিনী।

আচ্ছা বেশ গো বেশ, গালের উপর ঠোঁট বুলিয়ে নিয়ে আলগোছে চলে গেছে অনীতা।

কিন্তু আজকাল সে সম্ভাষণটুকুও নেই।

আজকাল দুজনে আলাদা আলাদা বেরোয়। সার্কেল টুতে গিয়ে ধরনা দেয় না কমল। তবু একটানা স্রোতে চলেছে জীবনধারা। এও জীবন, আর এই জীবনই হাজার হাজার মানুষ কাটায়। কিন্তু আজ যেন জীবনতরঙ্গে কোথায় বাধা এসেছে। তাই অনীতা শুয়েই রইল, কমল বসে বসে সিগারেট পোড়াল।

এক সময়ে কমল উঠে পড়ল। মেয়েদের মন সে জানে। কোন্ পুরুষই বা না জানে! ঐটেই পুরুষের গর্ব! সে ভাবলে, ওটা এসে মিটমাট করে ফেলবে। এখন সদ্য-সদ্য ঘাঁটাতে যাওয়া ঠিক নয়। এখন রাগ আছে। আদর-সোহাগে সে-রাগ আরো ফুঁসে উঠবে। তার চেয়ে সময় দেওয়া ভাল। রাতে মিটমাট করবে।

কমল উঠে একবার পর্দা সরিয়ে শোবার ঘরে উঁকি মারল।

অনীতা শুয়ে আছে মুখ ঢেকে।

সে এবার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিল।

অনীতা এখনো শুয়ে। মুখ ঢেকে শুয়ে। কমল তাকে ডাকলে না। সে অনীতাকে শুনিয়ে বাহাদুরকে বললে, আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাব। দরকার আছে। খাব না।

তারপর একবার শোবার ঘরে এল। ড্রেসিং-আরশিখানার সামনে দাঁড়াল। চিরুনিখানা দিয়ে ব্যাকব্রাশ করলে চুল। একটু বা কাশল, গলা-খেকারি দিলে।

কিন্তু শয্যায় শায়িতা নারী নীরব, নিস্পন্দ।

আপন মনে বলে উঠল কমল, আমার কি, কোথাও চাপাটি আর শিক-কাবাব খেয়ে নেব। -

কমল আগে আগে একথা বলে ফল পেয়েছে হাতে হাতে।

অমনি অনীতা উঠে বসেছে, বলেছে, খবর্দার, না খেয়ে যাবে না!

কমল তখনি হেসে ফেলে বলেছে, কথা নাকি বলবে না! এই তো বললে!

অনীতা রেগে গিয়ে মুখ ফিরিয়েছে।

কমল হেসে বলেছে, তোমরা শরৎবাবুর নায়িকা, খাইয়েই তোমাদের সুখ।

অনীতা কথা বলে নি।

কমল বলেছে, শপথ তো ভাঙলো, আর কেন?

সে কাছে গিয়ে জোর করে খুলে দিয়েছে মুখের কাপড়।

অনীতা ককিয়ে ওঠার ভান করেছে, উঃ ছাড়, ছাড়!

আর তখন ভাব হতে দেরি হয় নি।

কিন্তু আজ ও-কথায়ও কাজ হল না।

তবু কমল একটু দাঁড়াল। গলায় পাউডার লাগালে। মুখে পাউডার লাগিয়ে ঘষলে দুহাত দিয়ে। রক্তাভ হয়ে উঠেছে মুখ। এই রক্তাভ মুখ দেখতে অনীতার ভাল লাগে। অনীতা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। এখনো দেখে। কিন্তু আজ আর দেখলে না।

আজ নারী দুর্জয় অভিমানে অভিভূতা, আজ কোপবতী নারী। এ কোপ কে ভাঙাবে?

কমল আপন মনে বললে, ভাঙাব, আজ কোপ ভাঙাব! দাঁড়াও, ফিরে আসি! মান ভাঙাবার ওষুধ আমি জানি।

কমল বেরিয়ে গেল সশব্দে।

বিকেলে ছুটির পরে নিউ সেক্রিটারিয়েটের হরুদার সঙ্গে দেখা।

হরুদা বললেন, চল্, ক্লাবে চল। খাওয়া-দাওয়া আছে।

কমল অমনি লাফিয়ে উঠল, তারপরে অনীতার কথা মনে হতে বললে, না আজ যাওয়া হবে না।

সে কিরে! অবাক হয়ে গেলেন হরুদা।

না, কমল সোজা বাড়িমুখো হল।

বাড়ি এসে দেখলে বাহাত্বর দরজার স্থমুখে বসে আছে। দরজা ভেজানো।

কি রে, মাঈজী কোথায়? কমল শুধালে।

বাহাত্বর ভাঙা বাংলায় বললে, মাঈজী বাহার চলী গয়ী।

কমল ঢুকল ঘরে। এবার টেবিলের দিকে তার নজর পড়ল।

টেবিল ফাঁকা, একটা টিপট বা চায়ের পেয়ালা-পিরিচও নেই।

কমল বাহাত্বরকে শুধালে, বাহাত্বর, মাঈজী কখন গেছে?

জী, আধা ঘন্টা হোগা।

কমল শোবার ঘরে ঢুকল। আলনায় অনীতার পাট-করা শাড়ির দেখা নেই। নেই এ-কোণে, ও-কোণে তালগোল পাকানো পরিত্যক্ত শাড়ি। সব নিয়ে গেছে। শুধু কমলের ধুতি সেখানে কোঁচানো রয়েছে। অনীতার চামড়ার স্থটকেশটিও নেই। অথচ ত্বধারে ত্বটি সিংগল কট, তেমনি নীল বেডকভার-মোড়া পড়ে আছে।

কমল নিজের খাটের উপর বসল। এখান থেকে ড্রেসিং মিররে ছায়া পড়ে। কমলও কখনো কখনো তাকিয়ে সে-ছায়া যে না দেখে এমন নয়। নিজের মুখ দেখতে তার ভাল লাগে। কার না ভাল লাগে! আবার কমলের মুখ তো স্থন্দর। আজও তাকালে। তাকাতে গিয়ে নজর পড়ল, চেস্ট অফ্ ড্রয়ার্সের উপরে চাপা দেওয়া একখানা ভাঁজ করা কাগজ।

কমল কাগজখানা তুলে নিয়ে এসে আবার খাটে বসল।

অনীতা মেয়েলী গোটা গোটা হরফে লিখেছে, আমাদের আর এক সাথে থাকা চলে না, তাই চললাম।

কমল ঐটুক পড়েই হাসল। এতদিন কলকাতায় থেকেও 'সাথে' বলে। ঐ বাঙালে অভ্যাস গেল না। আবার চিঠি পড়ায় মন দিলে।

তুমি না বলেছিলে তোমার এক প্রিয় ইংরেজ লেখকের লেখা চুরি করে—মেয়েদের ভালবাসা পেঁয়াজের মতো। খোসা ছাড়াও, ছাড়িয়ে যাও, তবে তো পাবে তার ভালবাসার আসল মালটুকু। কিন্তু পুরুষ দু-একটা খোসা ছাড়িয়ে আর ছাড়াতে চায় না। তাই আসল জিনিসটুকু পায় না। খোসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তুমি কথাটা বলে হাসতে। বলতে, ভালবাসা একটা মিছে কথা। আমিও হেসেছি। কিন্তু আজ দেখছি তোমার খোসা নিয়ে চললেও আমার চলে না। খোসা দিয়ে সব হয়, নীড় রচনা হয় না। যাহোক, আমি চলি। তুমি আমার নামে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি আনতে পার!

কমল এটুকু পড়ে থামল, আবার পড়ল। অনীতা ঝোঁকের মাথায় কথাটা লিখেছে। আবার তাতে মোটা করে কালি দিয়ে দাগিয়ে দিয়েছে।

কমল হাসল, হাতিয়ার পেয়েছে হাতে, দোলাবেই তো! বাচ্চা ছেলে যেমন মেলায় নতুন ছুরি কিনে কাটাকুটি করে, টেবিলে-চেয়ারে ছুরির ধার পরীক্ষা করে—এও তেমনি।

কিন্তু যদি ডিভোর্স ই করতে হয়, তাহলে কোন্ কারণে?

কমল ভাবতে বসল।

য়্যাডালট্রি বা ব্যভিচার—না, না, কেলেঙ্কারী!

আছে ক্লীবত্ব!

না, না, কমল আর যাই হোক, সে পুরুষ।

তাহলে?

এক আছে মানসিক যন্ত্রণা—আইনের ধারায় যাকে বলে মেণ্টাল ক্রুয়েলটি। ওটার অর্থ টা কম্বলের মতো ব্যাপক। যা কিছুকে ওর

ভিতরে মুড়ে নেওয়া চলে। দাম্পত্য-কলহ থেকে সন্তান না হওয়া—সবকিছু। ঐটেই অতি উত্তম হাতিয়ার। ঐ হাতিয়ারটিতে য়ুরোপিনীরা স্বামীকে ঘায়েল করে, এদেশিনীরাও তাই করতে পারেন।

কিন্তু কমল নিষ্ঠুরতা কোথায় দেখালে ?

কমল হাসল, দূর হোক গে ছাই! অনীতা তুদিন পরেই ঘুরে আসবে। আর তার আগে কমল আবার কুমার-জীবনের স্বাদ নেবে।

বাবাঃ, একবছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে কুইনিনের বড়ীর চিনি-টুকু উপে গেছে, এখন শুধু তেতো!

কমল বাহাতুরকে ডাকলে, এই ইধার আও তো বাহাতুর!

বাহাতুর ছুটে এসে দাঁড়ালে।

রান্না করতে পারিস্ ?

জী হুজুর, রোটী, ভাত···বাহাতুর দাঁত বের করে বললে।

আচ্ছা আচ্ছা এখন যা! মোড়ের পানওয়ালার কাছ থেকে আমার নাম করে এক প্যাকেট পানামা নিয়ে আয় তো!

বাহাতুর চলে গেল।

আরামসে সিগারেট খাওয়া যাবে! কমল আপন মনে বলে উঠল।

সিগারেট সম্পর্কে অনীতার বিরূপ ভাব। বিয়ের আগেই সে-ভাব সে প্রকাশ করেছিল। কমলকে বলেছিল—তুমি মুখের কাছে মুখ এনো না তো ? বদ গন্ধ ছাড়ে!

কমল বলেছিল, আমার মুখে তো বদ গন্ধ ছাড়ে না। এ যে কস্তুরী গন্ধ।

অনীতা ঝংকার দিয়ে উঠেছিল, হ্যাঁ, সিগারেট-বিড়ির গন্ধ কত কস্তুরী গন্ধ!

সে কি, ঐ গন্ধ তোমার সয় না ? কত মেয়ে তো আজকাল সিগারেটে সুখ টান দেয়।

যে দেয় সে দিক গে। আমার বাপু মাথা ঘোরে। আর অত সিগারেট খাওয়া ভাল নয়। ক্যানসার হতে পারে।

ওঃ—তুমি তো ভারি ডক্‌টর রায় এলে!

ডক্‌টর রায় না হই, খবরের কাগজ তো পড়ি। দেখ—সিগারেট টানা চলবে না!

সে কি, প্রথমেই শাসনের বেত তুললে?

তুলবই তো!

শেষে প্রেমিক-প্রেমিকার রফা হয়েছিল।

একটা কৌটোয় এলাচদানা থাকবে, যখন অনীতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাবে কমল, তখন এলাচদানা চিবিয়ে নেবে। আর সেই এলাচ-গন্ধী জিভে জিভ ঠেকাবে। আর সিগারেটও খাবে কম।

কমল কথা রাখে নি। বহুবার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলে অনীতা ফিরিয়ে দিয়েছে। কমল বাগ মানে নি। তাহলেও এলাচদানা তাকে চিবোতে হয়েছে।

আজ সে বালাই নেই।

বাহাদুর সিগারেট নিয়ে ফিরে এলে বললে, পানামা বদলে ক্যাপস্টান নিয়ে আয়! বিশটার প্যাকেট আনিস!

এমনি সে পানামা খায়। ক্যাপস্টানের খরচ অনেক। বিয়ের পরে সেই খরচ সংক্ষেপ করতে হয়েছে। তাছাড়া টোবাকো কোম্পানিও রকেটের মতো দাম বাড়াচ্ছেন। কিন্তু পানামারও বরাদ্দ মাপা। একেবারে স্ট্রিক্‌ট রেশনিং। রোজ দশটা, তার বেশি নয়। অবশ্য বরাদ্দ-প্রথা যে ভাঙে না তা নয়। কিন্তু ধরা পড়লে বকুনিও খায়।

আজ আর বরাদ্দ-প্রথা নেই, বকুনি নেই। আজ স্বাধীন, নিয়মহীন জীবন।

বাহাদুর সিগারেট নিয়ে ফিরে এলে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল কমল।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ঘর। সিগারেটের ছাই পড়ল বিছানায়, একটু বা পুড়েই গেল। অন্যদিন হলে অপরাধী ভাব ফুটে উঠত। কিন্তু আজ বেপরোয়া।

অনীতা তো বলবে না, আমি টাকা খরচ করে কিনি, আর তোমরা আছ পোড়াতে।

তোমরা এখানে বুঝি ক্লিষ্টার্থে বহুবচন, কমল উত্তর দেয়।

অনীতা কথা বলে না। পালকের ঝাড়ন এনে ছাই ঝেঁটিয়ে ফেলে।

কিন্তু আজ ছাই ছড়িয়ে রইল। কমল নির্বিকার। নির্লিপ্ত। যেন নির্বাণ পেয়েছে।

নির্বাণ—সংসারের ঝামেলা থেকে নির্বাণ।

ধোঁয়ার ঝলক কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ে চলল।

॥ আট ॥

কমল দুদিন বেশ কাটালে। দিব্যি বাহাদুরের পাকানো ভাতে সেদ্ধ ভাত খেয়ে আপিসে গেল, আপিস থেকে ছুটল ক্লাবে। ক্লাবের থেকে রাত বারোটায় ফিরল বাড়ি। তারপরে ঘুম।

দুদিন বেশ কাটলো।

কিন্তু তৃতীয় দিনে ক্লাবের সবাই চলে যেতেও সে বসে রইল।

হরুদা শুধালে, তোর কি হয়েছে? অন্যদিন তো আটটা থেকেই উঠি-উঠি করিস!—

কমল বললে, উঠি-উঠি তো করি, তোমরা উঠতে দাও কোথা? তাই ঠিক করেছি, আড্ডা দেব। তোমরা উঠতে চাইলে টেনে বসাব।

বাপ! এযে একেবারে তেরিয়ামেরিয়া মরিয়া ব্যাপার! বৌ কি জবাব দিয়েছে নাকি?

কমলের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, তবু হাসি টেনে বললে, দিলে তো বয়ে গেল !

হরুদা মাথা নেড়ে বললেন, আরে না, না। আজকালকার মেয়ে, তায় আবার ইকোনমিক ফ্রীডম—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে। ওরা কখন কি করে বসে !

কমল চুপ করে রইল।

ক্লাবে আর যায় না সে।

আপিস থেকে ঘরে ফিরে আসে। বসে বসে বইয়ের পাতা ওল্‌টায়। আর সিগারেট টানে ! এ একরকম নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।

বেশ চলেছে ! শুধু বৌ অভ্যেস হয়ে গিছল, সেই অভ্যেস বশে মনে পড়ে অনীতার কথা। ঘরটায় অনীতার চিহ্ন সর্বত্র, সে এলোমেলো করে ফেলেছে, কিন্তু চিহ্ন মুছতে পারে নি। দেয়ালে টাঙানো ফোটো থেকে, মশারীর টাঙানোর দড়িটা পর্যন্ত অনীতার স্পর্শে মাখামাখি। মনেও স্পর্শ আছে।

ঘুম থেকে আচমকা জেগে ওঠা তার স্বভাব। তখন সে অনীতাকে ডাকে। এরই মধ্যে একদিন ডেকে উঠেছিল।

সাড়া না পেয়ে খাটের দিকে তাকিয়েছিল। শূন্য শয্যা।

তবু কমল শূন্য শয্যা পূর্ণ করবার জন্যে অনীতাকে পায়ে ধরে সেধে আনবে না। কখনো না, কভী নহীঁ, নেভার !

তবে সে চায় কথাটা চাপা থাক। আপোসে ডাইভোর্স করে নেবে।

ডাইভোর্স কথাটা মনে হতে একটু বা থমকে যায়। চিরন্তন সংস্কারে লাগে।

ডাইভোর্স। কত জনে কত কথা বলবে।

কমল আরশির সুমুখে গিয়ে দাঁড়ায়। তরুণ সে নয়,

কিন্তু প্রৌঢ়ও সে নয়। সেও জুটিয়ে নেবে সাথী। কার তোয়াক্কা করে সে।

আপিসে কথাটা জানাজানি হয়ে গেল।

অনীতা একই আপিসের মেয়ে। সার্কেল টুতে কাজ করে। এ আপিসে ও-আপিসে যাতায়াত আছে। একান আছে, ও-কান আছে। পুরুষের নজর আছে, মেয়েদের আছে কৌতূহল।

সেদিন কমল আপিসে আসতেই কমলকে ডাকলেন বড়বাবু।

লোকটি সাদাসিদে। বুড়ো মানুষ। কমলকে ভালও বাসেন। হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন। কমল আসতেই বললেন, বসো। কি হয়েছে বৌ-মার সঙ্গে ?

কমল প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল, তারপর বললে, কই কিছু না তো।

না তো কিরকম। সবাই যে বলছে, তোমাদের বিয়ে ভেঙে গেছে, বৌ-মা আবার বোর্ডিং-এ ফিরে গেছেন ?

সবাই বলছে ?

হ্যাঁ, আরো কত কথা। সে সব আর না শুনলে ভায়া। আমার একটা কথা শোন। যদি পথ থাকে তো বৌমাকে নিয়ে এস। আর পথ থাকবে নাই বা কেন ? মান ভাঙাতে পারবে না ? সন্তান হয়েছে ?

আজ্ঞে—সবে তো একবছর—

ঐ তো তোমাদের দোষ। সন্তান দিয়ে বাঁধতে হয়, নইলে মেয়েদের ঘরে বাঁধবে কিসে।

সন্তান হলেও তো ছেড়ে চলে যায়।

তারও কারণ থাকে। যাও, গিয়ে নিয়ে এস। আই উইস ইউ সাক্‌সেস। উও হাব য়্যাণ্ড উইন হার।

বড়বাবু ইংরেজীতে অনার্স, সেকথাটা কখনো ভোলেন না। কথায় কথায় ইংরেজী বলেন।

কমল উপদেশ মাথা পেতে নিয়েই চলে এল।

কিন্তু টেবিলে বসেও স্বস্তি নেই। সবাই তারই দিকে তাকাচ্ছে।

ঐ যে কাজল, ও চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।

ঐ যে মোহিত, ওর তাকাবার রীতিটাও তো যেন কেমন!

ঐ যে শীলা, ওর চোখে যেন করুণা। না, চোখ রগড়েছে বলে ওর চোখে অমন সজল ভাব?

কমল জানে, শীলার ওর ওপর একটু টান ছিল।

ঐ যে ক্ষমা, ওর চশমার ফাঁক দিয়ে অমন ট্যারচা চাউনি ছুঁড়ে মারছে কেন?

না, না, ওর চোখ একটু ট্যারা। তাকাতে গেলে টেরিয়ে তাকায়।

হয়তো কারো দৃষ্টি ওর উপরে নেই, তবু মনে হয়, উপহাসের দৃষ্টি তাকে বিঁধছে।

কমল একটা ফাইল টেনে নিলে।

কিন্তু দৃষ্টি যেন বিঁধছে।

সে উঠে পড়ে বড়বাবুর কাছে ছুটি চাইলে।

এক্সিকিউটিভ অনুপস্থিত, বড়বাবুই সর্বেসর্বা। তিনি ছুটি মঞ্জুর করলেন। কমলকে বললেন—

ট্রাই টু উইন হার মাই বয়!

যেন বৃদ্ধ পাদরীর উপদেশ! রেভারেণ্ড কালীমোহন এলেন!

নিজেরই হাসি পেল কমলের। কমল চলে এল।

ক্যান্টিনে চা খেয়ে, এখানে ওখানে ঘুরে, পার্কে ঘাসের বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানতে-টানতে বেশ কাটিয়ে দিলে।

পাঁচটার আগেই সার্কেল টুর আপিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এ আপিসের সবাই চেনা। তাই একটা পানের দোকানের সুমুখে সিগারেট কেনবার অছিলায় দাঁড়াতে হল।

রজনীগন্ধার ডাঁটি নয় অনীতা, তবে দোহারা চেহারা। ছিম-

ছাম গড়ন। সাজেও রুচিমাফিক, আজও সেজেছে। পরনে ফিকে নীল শাড়িখানা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরেছে, গায়ে ম্যাচ করে ব্লাউজ।

ধূর্জটিপ্রসাদ হলে বলতেন, নীল পাখী।

বিরহও তো নীল, অভিসারের রংও তো নীল। এ কোন নীল ?

কিন্তু বিরহের তো লক্ষণ নেই, চুল বেশ আঁটো করে বাঁধা। মুখে পাউডারের সদ্য প্রলেপ। এইমাত্র বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে সেরে এসেছে প্রসাধন। বরং অভিসারিকার মতো দেখায়।

কমল সামনে এসে দাঁড়াল।

ভ্রূকুঞ্চিত করলে অনীতা।

শোন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কথা নেই, পথ ছাড়! অনীতা চারিদিকে তাকিয়ে বললে।

না, ছাড়ব না!

দেখ, নাটক করো না!

নাটক তো আমি করছি নে, কমল তীব্র অথচ অনুচ্চ স্বরে বললে, তুমিই তো এখন ইবসেনের নায়িকা।

অনীতা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

কমল বললে, যাবে কি না বল ?

যাব না! আমাদের সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে।

শেষ তো হয়নি। এখনো আমরা আইনত স্বামী-স্ত্রী।

আইনের বাধাটা শেষ করে দিলেই হয়, অনীতা রেগে উঠল।

তাহলে চল একটা নিরালা জায়গায়। সেখানে কাগজে আমি সই করে দেব। তুমি আমার নামে মামলা রুজু করবে।

আজ নয়। আর মামলা আমি করব না, দরকার হয় তুমি করবে।

না!

তাহলে থাক্ তোমার মামলা! এই বলে হন্‌হন্ করে পা চালিয়ে দিল অনীতা।

কমল ছুটবে তার পেছনে, এমন সময় দেখলে, একটা ট্যাক্সী এসে থেমেছে। আর সেই ট্যাক্সীতে একজন আরোহী। যুবক বলা যায় না, প্রৌঢ়। সে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলে, অনীতা উঠে বসল।

মিলিয়ে গেল ট্যাক্সী।

কমল তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

॥ নয় ॥

কমল ইডেন গার্ডেনে বেঞ্চিতে বসে কাটাল না রাত, লেকে ডুবতে গেল না। ওগুলো সাবেককেলে ব্যাপার। এমন কি, একেলে সায়ানাইডও সে খেতে গেল না। রোমানদের মতো শিরা কেটেও মরতে চাইল না। তা ছাড়া সে-সব প্রেমেই সম্ভব, দাম্পত্য জীবনে চলে না। কমল বাড়ি এসে শুয়ে পড়ল।

চিরন্তন ত্রিভুজ। ইটার্নাল ট্রায়াঙ্গেল। ঐ বুড়ো লোকটা কোথায় ছিল, নামও শোনে নি কখনো কমল। ও তো অনীতার বাপের বয়সীই হবে। আজকালকার মেয়েরা ইয়াঙ্কিমেয়েদের মতো সুগার ড্যাডী—চিনিমাখা বাপ পাকড়ায়, তা সে জানত না। কিন্তু বাঙালিনীরা তাও শুরু করেছে। তাহলে জুলফিতে পাক ধরলেও আশা থাকে, আশা নিবে যায় না।

কমল সিগারেটে কষে টান মারল।

অনীতা আজ কয়েক দিন হল গেছে। সে আবার ফিরে আসতে পারে—এই ছিল আশা। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ আছে পিছনে। সে আর আসবে না।

আবার আশা হল, সে হয়তো ওর কাকা, নয় তো অমনি কেউ।

কমল নিজেই হেসে উঠল।

ওগুলো বৃথা মনকে বোঝানো। কাকা বা মামা ট্যাক্সী নিয়ে প্রতীক্ষা করে না। প্রতীক্ষা করে প্রেমিক।

বৃদ্ধ প্রেমিক আরো বেশী প্রেমে ডগমগো। বৃদ্ধ প্রেমিকের গ্ল্যাণ্ডগুলির ক্রিয়া আরো তীব্র।

কমল আবার হাসল। হেসে সিগারেট ধরালো।

ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাক ভাবনা, পুড়ে ছাই হয়ে যাক ভাবনা! উড়ে পুড়ে যাক ভাবনা!

ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায় না ভাবনা। মগজে জমে। সিগারেটের ধোঁয়া তাকে ওড়াতে পারবে না। মগজ তৈরি করে সংযোগস্থল, তৈরি করে পাত্র-পাত্রী। তৈরি করে ঘটনা, ঘটনায় থাকে কাঁটা। কাঁটার কোঁড় খায়।

অনীতার কথা ভেবেছে কমল, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেমিককে জুড়ে দেয়নি, এবার জুড়ে দিলে।

অনীতা আর প্রেমিক।

প্রেমিক বলে, ঐ কমলটার কথা এখনো ভাবছ?

অনীতা মাথা নাড়ে।

হ্যাঁ, ভাবছ! ও তোমাকে কি দিতে পারবে? ঐ তো এল-ডি ক্লার্ক—আমি তোমাকে সব দেব।

দেবে—কি দেবে? অনীতা ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

সব—সব!

সব কি? অনীতার চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে।

তুমি জান না? প্রেমিক তার হাত ধরে।

অনীতা একটু হেলে পড়ে কোলের উপর।

কমলের ভাবনা আর এগোয় না, ভারতের কবি ঈর্ষাকে বিষ বলেছেন, কিন্তু ইংরেজ কবি ঈর্ষার নাম দিয়েছেন সবুজ-চোখো দানব। ঈর্ষার রং সবুজ। কি জানি!

অনীতা ভাবে, আবার ভাবেও না।

মেয়েরা অত বুঝি ভাবতে বসে না।

তারা সেদিক দিয়ে কেজো, প্র্যাকটিক্যাল।

কুমারী জীবনে পুরুষকে তারা যদি বা এড়িয়ে চলে, কিন্তু বিবাহের পাসপোর্ট পেলে তারা তা করে না। আবার স্বামী ছেড়ে এলে পুরুষ অবলম্বন তো চাই-ই। অনীতা দ্বিতীয় পুরুষের জন্যে স্বামী ছাড়ে নি, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষের তার দরকার হল।

পুরুষ ছিল। অফিসের সহযোগীরা। কাজল, অমল, অমিয়। তাদের দৃষ্টি দেখে অনীতা জানে, তারা তার সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে। নইলে, কথা বলতে এসে চোখ দুটি কেমন হয়ে আসে কেন? কাজল তো এদিকে যেন একটু বেশি-বেশি। ভক্তের মতো যেন পূজা করে। নয় তো আধুনিক উপমায় বলা যায়, কুকুরের মতো ভক্ত। যেন ল্যাপডগ্। যেন পুডল্। ওদের নিয়ে কমলকে জব্দ করতে অনীতার শালীনতায় বাধে, তাই সে রঞ্জনকে খুঁজে বের করলে।

এই কলকাতা শহরে মানুষ হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে বের করতে হয়। রঞ্জন হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পাত্তা ছিল। কিসের যেন চালানী ব্যবসা করে সে লাখোপতি না হোক, কয়েক হাজারপতি। কিন্তু হাজারপতিই হোক আর যাই-ই হোক, এখনো একটি পত্নীরও পতি হতে পারে নি। বা হয় নি।

রঞ্জনের অফিসে গিয়েই হাজির হয়েছিল অনীতা।

রঞ্জন অবাক হয়েছিল।

সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়েকে কবে দেখেছিল। আজ সেই মেয়ে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা যুবতী।

অনেকক্ষণ লেগেছিল বিস্ময়ের ঘোর কাটতে। তারপরে বলেছিল, তুমি? অনু?

অনীতা মৃদু হেসে চোখ নামিয়ে উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ।

তারপরে বিয়ে-থা হল, নিমন্ত্রণ তো করলে না?

মুখ ম্লান হয়ে গিছল অনীতার। সে উত্তর দিয়েছিল, সে এক দুঃস্বপ্ন, তার জের কাটাতেই আপনার সাহায্য চাই রঞ্জনদা।

রঞ্জন অবাক।

অনীতা সব কথাই খুলে বলেছিল।

অনীতার প্রতি রঞ্জনের হয়তো মোহ ছিল, কিন্তু সে-মোহ দেখা-সাক্ষাতের অভাবে উবে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে যেমন স্মৃতি এসে দেখা দেয়, তেমনি দেখা দিত। লেবুর ফুলের গন্ধ যেমন, যেমন একটা দূরাগত সুর। আজ সেই গন্ধ মাতোয়ারা হয়ে এল। আজ সেই সুর দীপকে বেজে উঠল। দীয়া জ্বালালো।

এখন কয়লার কারবার করে রঞ্জন। লরী ভরাত মাল আসে চিনেকুড়ী আর ছোটখাটো কয়লার খনি থেকে, সেই মাল সে বেচে। এখানে-ওখানে সরবরাহ করে। কয়লার বুকে থাকে হীরে ক্বচিৎ কখনো, থাকে তার আলো—সে তা জানে। কিন্তু তার বুকেও যে দৃষ্টির হীরের আলো এসে বিঁধতে পারে, সে জানত না। জানল।

অনীতা প্রেম চায় নি, চেয়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরামর্শ। চেয়েছে পরামর্শদাতা পুরুষকে। রঞ্জনকে সে পেল।

রঞ্জন স্কুটারে চড়তো, এখন স্কুটার নিয়ে আসে না। অফিসের পর ট্যাক্সী নিয়ে প্রতীক্ষা করে।

অনীতা এসে বসে ট্যাক্সীতে, রঞ্জন গা ঘেঁষে বসে না। একটু সরেই যায় নিজের অজান্তে। অবিবাহিত মধ্যবিত্ত পুরুষ, যৌন-সংস্কার পুরোমাত্রায়। বিবাহিত পুরুষের সে সংস্কার নেই।

অনীতা বলে, রঞ্জনদা, দরখাস্ত তো করতে হবে। য়্যাটার্নির কাছে গেছলেন।

রঞ্জন বলে, হ্যাঁ, গিছলাম। য়্যাটার্নি বললেন, দরখাস্ত যেদিন ইচ্ছে ফাইল করা যেতে পারে, কিন্তু চাপা পড়ে থাকবে। আদালতে আদালতে হাজার হাজার দরখাস্ত জমা হয়ে আছে। তারপর কবে মামলা উঠবে কে জানে? আর মামলা উঠলেই বা কি, শেষ হতে সময় নেবে। এর মধ্যে যদি আবার বিবাদী নিজের পক্ষ সমর্থন করে, তাহলে তো আরো ভজকটো।

অনীতা চুপ করে রইল।

তাছাড়া আর একটা কথাও বললেন, রঞ্জন একটু ইতস্তত করেই বললে।

কি কথা? অনীতা শুধালে।

বললেন, দেখবেন মশাই, আপনি কোরেসপণ্ডেন্ট না হয়ে পড়েন।

তার মানে?

তার মানে বিবাহিতা স্ত্রীর অবৈধ প্রেমিক, রঞ্জন মৃদু হেসে বললে।

তোমার সে ভয় আছে নাকি রঞ্জনদা?

ভয় কি নেই, তুমিই বল!

ছিঃ, ওকথা উচিত হচ্ছে না!

রঞ্জন যেন নিভে গেল।

অনীতা এবার হেসে বললে, তুমি ভয় পেলে রঞ্জনদা? তাহলে আমাকে বলে-কয়ে দাও, আমি নিজেই সব বন্দোবস্ত করব।

রঞ্জন চুপ করে গেল।

সুগার ড্যাডী, সুগার ড্যাডী! চিনি-মাখা প্রেমিক—আমার বুড়ো প্রেমিক!

অনীতার স্বর ভেসে আসে।

চমকে ওঠে কমল।

কমল রচনা করে অনীতার আর তার প্রৌঢ় প্রেমিকের প্রেমের দৃশ্য।

অনিতা কাছে আসে, ডাকে, সুগার ড্যাডী!

প্রৌঢ় প্রেমিক বলে, তোমার সঙ্গে কি আমার এতই বয়সের তফাত অনু?

না, না, ওই নামে ডাকতে তোমাকে ভাল লাগে, অনীতা লাস্যময়ী হয়ে ওঠে।

আমি প্রৌঢ়, তাই বলে কি তোমাকে পেতে পারিনে ?

পেতে হলে দিতে হয়—জানো ?

আমি তো তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারি।

শুধু নিরাপত্তা ?

প্রৌঢ় প্রেমিক চুপ।

নিরাপত্তা তো বড় কথা—কিন্তু আর কি দেবে ? দেবে সন্তান ?

হ্যাঁ, দেব !

কমল তো নিরাপত্তা নেই বলেই তা দিতে চায় নি। তুমি আবার ভয় পেয়ো না !

প্রৌঢ় প্রেমিক বলে উঠল, আমি তোমার প্রতীক্ষা করেছি এতদিন। আমার সব আছে, আমি তোমাকে সব দেব !

দেবে—সব দেবে সুগার ড্যাডী ? অনীতা কাছে ঘেঁষে এল।

কমলের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল দৃশ্য।

কমল আবার সিগারেট ধরালে।

ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে।

কমল কিছু ভাবছে না। কমলের মন ফাঁকা।

॥ দশ ॥

কমল ঠিক করলে, একটা হেস্তনেস্ত করবে। শরীর তার শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে। যে দেখে, সেই বলে—

কি হল কমলবাবু ?

কি হল কমলদা ?

কি হল কমল ?

কমল বলে, পেটের ট্রাবল যাচ্ছে।

কেউ কেউ জানে, অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। ফিসফিস করে।

হরুদা তো ফস্ করে বলেই ফেলে, কিরে, তোর বৌ নাকি তোকে ছেড়ে গেছে ?

কোথায় শুনলে এমন আজগুবি কথা ? কমল একটু বা লজ্জিত হয়েই বলে।

শুনি—বাজারে। হরুদা বললে, তা বাবাঃ, তখনি বলেছিলাম ঐ তিন আইনের বিয়ে করিসনে! ওতে বিপদ আছে।

আজকাল হিন্দু বিয়েতেও তো ঐ ফ্যাঁকড়া! কমল মৃদু স্বরে বললে।

তা বটে! কিন্তু সব হিন্দু স্ত্রীই ও-খাঁড়া ঘোরাতে যায় না।

তবু তো কয়েক হাজার দরখাস্ত পড়েছে।

সে তো সিন্ধুতে বিন্দুরে, হরুদা মাথা নাড়লেন। তা দেখ্ কমল, কেলেঙ্কারিটা তাহলে তোরা করবি ?

না করে উপায় কি, কমল বললে, যখন বনছে না।

ঐ তোদের এক বিলিতি রোগ! শতকরা নিরানব্বইটি স্বামী-স্ত্রীর বনে না, তাই বলে অমনি আদালতে ছুটবে ? না বাপু, আমি ওসব ভালবাসিনে!

তুমি ভাল না বাসলে কি হবে, ঐটেই রীতি।

তা ব্যাপারটা কি ? কিসে বিয়ের কল বেগড়ালে ? দায়ী কে ?

কমল কথা বললে না।

হরুদা বললে, ভিতরে দ্বিতীয় পুরুষ নেই তো ?

কমল তবুও নিরুত্তর।

হরুদা আবার বললে, তোর অসুখ-টসুক নেই তো ?

কমল তবু উত্তর দিলে না।

হরুদা হাল ছেড়ে দিলে।

মেয়েরাও টের পেল।

বোর্ডিং-এর মেয়েরা, অফিসের মেয়েরা, বন্ধুরা অনীতাকে ছেঁকে ধরল।

কিরে, শেষে আবার মিস দাশগুপ্তা হতে সাধ গেল ?

কেন দাশগুপ্তা কেন, মিস কেন, একবার মিসেস নাম ঘুচিয়ে আবার কারো মিসেস হবে যে ! মায়া বললে।

তা বই কি ! বীণা মুচকি হাসলে, কিন্তু কমলের মতো অমন পুরুষ কোথায় পাবে ?

তোর হিংসে হয়তো তুই নিয়ে নিতে পারিস। অনীতা বললে, তোকে দিয়ে দিলাম।

কথাটা বলেই সে কেমন মোচড় খেলে বুকে।

প্রাণ ধরে দিতে পারবি ?

বাঃ রে, ডাইভোর্সের মামলা রুজু, আবার বলে দিতে পারবি ?

তা বাপু, অমলা বললে, তোর পছন্দকে কিন্তু ভাল বলব না। নইলে কমলকে ছেড়ে ঐ টেকো বুড়োকে—

অনীতা গম্ভীর স্বরে বললে, উনি আমার দাদা।

দাদা লো দাদা, সহোদর দাদা তো নয় ! অমিতা ঝংকার দিয়ে উঠল।

অনীতা আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

মেয়েরা আর তাকে ঘাঁটালে না।

॥ এগারো ॥

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবনা শুরু হল অনীতার।

কমলের কাছে বসে ক্ষমা, ঠিক তারই টেবিলে, তারই চেয়ারে, আগে অনীতাই পাশে বসত।

ট্যারা মেয়েটা অনেক দিন থেকে অফিসে আছে, কমলের সঙ্গে ডেকে আলাপ করে।

স্যাকার একশেষ! বলে, কমলবাবু, এই টি-এ বিলটা যে কিছুতেই মিলছে না, একটু দেখুন না!

আর কমল অমনি লেজ নেড়ে ছোটে।

এখন তো আরো পোয়া বারো!

অফিসের পরে ওরা নিশ্চয়ই বেরোয়!

কমল টাকা থাকলে দিলদরিয়া। নিশ্চয়ই ট্যাক্সী করে নিয়ে যায় ওকে বেড়াতে, দুজনে ঘন হয়ে বসে ট্যাক্সীর ভিতরে।

কমল ডাকে, ক্ষমা, তোমার ক্ষমা-সুন্দর চোখে একটিবার তাকাও!

ক্ষমা ট্যারা চোখ তুলে তাকায়।

আবার কখনো বা নিয়ে যায় তাদের ফ্ল্যাটে।

তারই হাতের সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট! তারই লাগানো পর্দা, তারই পছন্দ করে কিনে আনা নানা রঙের বেড-কভার। বাহাদুর না জানি, কি করে পেতে রাখে!

ক্ষমা এসেই এলিয়ে পড়ে বিছানায়, বলে, মাগো মা, পায়ে টান ধরেছে, একটু বসি!

কমল মোড়াটা টেনে কাছে বসে।

হঠাৎ ককিয়ে ওঠে ক্ষমা।

কি হল? কমল শুধায়।

ক্ষমা ককায়, কথা বলে না।

কমল মোড়া ছেড়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে আসে।

কি হয়েছে বল না!

আমার পা শিটিয়ে যাচ্ছে, ক্ষমা কেঁদে ওঠে।

কমল তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়ে ডলে দেয়।

নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে ক্ষমা।

কমল শুধায়, ব্যথাটা গেল?

ক্ষমা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, ওমা, তুমি পায়ে হাত দিলে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

কেন, ছিঃ ছিঃ-র কি হল! কমল হেসে বলে। ওটা তো পুরুষেরই কাজ। শ্রীকৃষ্ণ করতেন আর আমি শ্রীকমল, আমার এমন কি মান?

না, না!

কমল এবার পা দুখানা কোলের উপর টেনে নেয়। আঙুলে হাত বোলায়। একটু বা টিপে দেয়।

কমল বলে, তোমার পা দুখানি বড় সুন্দর!

অনীতার চেয়েও? ফস্ করে বলে ওঠে ক্ষমা।

হ্যাঁ, এমন সুঠাম পা দেখেই বোধই জয়দেব চরণচারণ চক্রবর্তী হতে চেয়েছিলেন।

কমল ওকি করছে! উবু হয়ে পায়ের উপর চুমু খাচ্ছে!

অনীতা প্রায় চীৎকার করেই ওঠে।

মিলিয়ে যায় দৃশ্য। যেন ছায়াছবির একটা রীল।

সত্যিই ক্ষমা কমলকে পছন্দ করে।

সেও সব শুনেছে।

কিন্তু এ নিয়ে কমলকে কোন কথা বলা যায় না।

অনীতা যতই ন্যাকা ভাবুক, সে ন্যাকা নয়, তার মন দরদে ভরে গেছে। কিন্তু কমলকে মুখ ফুটে কিছু বলা মুশকিল।

সে তাই কমলের কাছে আগের মতো যখন-তখন কেন, মোটেই যায় না।

কমল যখন পাশ দিয়ে চলে যায়, চোখ তুলে তাকায়। আবার চোখ নামিয়ে নেয়।

কমলের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ বাস স্টপে দেখা হয়ে গেল।

দুজনেই বাসের প্রতীক্ষায়।

কমল একটু হেসে সরে দাঁড়াল।

বাস একটার পর একটা আসছে, যাচ্ছে, কিন্তু একেবারে ভরতি।

ক্ষমা হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে, চলুন একটু হাঁটি।

কমল কি আর করবে, রাজী হল।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে উঠল।

ক্ষমাই প্রস্তাব করলে, একটু চা খেলে হয়।

কমল মাথা নাড়লে।

নিরিবিলি রেস্তোরাঁ কিন্তু পরিপাটি সাজানো।

দুজনে একটা কেবিনে গিয়ে ঢুকলো, মুখোমুখি বসল চেয়ারে। কমল তাকাল ক্ষমার দিকে।

ওকে সে বহুদিন দেখেছে, কিন্তু এমন করে দেখে নি। মুখে শ্রী আছে। একটা চোখ একটু ট্যারা। যাকে বলে লক্ষ্মী ট্যারা। চশমায় সে তার ট্যারাত্ব ঢেকে রাখে।

ওর সঙ্গে প্রেম করা যায় বই কি! অনীতা না হয়ে ক্ষমা হলেই বা ক্ষতি কি ছিল? কিন্তু ক্ষমাও যদি অমনি হত!

উর্দিপরা বয় এসে ফরমায়েস নিতে দাঁড়াল।

কি খাবেন? কমল শুধালে।

যা হয়, ক্ষমা উত্তর দিলে।

কমল বয়কে বললে, কাটলেট আর চা দিতে।

বয় ফরমায়েশ নিয়ে চলে গেল।

এবার কমল তাকাল ক্ষমার দিকে।

ক্ষমাও তাকালে।

একটা কিছু বলুন! কমল বললে।

আমি? চমকে উঠল ক্ষমা।

হ্যাঁ।

আমি তো আপনার কাছে শুনব, বলবার তো কিছু নেই।

এত সব রটছে, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন? কমল বললে।

হ্যাঁ, ক্ষমার ছোট্ট উত্তর।

কমল আপন মনে বলে চলল, কথাটা সত্যি ! অনীতা ডিভোর্সের মামলা আনছে ।

কিন্তু, ক্ষমা একটু তাকিয়ে আবার মুখ নীচু করে বললে, আবার কি মিল হতে পারে না ?

না ।

কেন—বাধা কি ?

এমন সময় বয় ট্রে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ।

ক্ষমা আবার কমলের দিকে তাকাল ।

কমল বললে, বাধা—বাধা আর-এক পুরুষ ।

সে হয়তো ক্ষণিকের মোহ ।

সে আপনারা বলতে পারেন ।

শুনুন কমলবাবু, ক্ষমার স্বর ঝরে পড়ল । জীবনে এই সর্বনাশ অনেক সময়ে আমরা নানা কারণে ডেকে আনি । হয়তো তখন কিছু ভাবি নে । কিন্তু পরে দেখা যায়, জীবন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে । আর তো সে-জীবন জোড়া লাগে না ।

কমল আশ্চর্য হয়ে তাকাল ক্ষমার মুখের দিকে । ক্ষমার সঙ্গে সে একই অফিসে অনেক বছর চাকরি করছে । এ-কাজে সে-কাজে ক্ষমা এসেছে তার কাছে । দাঁত চেপে বলেছে, একটু ড্রাফট্‌টা দেখে দিন না, টি-এ বিলটা মেলাতে পারছিনে !

ন্যাকাই হয় তো মনে হয়েছে কমলের । কিন্তু ন্যাকা মেয়ে তো নয় ক্ষমা ! ওর চোখ দিয়ে জল ঝরছে !

ক্ষমা জল মুছে ফেললে রুমাল দিয়ে ।

কমল নীরব ।

ক্ষমা এবার গাঢ় স্বরে বললে, নিজে জীবনে ভুল করেছিলাম বলেই একথা বলছি ।

আপনি ?

হ্যাঁ, আমার ছেলে বাচ্চুকে পর্যন্ত পাইনি ।

আবার ক্ষমার চোখে জল নামল। ক্ষমা মুখ নীচু করলে।

কমল নীরব।

চায়ের পট থেকে ধোঁয়া উঠছে। ধূমায়িত চা ঢেলে নিতে ভুলে গেল ক্ষমা। অনাস্বাদিত কাটলেট অনাস্বাদিতই রয়ে গেল।

॥ বারো ॥

কমল ক্ষমাকে আঁকড়ে ধরবে ভেবেছিল। কিন্তু ক্ষমা অন্যপূর্বা।

ক্ষমা তাকে সহানুভূতি দেখাতে পারে কিন্তু অন্য কিছু দিতে পারে না।

কমল অবশ্য তাকে প্রেম জানাতে যায় নি। সেটুকু আত্মসম্ভ্রম তার আছে। কিন্তু মনে মনে তার আশা ছিল, ক্ষমা তাকে চাইবে। কিন্তু ক্ষমা অন্যের পত্নী, ক্ষমার সন্তান আছে। সিঁদুর সে মুছে ফেলেছে বটে, কিন্তু অন্য পুরুষের বন্ধনের দাগ আছে।

কমল হতাশ হল।

কমল ভেবেছিল ক্ষমাকে নিয়েই অনীতাকে ভুলবে। সেও দেখাবে, তার জন্যেও প্রতীক্ষমানা আছে নারী।

কমল তবু ক্ষমাকে বললে, মিসেস ব্যানার্জি, আমার কি উপায় হবে?

ক্ষমা বললে, অনীতাকে ফিরিয়ে আনুন। নিজেদের ভুল শুধরে নিন!

কমল বললে, তা যদি না হয়, আপনি কি—

ক্ষমা চমকে উঠল; আমি?

হ্যাঁ আপনি। কমল তার হাত চেপে ধরল।

ক্ষমা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, না, তা হয় না! আপনার এ ক্ষণিকের মোহ। আমরা বন্ধু, তার বেশি কিছু নই।

বন্ধু ? কমল বলে উঠল, মেয়ে আর পুরুষের বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাসী নই।

ক্ষমার মুখে ম্লান হাসি ; সে বললে, আপনি সুস্থ নন, তাই এমনি করছেন। সুস্থ হোন কমলবাবু ! শেষে যে আমার আপনাকে দেখে ভয় করবে।

কমল লজ্জিত।

ক্ষমা তার হাত দুখানি নিজের হাতে নিয়ে বললে, আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। অনীতার সঙ্গে আমি দেখা করব।

না, না ! মাথা নেড়ে বললে কমল।

কিন্তু ব্যাপারটা আপনাকে মিটিয়ে নিতে হবে—এই আমার অনুরোধ !

অনীতা রঞ্জনকে চায় না। রঞ্জন তার কুমারী জীবনের প্রথম পুরুষ। সেদিন কি এক কামমোহ অষ্টাদশী অনীতাকে পেয়ে বসে ছিল, তাই সে রঞ্জনের স্পর্শ চেয়ে ছিল। আজ ভোঁতা হয়ে গেছে সে-অনুভূতি। কমল নিজের স্পর্শে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে, তার অনুভূতি আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে। তবু রঞ্জনের সান্নিধ্য সে চায়। কিন্তু যত না পুরুষ হিসেবে, তার চেয়ে বেশি পরামর্শদাতা হিসেবে।

রঞ্জনকে সে চেনে। মধ্যবিত্ত পুরুষ, অবিবাহিত। মন সংস্কারে ভরতি। যৌন-সংস্কার তার মধ্যে প্রবল। ঐ পুরুষ চোখে প্রেম জানাতে পারে। কিন্তু ঠোঁট চুপ করেই থাকবে। তাকে দিয়ে ভয় নেই। কিন্তু অনীতা কমলের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর কি করবে ?

কমল ক্ষমাকে নিয়ে থাকুক। সে তো নিজের চোখে ওদের দুজনকে দেখেছে ট্যাক্সীতে যেতে। অনীতা কি করবে ?

আবার প্রেমে পড়বে, বিয়ে করবে?

কাকে?

অনীতা ভেবে পায় না।

রঞ্জন রোজই আসে।

রঞ্জনকে সে একদিন বললে, কি করব রঞ্জনদা বল তো?

রঞ্জন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

বিবাহ বিচ্ছেদের পরে কি হবে?

রঞ্জন নীরব।

তোমরা তো আর তখন আসবে না, অনীতা তার নীরবতা দেখে তীব্র হয়ে উঠল, তোমরা তো পরস্ত্রীকে চাও, ডিভোর্সড মেয়েকে তো কেউ চায় না, সে তো দাগী।

একথা বলছ কেন অনু! রঞ্জন কাছে এগিয়ে এল। তুমি যখনি ডাকবে, আমি ছুটে আসব।

আসবে তো? মনে থাকে যেন?

হ্যাঁ, আসব। আমার আশা নেই, তা জেনেও আসব। তোমার বন্ধুত্ব আমি চাই।

শুধু বন্ধুত্ব—অনীতা বলে উঠল, আর কিছু নয়?

না—আর কিছুর আশা করতে ভয় হয় অনীতা, ভরসা হয় না।

ভরসা না করাই তো ভাল, অনীতা গম্ভীর হয়ে গেল।

রঞ্জন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

কিন্তু আমি কি করব? অনীতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রঞ্জন কি করবে ভেবে পেলে না। তার ইচ্ছা হল, অনীতাকে বুকে টেনে নেয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত সংস্কার-জর্জরিত পুরুষ তা পারে না। তাই রঞ্জন পারলে না।

অনীতা লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। পিঠ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রঞ্জন দাঁড়িয়ে রইল কিছুকাল, তারপর বেরিয়ে এল।

॥ তেরো ॥

কমল ঠিক করলে অনীতার সঙ্গে দেখা করবে।

একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

কিন্তু কি করে দেখা হবে?

যদি না আসে অনীতা?

যদি ঐ প্রৌঢ় প্রেমিক না আসতে দেয়!

কমল এমনি জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল।

সে নিজেই অবৈধ সহবাসের স্বীকৃতি দেবে, আর অনীতা সেইটে দাখিল করে এক তরফা ডিগ্রী পাবে।

কিন্তু যদি সে ক্লীবত্বের অভিযোগ আনতে চায় কমলের বিরুদ্ধে। ঐটেই তো মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। পুরুষ লজ্জায় ও অভিযোগের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে পারে না। আর একতরফা ডিগ্রী মেয়েদেরই প্রাপ্য হয়।

ছেলেবেলায় শুনেছিল তাদের আত্মীয়া লীনাদির কথা। স্বামী ছিলেন প্রফেসার, তার বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগই এনেছিলেন তিনি। গোবেচারা স্বামী কলকতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বর্মায় না মালয়ে পালিয়েছিলেন। কিন্তু কমল তা করলে না। কমল মামলা লড়বে। সিভিলসার্জনের সার্টিফিকেট না হয়, মেডিক্যাল বোর্ডের স্নমুখে দাঁড়াবে। সে তার পুরুষত্বের প্রমাণ দেবে।

না, ও-পথে অনীতার স্নবিধে হবে না। ওখানে তার পুরুষত্ব বিপন্ন। তাকে লড়তেই হবে।

তার চেয়ে অনীতাকে ডেকে বললে হয়, তুমি অবৈধ সহবাসের অভিযোগ আন অনীতা।

অনীতা হয় তো বলবে, অবৈধ সহবাস? কার সঙ্গে করলে?

করি না করি, তোমার কি ? তুমি অভিযোগ আনবে। কমল উত্তর দেবে।

কিন্তু একটা মানুষ তো চাই, সে মানুষটা কে ?

ক্ষমার নামই করতে চাইবে অনীতা, কিন্তু ও-নামে কলঙ্কের ধুলো পড়তে দেবে না কমল।

অনীতাকে সে বলবে, বাড়িতে যে-সব মেয়ে আসত, সকলের সঙ্গেই আমার ভাব ছিল। তুমি নিজের চোখে দেখেছ। আর আমি তো প্রতিবাদ করব না। তুমি গাদা-গুচ্চের নাম করতে পার।

অনীতা রাজী হয়ে যাবে।

নিজের মনে এমনি কেস সাজিয়ে অনীতাকে ফোন করলে কমল।

অনীতা স্নান সেরে সবে চুল আঁচড়াচ্ছিল, এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে, আপনার ফোন এসেছে।

অনীতা একটু বা ফোন-কনসাস। ফোন ধরতে গিয়ে তার হাত কাঁপে।

তার হাত কেঁপে উঠল, একটু জোরেই বললে, কে ?

কে চিনতে পারছ না ! নাগরিক হাসি কমলের ঝরে পড়ল।

অনীতা গম্ভীরস্বরে বললে, হ্যাঁ চিনি। তারপর ?

কমলের স্বরে রসিকতা, তুমি দেখছি একালিনী নও। একালিনী হলে বলতে, চিনি না।

অনীতা বললে, কথা কি শেষ হল ? ছেড়ে দেব ?

স্বর ঝরে পড়ল, না, না, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

কি জন্যে ? অনীতার স্বরে বুঝি ভীতি।

না, না, ভয়ের কারণ নেই ! আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে কথা কইব।

না! অনীতা ঠোঁট কামড়ে বললে।

কেন? বিস্মিত প্রশ্ন রিসিভারে ঝরে পড়ল।

যা কথা তা হয়ে গেছে, আর কথা নেই।

কিন্তু কথা তো হয় নি, এখনো মামলা রুজু হয় নি। আমি তো সমন পাইনি।

হ্যাঁ, তা হয় নি, কিন্তু হবে।

হবার আগেই তো কথা থাকে।

না, নেই!

কিন্তু আমি অবৈধ সহবাসের দাবিতে মামলা আনব, যাকে বলে য়্যাডালটারী! কমলের ক্রুদ্ধস্বর।

অনীতার হাতে রিসিভারটা কেঁপে উঠল। সে সংযত হয়ে বললে, আনতে পার।

কমলের তীব্রস্বর ঝরে পড়ল, তাতে কি তোমার সুনাম বাড়বে? কাগজে-কাগজে ছাপা হবে খবর।

হোক গে! ঠক করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল অনীতা।

আবার ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল ফোনটা।

কিন্তু অনীতা আর ভ্রুক্ষেপ করলে না, সে বেরিয়ে এল।

॥ চৌদ্দ ॥

রঞ্জনের সঙ্গে রোজই দেখা হয় অনীতার, আজও হল।

আপিসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জন। তীর্থের কাকের মতো।

অনীতার মায়াই হয়, হয়তো হয় করুণা। আবার নিজের মনেই হাসে।

করুণা থেকে ভালবাসা আসতেও পারে। অমনি মোচড় খায় বুকটা। অনীতা বলে, দূর, দূর! আবার ভাবে, রঞ্জন তার একমাত্র সহায়। করুণা কি ভালবাসা থেকে বহুদূরে!

রঞ্জনকে অনীতা বললে, অনেক কথা আছে।

তাহলে চল কোথাও যাই! রঞ্জন ডাকলে, এই ট্যাক্সী।

না হাঁটতে-হাঁটতে চল ময়দানে গিয়ে বসি!

ময়দানে আমার ভাল লাগে না!

কেন? অনীতা একটু হেসে উঠল, ওখানেই তো মানুষ জোড়া বেঁধে যায়।

রঞ্জন একবার ওর মুখের দিকে তাকালে। হয়তো বলতে পারত, তুমি আর আমি তাহলে জোড়া? কিন্তু মধ্যবিত্ত সংস্কার তাকে বাধা দিলে।

তাহলে যেখানে হয় চল!

যেখানে হয়?

হ্যাঁ, যেখানে বসে নিরিবিলিতে কথা বলা যায়!

আমার ডেরায় তো গেলে না, সেখানে বসে কথা চলতে পারে।

কিন্তু নির্ভয়ে কি সেখানে যাওয়া যায়? একটু বা হাসল অনীতা।

কি যে বল! ক্ষুব্ধ হল রঞ্জন।

তুমি তামাশা বোঝ না রঞ্জনদা! হেসে উঠল অনীতা।

একটা ফাঁকা ট্যাক্সী যাচ্ছিল, রঞ্জন ডাকতেই দুজনে উঠে বসল।

রঞ্জন সান্নিধ্যে বসল না, দূরত্ব রেখেই বসল। কিন্তু অনীতা যেন সান্নিধ্য রাখতেই চায়। সে একটু সরে এল। রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালে।

রঞ্জন বললে, বল!

এখন নয় রঞ্জনদা, সুস্থ হয়ে বসে বলব, গভীর স্বরে বললে অনীতা।

রঞ্জন চুপ করে রইল।

রঞ্জনের সার্টের ধবধপে কাফটার দিকে তাকিয়ে আছে অনীতা। ওটা লীলাচ্ছলে ছোঁয়া যায়। হাত কেমন যেন স্পর্শের জন্যে

নিসপিস করছে। কিন্তু তবু ছুঁলো না। অনীতা চুপ করে বসে রইল। রঞ্জনও চুপচাপ।

রঞ্জনের ডেরা বেশি দূরে নয়। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে।

এখানে এই ফিরিঙ্গী পাড়ায় এক কামরা ফ্ল্যাট আগেকার দিনে দুষ্প্রাপ্য ছিল না। রঞ্জন সেই সময়ে ভাড়া নিয়েছিল। ব্যাচিলরের পক্ষে এই ফ্ল্যাটগুলো ভাল। নির্ঝঞ্ঝাট। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে মিশতে হয় না। যদিও বা মেশে, ঐ মাথা-নোয়ানোর পরিচয়। সিঁড়িতে দেখা হলে একটা গুডমর্নিং কি ইভনিং শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে যাও। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একটা বেয়াড়া ছেলে কি মেয়ে ভাব জমাতে আসে। তাও যখন-তখন বিরক্ত করে না। সেটা ওদের সহবৎ শিক্ষার অঙ্গ। হয়তো নেটিভ বলেও ঘৃণা। কোন অতিথি এলে ওরা ঝুঁকে পড়ে না, ছেঁকে ধরে না। হয়তো দেখে, কিন্তু তার বেশি নয়।

বাড়িতে লিফট্ নেই।

দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠে এল।

ল্যাণ্ডিং-এ এসে হাঁফ ছেড়ে বললে অনীতা, বাবাঃ, এ যে স্বর্গের সিঁড়ি! আর কতদূর? বলেই চমকে উঠল অনীতা। একথা আরো একদিন বলেছিল, স্বর্গের সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল, দুজনের স্বর্গও রচনা করেছিল। কিন্তু সে-স্বর্গ তো আজ আর নেই। আজ তা চুরমার হয়ে গেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লে অনীতা।

রঞ্জন আগে আগে চলেছে, শুনতে পায় নি। সে বললে, এই তো সামনে।

এটা তেতলার ল্যাণ্ডিং। তেতলা থেকে চৌতলার দিকে সিঁড়ি ঊর্ধ্বগামী। সেই ঊর্ধ্বগামী পথে না উঠে, ল্যাণ্ডিং-সংলগ্ন করিডোর বেয়ে চলল রঞ্জন।

এধারে ওধারে ফ্ল্যাট। কাঠের ফলকে কি পিতলের ফলকে ডিসুজা, ডিসীলভা, গোমেস, স্মিথ প্রভৃতি নামের মালা, আবার

কোথাও বা আছে মিস বা মিসেসদের নাম। সেগুলিতে বাহারও আছে। কোথাও রোসালিণ্ড, কোথাও পার্ল, কোথাও মিলি। কোথাও বা নিনা।

দেখতে দেখতেই যাচ্ছিল অনীতা। ফেরঙ্গ আবাসে সে কখনো আসে নি। সবই তার কাছে নতুন লাগছে।

রঞ্জন এরই মধ্যে একটা ফ্ল্যাটের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। জি—২৮ নং স্যুট। অনীতা চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে। মুখস্থই বুঝি বা করে নিলে।

রঞ্জন ট্রাউজারের পকেটে হাত ডুবিয়ে বের করলে একটা মস্ত চাবি। এই বুঝি সেই চাবি—যার নাম ল্যাচ কী।

তারপর দরজার গা-তালায় ঢুকিয়ে দিলে।

দরজা খুলে বললে, এস!

রঞ্জন একপাশে সরে দাঁড়াল। অনীতা মৃদু সেণ্টগন্ধী হিল্লোল তুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

রঞ্জন ছিটকিনি এঁটে দিলে।

অনীতা একটু বা চমকে উঠল।

দরজার পরেই ফালি বারান্দা, সেখানে একটা হ্যাট্‌র্যাক। একটা নাইট ক্যাপ, একটা সোলার টুপি, একটা ভাটিয়া টুপি টাঙানো। নীচে জুতো রাখার জায়গায় ক'জোড়া জুতো আর চপ্পল। সবই পালিসের চাকচিক্যে উজ্জ্বল।

অনীতা সব দেখে নিলে। তারিফ তার দৃষ্টিতে। ব্যাচিলর হলেও নোংরা নয়, বরং খুব বেশি সাফসুফ রঞ্জন। কমল তার তুলনায় ঢের ঢের নোংরা!

অনীতা বললে, চল তোমার বেডরুমে! চিচিং ফাঁক বলে দাও, খুলে যাক রহস্যের খাসমহল!

রঞ্জন হেসে দরজা খুলে দিলে।

সুদৃশ্য পর্দা, শ্রীনিকেতনী গেরুয়ার নির্লিপ্তি নেই, এখানে নীল রং। ঘন নীল।

সে-পর্দাও সরিয়ে দিলে রঞ্জন। এবার বেডরুম দেখা দিল।

হাল্‌কা সবুজে ডিসটেম্পার করা ঘর। তাতে দেয়ালের আবর্জনা, ছবি নেই। শুধু একখানা বড় ফ্রেমে রঞ্জনের তরুণ বয়সের ফোটো। সে-ফোটো দেখলে বোঝা যায়, ঠোঁটে আছে দৃঢ়তা আর চোখে কেমন এক ঔজ্জ্বল্য।

মিলিয়ে দেখলে অনীতা। আজকের রঞ্জন নয়, কিন্তু তবু রঞ্জন।

রঞ্জন জানালাগুলি খুলে দিলে। পর্দা সরিয়ে দিলে।

অনীতা জানালার কাছে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু এক কোণে সোফা দেখে আর যেতে ইচ্ছে করল না। তারপরেই চোখ পড়ল কমলা রঙের বেডকভারে ঢাকা পরিপাটি বিছানার উপর। সে ছুটে গিয়ে বসে পড়ল। বললে, বাবাঃ, সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পা ধরে গেছে! তোমার বিছানায়ই একটু বসি। আর জান তো বসতে পেলেই শুতে চায় মানুষ। সে ভেঙে পড়ল বিছানায়।

রঞ্জন বললে, কি খাবে বল ?

কেন, তোমার তাও বন্দোবস্ত আছে নাকি ?

আছে বই কি! চা না কফি, কি খাবে ? এক্ষুনি করে এনে দিচ্ছি।

আমি নারী এখানে আছি, আর তুমি পুরুষ চা করবে ? অনীতা হাসলে। সেটা তো ভাল দেখায় না রঞ্জনদা! আমাকে সব দেখিয়ে দাও, আমিই করে ফেলছি।

না, না, অফিসের ধকলের পরে তোমাকে ওসব করতে হবে না!

যা হয় কর, আমাকে কিন্তু দোষ দিয়ো না!

দোষ কেন দেব ?

বাঃ রে, আমি যে কুঁড়ে, আমি যে ঠুঁটোটি হয়ে বসে রইলাম! অনীতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সে তো আমার ভাগ্য। তোমাকে নিজের হাতে চা করে খাওয়ানো তো আমার সৌভাগ্য।

বাঃ, তুমি তো খুব কথা শিখেছ রঞ্জনদা!

কথা তো জানতাম না, তুমি আমাকে কথা শিখিয়েছ! রঞ্জনের স্বরে আবেগ। অনীতা লক্ষ্য করলে। তার ভাল লাগল। সে বললে, চা থাক, তুমি এসে এখানে বসো। অনেক কথা আছে।

দাঁড়াও, আগে চা করে নিয়ে আসি, তারপরে কথা হবে।

অনীতা চুপ করে রইল।

রঞ্জন প্যান্ট্রির দিকে চলে গেল।

চোখ বুজেই পড়েছিল অনীতা, আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

রঞ্জনের স্বর শুনে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

চা এনেছি!

অনিতা তাকিয়ে দেখলে, সুদৃশ্য পেয়ালায় ধূমায়িত চা নিয়ে এসেছে রঞ্জন। সঙ্গে একখানা প্লেটে পাফ্ আর কুচো বিস্কুট, আর প্যাটিস।

সে টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখেছে চায়ের পেয়ালা আর প্লেটখানা।

অনীতা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কমল এসব পারে না। তৃণটি ছিঁড়ে ভিন্ন করতে জানে না। হঠাৎ মনে পড়ল, বাহাদুর কেমন চা করে তা কে জানে! মায়াই হল। পর-মুহূর্তে এল তিক্ততা। কমলের চা খাওয়াবার লোকের অভাব কি! ঐ চোখটেরী ক্ষমা তো আছে। আর আমার আছে রঞ্জন, আপন মনে বলে উঠল অনীতা।

রঞ্জনদা, একা আমি এতগুলো খাব? তুমিও নাও!

আমি তো চা ছাড়া কিছু খাই নে।

তবে পাকা গৃহলক্ষ্মীর মতো এসব ভাঁড়ারে রেখেছ কেন?

তুমি কোনদিন আসবে, তোমাকে খেতে দেব বলে।

এই একটা মিছে কথা বললে রঞ্জনদা! আমাকে তো কখনো আসতেও বলনি!

বলিনি, বলার সাধ ছিল। আর আজ সে সাধ পূর্ণ করলাম।

চায়ের পেয়ালা দুটো পাশাপাশি, দুখানা চামচে তাতে ডোবানো।

অনীতা বললে, তোমার চাটা একটু নেড়ে দিই!

দাও! বলে রঞ্জন।

অনীতা নেড়ে দিলে। তারপর হাতে করে এগিয়ে দিলে রঞ্জনের দিকে। রঞ্জন হাসিমুখে তুলে নিলে।

দু'টো বিস্কুটও খেতে হবে।

না।

না বললে শুনব না, তাহলে আমিও খাব না!

রঞ্জন হাত পাতলে।

অনীতা তার হাতে বিস্কুট গুঁজে দিলে। রঞ্জন তার স্পর্শে বুঝি কেঁপে উঠল।

কেঁপে উঠলে যে? অনীতা হাসলে।

রঞ্জন কিছু বললে না।

চা-পান নীরবে সমাধা হল, অনীতা আবার ভেঙে পড়ল বিছানায়।

রঞ্জন চেয়ারে বসে রইল।

কাছে এসে বসো না! এক সময়ে ডাকল অনীতা।

রঞ্জন বিছানার একধারে এসে বসল।

আরো কাছে এস, নইলে কথা আমি ছুঁড়ে মারতে পারব না!

রঞ্জন কাছে সরে এল।

অনীতা তার হাত ধরলে, আঙুল নিয়ে খেলা করছে।

অ রঞ্জনদা ! একসময়ে ডাকলে অনীতা। ধরা গলা।

কি ?

আমাকে কি তোমার ভাল লাগে না ?

রঞ্জন মাথা নাড়লে।

তাহলে আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়াতে এত ভয় কেন ?

ভয় ? না ভয় তো নয় ! আবেগ-কম্প্র কণ্ঠে রঞ্জন উত্তর দিলে।

ভয় না হলে তুমি অমন দূরে সরে আছ কেন রঞ্জনদা ?

তুমি যে এখনো পরস্ত্রী।

পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেমই তো জমে।

গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে রঞ্জন, সকলের জমতে পারে, আমার সংস্কারে বাধে।

তোমার সংস্কার কোথায় যাবে, তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল অনীতা, যখন আদালতে কমল তোমার নামে অবৈধ সহবাসের খেসারতের দাবি আনবে।

আমি তো তার শরিক নই। রঞ্জন ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করলো।

কিন্তু সেকথা কে শুনবে ! হেসে উঠল, অনীতা, এই ঘরে তোমাকে আমাকে এমনি অবস্থায় কেউ যদি দেখে—তারা কি বলবে !

রঞ্জন সরে যেতে চাইল হাত ছাড়িয়ে। আরো জোরে হাত চেপে ধরলো অনীতা।

রঞ্জন বললে, ছাড়, ছাড় !

কেন ?

কেন ? পরস্ত্রীর স্পর্শ আমার কামনা নয়। রঞ্জন তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে উঠল।

তুমি এমনই পুরুষ-সতী !

সতী কিনা জানি না, কিন্তু আমার মত আমারই মত।

তাহলে তুমি আমাকে চাও না ? হাত ছেড়ে দিলে অনীতা। তার স্বরে হতাশা।

রঞ্জন দূরে সরে গেল নিজেরই অজান্তে। তারপর বললে, তোমাকে আমি চেয়ে ছিলাম অনু—এখনো চাই—তুমি মুক্ত হও —আমি তোমাকে আমার ঘরে আনব।

মুক্ত হও! অনীতা বিদ্রূপ করে উঠল, মুক্ত হও! কে জানে—তুমি হয়তো তখন আমাকে মিস্ট্রেস রাখতে চাইবে!

ছিঃ ছিঃ! রঞ্জনের মৃদুস্বর ঝরে পড়ল।

যাক আর ছিঃ ছিঃ করতে হবে না! অনীতা সোজা হয়ে উঠে বসল, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

রঞ্জন কিছু বললে না, তাকিয়ে দেখল।

অনীতা এবার বেডরুম থেকে বেরিয়ে গেল পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে, দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ শুনতে পেল রঞ্জন, তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ। রঞ্জন উঠল না, বসে রইল।

॥ পনেরো ॥

ধোঁয়া, ধোঁয়ার জাল।

সে যেন যবনিকা সৃষ্টি করেছে। আর সেই যবনিকার উপরে ছায়া।

যেন রূপালি পর্দার ছায়া। যেন ছবি। যেন ছায়া-ছবি।

কারা যেন এল ?

নাতাশা আর ইভান।

ইভান বলে, এমনভাবে জীবন আর কাটে না!

নাতাশা মাথা নাড়ে, সত্যিই কাটে না!

তাহলে ?

এস খতম করে দিই এ-জীবন!

কিন্তু তুমি তো জানো, বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম এখানে কড়া।

একে কড়া করে দিয়েছেন আমাদের মহান নেতা লেনিন। যখন-তখন যে কোন কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ এখানে চলে না। কি কারণে আমরা বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইব ?

কারণ, ভাল লাগছে না। নাতাশা বলে।

তাতে তো হবে না।

অন্য দেশে তো হয়, মানসিক নিষ্ঠুরতার কথা বললেই হল।

কিন্তু এখানে ঐ ধনবাদী দেশের রোগের কথা চলে না। এখানে মানসিক নিষ্ঠুরতারও প্রমাণ চাই।

প্রমাণ চাই ?

ছবি মিলিয়ে গেল। আবার—এক ছবি।

এবার রবার্ট আর রোজ।

আমি তোমার নামে নালিশ করব ! রবার্ট বললে।

কি নালিশ করবে—ডিভোর্স চাই ? কি বলবে—আমি অবৈধ সহবাস করেছি ?

হ্যাঁ, তাই।

প্রমাণ ?

প্রমাণ—প্রমাণ ?

হ্যাঁ, মুখের কথায় তো হবে না ! রোজ তীব্র কণ্ঠে জানালে। তোমাকে আমার প্রণয়ীর কাছে লেখা চিঠি দাখিল করতে হবে। নয় তো প্রণয়ীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলনের ছবি।

তাহলে শেষ অস্ত্র হানো—মানসিক নিষ্ঠুরতার কথা বল।

তারও প্রমাণ চাই। কি নিষ্ঠুরতা—বিচারক শুধাবেন। তারপরে হয়তো বলবেন, তোমরা আবার বনিবনা করে নাও। না, তা হয় না। তবে এক হয়।

কি ?—

আমি তোমার বিরুদ্ধে ক্লীবত্বের অভিযোগ আনতে পারি। রোজ বললে।

ক্লীবত্ব! রবার্টের পৌরুষ যেন আহত হল।

হ্যাঁ, সেইটেই সুবিধে।

কিন্তু আমাকে তো সেখানে নিজের পক্ষ সমর্থন করতে হবে।

না, তুমি তা করবে না!

করব না! কাগজে উঠবে, কেউ তো আমার সঙ্গে মিশতে চাইবে না!

কেউ—মানে মেয়েরা তো?

হ্যাঁ, আমি তো সুস্থ, স্বাভাবিক।

কিন্তু স্বাভাবিক হলেও তোমাকে মেডিক্যাল বোর্ডের সুমুখে দাঁড়াতে হবে। তোমার বীজ জীবন্ত কিনা তাঁরা দেখবেন। যদি তা না হয়—

আমি আত্মহত্যা করব—কিন্তু আমি পরীক্ষা দেব।

তাহলে তুমি তাই চাও?

হ্যাঁ, বাধ্য হয়েই চাই, আমার পৌরুষের দাবি হিসেবেই চাই।

ছবি মিলিয়ে গেল।

কমল সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঘরের এক কোণে।

তারপর পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। তারপর আবার ভেঙে পড়ল খাটের উপরে। আবার চোখ বুজল।

চোখের সামনে কালো একটা আবরণ। সেলুলয়েডের চেয়েও স্বচ্ছ, লুতাতন্তুর চেয়েও সূক্ষ্ম। সেই আবরণের উপর উত্তপ্ত মগজ আবার ছবি নিক্ষেপ করলে।

অনীতা মোক্ষম অভিযোগই এনেছে। ক্লীবত্বের অভিযোগ। অনীতার জবানবন্দী ঝরে পড়ল—নাইন জেম ফীর ব্যারিস্টারের মুসাবিদা।

আমি তো জানতাম না, প্রথম মিলনের লগ্নেই ভেঙে যাবে আমার স্বপ্ন, আমার স্বর্গ চুরমার হয়ে যাবে। কথায় বলে, বিবাহ

স্বর্গে, কিন্তু তার পরিণতি তো মর্ত্যে। সেই পরিণতিই স্বামী-স্ত্রীর মিলন। মিলনের লগ্ন এল, আমি আমার সমস্ত দেহমন নিয়ে উন্মুখ। আমার স্বামী তো আমাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি আমার বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। তিনি—তিনি প্রভু হতে পারলেন না। তিনি জানালেন, বহুদিন কুমার থাকলে এমনি হয়। লগ্নক্ষণে আসে শীতলতা। সেটা মানসিক, দৈহিক নয়। আর তা দূর হয়েও যায়। এ-দুর্বলতা সাময়িক ভেবেই আমি চুপ করে গেলাম। কিন্তু ভাবুন, সেদিনের কথা! তার পরে দেখেছি, নানা অছিলায়, তিনি মিলনকে পূর্ণতা দিতে চাননি। বলেছেন, সময় আসুক, আমরা এখনো সন্তানের জন্যে প্রস্তুত নই। আমিও ঐ মিলনহীন বিবাহকে আঁকড়ে ধরে ছিলাম, ভেবেছিলাম, তাই বুঝি ঠিক, কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে স্বামী নিজেই একদিন তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললেন। সেদিন আর তা সাময়িক বা মানসিক বলে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। সেদিন সত্যিই তিনি কেঁদে ফেললেন। আমি তাঁর মুখ চেয়ে এতদিন চুপ করে ছিলাম, আর তো তা সম্ভব নয়।

কমল চিৎকার করে উঠল, মিথ্যা কথা!

ছবি মিলিয়ে গেল। অনীতার স্বরও, কালো পর্দাও।

কমল উঠে বসল।

দরজায় কে কড়া নাড়ছে।

হয় তো সমন নিয়ে এসেছে। কমল খাট থেকে নেমে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিলে।

অনীতা! দরজায় অনীতা দাঁড়িয়ে। রুক্ষ চুল, প্রসাধন নেই। চোখের কোণে নেই কাজল।—অনীতা!

কমল কোন কথা বললে না।

অনীতা পা বাড়িয়ে দিলে, কমল সরে গেল, অনীতা ভেতরে এসে

ছিটকিনি আটকে দিলে। তারপর নিজেই চলল শোবার ঘরের দিকে। কমল তার পেছনে।

খাটেই এসে বসল অনীতা। পা ছড়িয়ে বসেছিল, পা একটু গুটিয়ে নিলে কমলকে দেখে। একটু বা সরে গেল।

কমল খাটে বসল না, সে দাঁড়িয়ে রইল।

অনীতার কোনো পরিবর্তন হয় নি, শুধু চুলে হয়তো দিয়েছে সাবান, নয় তো শ্যাম্পু করেছে, তাই উড়োঝুড়ো, এলোমেলো কেশগুচ্ছ; পাউডারের প্রলেপ হয় তো আছে গলায়, মুখে নেই। মুখেও হয়তো আলতো করে পাফ বুলিয়ে নিয়েছিল, আবার তা আলতো ভাবেই মুছে নিয়েছে। আসতে আসতে রুমালও বুলিয়েছে পথে। চোখের কোলে কিন্তু নেই কাজলের রেখা। শুধু স্নায়ু যে কাজলের গভীর রেখা টেনে দেয় চোখের কোলে, সে রেখা আছে। রেখা নয়, তার চেয়ে মোটা টান। আধুনিক কবি যদি ওকে মেঘনার ছায়া বলেন, তাতেও আপত্তি নেই। ভালোই লাগছে। কমল তাকিয়ে রইল, আয়ত চোখে নয়, আড়চোখে।

অনীতাও তাকে আড়চোখে দেখলে।

চুলগুলো এলোমেলো, মুখ বুঝি বা একটু শীর্ণ। ভালই লাগছে কমলকে, কিন্তু বড় বেশী আবার সিগ্রেট খেতে শুরু করেছে কমল। হাতের আঙুল তো হলদে। আর তাই বুঝি শরীরটা একটু রোগা। তা কেই বা যত্ন নেয়!

অনীতা আশে পাশে তাকালে, ক্ষমার কোনো চিহ্ন নেই। সে যে আসে তার কোন নিশানা নেই। ফুলফুল বিছানা নয়। সবুজ বেড কভারে নেই সদ্যধৌত জলুস, ফুলদানে নেই ফুল। এঘরে আর যাই হোক, প্রেমিকাকে আমন্ত্রণ চলে না। আবার মনে হল, না, চলে। বোহেমিয়ান নায়কেরা তো এর চেয়ে নোংরা ঘরেও প্রেমিকাকে ডেকে আনে। তারপর প্রেমিকা এসে এক লহমায়

সব সাজিয়ে দেয়। কিন্তু সাজানোর চিহ্ন নেই। অনীতা তাই আবার কমলের দিকে তাকালে। চোখে চোখ পড়ল, অনীতার মুখে মৃদু হাসি।

কমল বললে, হাসলে যে?

কাউকে দেখতে পাব আশা করেছিলাম।

কাকে দেখবে?

কেন—কেউ আসে নি?

সে কথা আমিও জিজ্ঞেস করতে পারি, কমল বললে, তোমার সঙ্গীটি কি ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছেন?

আমার কোন সঙ্গী নেই, অনীতার তীব্র স্বর।

আবার বিরতি।

একসময়ে কমল বললে, মামলা দাখিল করেছ?

তুমি করেছ? অনীতা শুধালে।

না।

আমারও উত্তর—না।

কেন?

অনীতা বসেছিল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা ঢেলে দিলে বিছানায়। আমি কথা অমন ছুঁড়ে মারতে পারি নে! এখানে এস, বলছি।

কমল কাছে এল, বিছানায় এসে বসল।

কি বলবে, বল!

আগে তুমি বল—কেন মামলা আননি? গাঢ় অনীতার স্বর।

আগে তুমি বল!

আমি—আমি কি বলব!

কেন হাতিয়ার তো তোমার হাতে।

হাতিয়ার দোলাতে যে ভয় হয়।

কেন ভয় কি! কমল অনীতার কপালে হাত রাখলে।

কি জানি যদি ভুল করে বসি। কিন্তু তুমি তো ব্যভিচারের মামলা আনতে পারতে!

ব্যভিচার? কমলের হাত বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল কপালে।

হ্যাঁ, তুমি তো দেখেছ! অনীতা তার হাত চেপে ধরে বলল। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি তা নই। আর ব্যভিচার করতে চাইলেই বা কি, সে-পুরুষ তো মেলে না!

মেলে না?

না।

তাই বুঝি তুমি আমার কাছে এলে?

হ্যাঁ, ভাবলাম, দেখি তুমি কার সঙ্গে ভাব করেছ?

আমি চাইলেই কি ভাব জমাতে পারা যায় অনীতা? কমল বললে।

পারা যায় না? অনিতা শুধালে।

না, সেখানেও নানা বাধা, কিন্তু তুমি তো আমার বিরুদ্ধে ক্লীবত্বের অভিযোগ আনতে পারতে।

কোন্ প্রাণে তা আনব? অনীতা কমলের কোলের কাছে সরে এল।

আমার তো সেই ভয় ছিল।

কেন?

আমাদের তো বিবাহ হয়েছে, পরিণতি হয় নি। তাই তো তোমার দুঃখ।

দু'বাহু দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে অনীতা বললে, তুমি বুঝেছ— তাহলে তুমি বুঝেছ?

এ-ক'দিনে যে অনেক বুঝতে হয়েছে।

দেখলে তো, হাতিয়ার আর কাটল না! অনীতা বললে।

জানি না, সে তোমার মর্জি। সে তো তোমারই হাতিয়ার।

নিয়ে নাও—অনীতা বের করলে সেই কাগজখানা। ছিঁড়ে ফেলে দাও!

না, কমল হাসল, ও তো ছিঁড়ে ফেললেই ছেঁড়া যায় না। ওর নকল আছে। তাছাড়া ওর সঙ্গে জড়িত আছে মিলনের বৈধতা, আমাদের সন্তানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার।

সত্যি—সন্তান তুমি চাও?

কেন চাইব না!

তাহলে কেন এসব হল? কেন আমরা ছেড়ে গেলাম?

ছেড়ে তো যাই নি, আমরা পরস্পরকে যাচাই করে নিলাম।

সর্বনাশ তো হতে পারত। অনীতা কমলের মুখের দিকে তাকালে।

হ্যাঁ, পারত, কিন্তু হয় নি। কমল বললে।

এখন?

এখন? নিবিড় চুম্বন অনীতার ঠোঁটে এঁকে দিয়ে কমল বললে, এখন আমাদের জীবন আবার শুরু হবে। হাতিয়ার বন্ধন কাটতে উদ্যত হবে না, বরং সে জলতরঙ্গ বাজনা বাজাবে।

জলতরঙ্গ?

হ্যাঁ, ঐ যে ছবির দেবশিশু, ঐ তো ছিল তোমার আমার কামনা। ওদের হাসি তো জলতরঙ্গেরই বাজনা।

অনীতা উঠে বসল, দেয়ালের দিকে তাকাল। শূন্য দেওয়াল। তারপরে উঠে দাঁড়াল। নেমে এল খাট থেকে।

ওকি, উঠলে যে? কমল অবাক হয়ে শুধালে।

তোমাকে প্রণাম করব।

প্রণাম?

কেন—প্রণাম বুঝি করতে নেই?

নুয়ে পড়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলে অনীতা।

কমল মাথায় হাত দিয়ে বললে, কিন্তু ব্যাপারটা বড় সেকেলে হয়ে গেল !

হোক সেকেলে, মুখ তুলে বললে অনীতা। এ আমার সমর্পণ। আমি বড় অসহায়, আমাকে নেবে তো ?

কমল তাকে হাতে ধরে তুলে বললে, তুমিও আমাকে গ্রহণ করবে তো ?

কমলের বুকে মুখ লুকিয়ে অনীতা বললে, দুজনে দুজনকে গ্রহণ না করলে তো জলতরঙ্গ বাজবে না।

যে ফুলে কাঁটা নেই

রণজিৎকুমার সেন

কলকাতার এই ন' নম্বর ওয়ার্ডে আজ প্রায় বছর দশেক ধরে বাস করছে নীলাদ্রি চ্যাটার্জি। নানা সাংস্কৃতিক সূত্রে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তার চিঠির বাক্সে প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু চিঠি কিংবা সাময়িকপত্র এসে জড়ো হয়। সংসারের নানা কাজের অবকাশে গল্প-উপন্যাস লিখে সে যে কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করে, এ পাড়ার লোকদের তা টের পাবার কথা নয়। তারা ততক্ষণে বাজারের হিসেব কিংবা টেব্‌ল-পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত। এক বারোয়ারী পুজোর চাঁদা ভিন্ন কারুর দরজায় এসে খোঁজ-খবর করাটা এখানকার ছেলে-ছোকরাদেরও রুচি-বিরুদ্ধ। ততক্ষণে কোথাও রকে বসে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান থেকে শুরু করে ফিল্ম-আর্টিস্টদের গোপন তথ্য নিয়ে তারা কশালো এবং রসালো হয়ে উঠতে অধিকতর উৎসাহী। নীলাদ্রির একতলার কোণের ঘরে কাগজের কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ নায়ক কোন্ নায়িকার চোখের জলে ডুবে গেছে, সে হিসেব রাখবার লোক নেই কেউ এ-পাড়ায়। আর বিভিন্ন বীটে যেসব পোস্টাল পিয়ন এসে প্রতিদিন ডাক সরবরাহ করে যায়, তাদের বেশীর ভাগই বই কিংবা সাময়িকপত্রের পাঠক নয়। চিঠি বা প্যাকেটের ওপরকার ঠিকানাটাই তাদের বীট-ক্লিয়ার করবার পক্ষে যথেষ্ট। ঠিকানার অন্তরালে যে মানুষটি, তার সম্বন্ধে তাদের জানবার আগ্রহও নেই, সময়ও নেই। এমনি করেই এ-পাড়ায় গত দশ বছরে কত পিয়ন এলো গেল, তার হিসেব নেই। তারা কেউ এলো চিঠি আর সাময়িকপত্র নিয়ে, কেউ এলো মনিঅর্ডার আর রেজিস্ট্রি নিয়ে, আর কেউ বা এলো টেলিগ্রাম নিয়ে। দশটা বছরের ইতিহাসে কত উত্থান-পতন ঘটে গেল, কত ঝড় বয়ে গেল, কত ফুল ফুটে ঝরে গেল ঋতুতে ঋতুতে, তার সাক্ষী কেউ রইল না ; কলের মানুষের মতো সেই ইতিহাসকে এক-একটা

বীটে শুধু ঠিকানা মিলিয়ে ছেড়ে দিয়ে গেল এক-একটি পিয়ন। তাদের কেউবা এই দশ বছরে রিটায়ার করে গেছে, কেউবা প্রবেশনার থেকে পার্মানেন্ট্ হয়েছে। নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে কেউ যে কোনোদিন তারা দেখা করে ছুটো ভালোমন্দ কথা জিজ্ঞেস করেছে, এমন ইতিহাস মনে নেই।

তাই বিস্মিত হলো নীলাদ্রি—যখন দেখলো, খাকী পোশাকে আবৃত হয়ে হাতে এক গাদা চিঠির মোটা ফাইল নিয়ে এক পোস্টাল পিয়ন ডিউটির মাঝখানে হঠাৎ একদিন অনাবশ্যকভাবে তার ঘরের চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বয়স বেশী নয়, খুব বেশী হলে বছর সাতাশ আঠাশ; ফুটফুটে চেহারা—রোদে পুড়ে কিছুটা তামাটে হয়ে উঠেছে। নাম শুভেন্দু। মাস ছ' সাত হলো পোস্টাল বীট নিয়ে এ পাড়ায় এসেছে। তার মধ্যে বার তিন চার তাকে বীট পাল্টাতে হয়েছে। গোড়াতে ছিল শুধু মনিঅর্ডার পিয়ন, তারপর সাধারণ ডাক আর রেজিস্ট্রি ডেলিভারিতেও লাগতে হয়েছে। মনিঅর্ডারের সূত্রেই গোড়ার দিকে শুভেন্দুকে ছু'একবার দেখেছিল নীলাদ্রি। দেখে মনে হয়েছিল—শুভেন্দু ঠিক অন্যান্য পিয়নের মতো নয়, কিছুটা আলাপী। নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করেছিল: 'তুমি বোধ করি এ পাড়ায় নতুন এলে। আমাদের বুড়ো পিয়নটি তা হলে এতদিনে বিদেয় হলো?'

শুভেন্দু বলেছিল: 'আদিত্য মুন্সীর কথা বলছেন তো? মাস ছুয়েকের জন্যে জোড়াসাঁকোয় তাঁর বীট পড়েছে, সেখান থেকেই রিটায়ার করে তিনি দেশে চলে যাবেন। অফিস থেকে এ-পাড়ায় আদিত্য মুন্সীর জায়গায় সম্প্রতি আমাকে বহাল করেছে।'

নীলাদ্রি বলেছিল: 'তা বেশ। নতুন মানুষ তুমি, দেখা হয়ে ভালো হলো। মধ্যে মধ্যে আমার নামে এক-আধটা মনিঅর্ডার আসে; যাতে গণ্ডগোল না হয়, সেদিকে একটু লক্ষ্য রেখো। আমি

বাড়িতে না থাকলে আমার স্ত্রী কিংবা ছেলেকে দিলে তারা আমার হয়ে সই করে রেখে দিতে পারবে।'

জবাব দিতে গিয়ে কি মনে করে মুখ টিপে একবার হেসেছিল শুভেন্দু, তারপর বলেছিল: 'পোস্টাফিসে আজকাল এ ধরনের কোনো আইন নেই, তা ছাড়া আমাদের ওপর ইন্স্ট্রাকশনও নেই কিছু।'

শুনে খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল নীলাদ্রি।—'কেন, এর আগেকার পিয়ন তো আমার এ্যাবসেন্সে এরকম কতবার ডেলিভারি দিয়ে গেছে, কই—তাদের বেলা তো কোনো ট্রাব্ল হয়নি।'

'দিলে সে তাদের নিজেদের দায়িত্বে দিয়ে গেছে, আপিসের আইন মানেনি।' বলে একটুকাল থেমে কি যেন ভেবেছিল শুভেন্দু, তারপর গলার স্বরকে অপেক্ষাকৃত খাদে নামিয়ে এনে বলেছিল: 'সে জন্যে ভাববেন না স্যার, পরিচয় যখন হলো, মনিঅর্ডার এলে আপনার টাকা পেতে অসুবিধে হবে না।'

খুশি হয়ে নীলাদ্রি বলেছিল: 'থ্যাঙ্ক্ ইউ।'

আর দ্বিরুক্তি না করে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি টেনে সেদিনের মতো বিদায় নিয়েছিল শুভেন্দু।

দ্বিতীয়বার মনে আছে, মনিঅর্ডার রিসিভ করে একটা টাকা তাকে বক্‌শিশ দিয়েছিল নীলাদ্রি। স্বেচ্ছায় হাত পেতে টাকাটা নিতে চায়নি ছেলেটি, নীলাদ্রি জোর করে গুঁজে দিয়ে বলেছিল: 'আপত্তি কোরো না, রেখে দাও, বাড়িতে বাচ্চাদের মিষ্টি কিনে দিয়ো।'

একথার পর টাকাটা আর ফিরিয়ে দিতে পারেনি শুভেন্দু, পকেটে রেখে দিয়ে কেমন একবার অভিভূতের মতো তাকিয়েছিল নীলাদ্রির মুখের দিকে।

নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করেছিল: 'নাম কি তোমার, দেশ কোথায়?'

অকপটে ছেলেটি বলেছিল: 'আজ্ঞে শুভেন্দু মণ্ডল। মামুদপুরের

মণ্ডল পরিবারের বোধ করি নাম শুনে থাকবেন, তাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক।'

মামুদপুরের মণ্ডলদের একসময় যথেষ্ট নাম-ডাক ছিল। পুব বাংলার এ পরিবারের সাহস আর গায়ের জোর ছিল বিখ্যাত। শোনা যায়—মাধব মণ্ডল একবার নাকি বিরাট ডাকাতদলকে একাই ঘায়েল করেছিল। হাতির মতো স্বাস্থ্য আর বাঘের মতো জোর ছিল তার গায়ে। একাই সে মামুদপুরের মান রাখতো। গ্রামে চৌকিদার খাটাতে হতো না বলে ইউনিয়ন বোর্ডের পয়সা বেঁচে যেতো। তার ছেলে মথুর মণ্ডল আর নাতি যদু মণ্ডলও কম যেতো না, দরকার হলে সরকারী পুলিসের গুলিকে লাঠির মাথায় ঠেকিয়ে দিত। তেমনি দান-ধ্যানটাও তাদের দেখবার মতো। জমিদারী না থাকলেও জমিদারের কাছ থেকে ভেট আসতো নিয়মিত। যদুকে কাছে পেলে বেনে জমিদার দত্তরা বলতেন: 'আমরা আর কি জমিদার, জমিদার তো তুমি। তোমার কথায় এ গাঁয়ের চাষাভূষোরা ওঠে বসে; জমিও ভালো ফসল দেয়। এর পরও কি জমিদারি নিয়ে আমাদের কিছু গর্ব করবার আছে!' সেই যদু মণ্ডলের জ্ঞাতি হয়ে কোনো ছেলে কোনোদিন এভাবে কলকাতায় এসে ডাকপিয়নি করে জীবিকার্জন করবে, একথা ভাবতেও যেন কেমন লেগেছিল নীলাদ্রির। বিস্ময়ে তাই শুভেন্দুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনিঅর্ডার ফর্ম থেকে কুপনটাকে ছিঁড়ে নিয়ে ফর্মটাকে শুভেন্দুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নীলাদ্রি বলেছিল: 'তাই বলো, মামুদপুরের মণ্ডলদের জ্ঞাতি তোমরা? দেশের লোক কি কম উপকার পেয়েছে তোমাদের! সারা বাংলাদেশের লোক জানে সে কথা। তোমাকে পেয়ে আমি এবারে নিশ্চিন্ত হলাম।'

'কিন্তু বাংলাদেশটা আর রইল কোথায় স্যার, সবই গেল!' বলে চোখের কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা না করে আবার নিজের কাজে চলে গিয়েছিল শুভেন্দু।

যে কথা নিয়ে এতদিন এত লিখেছে নীলাদ্রি, একটু কথার ছোঁয়া দিয়ে তাকে যেন গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল ছেলেটি। মনিঅর্ডারের কুপন আর লেখার দক্ষিণাটা হাতের মুঠোতেই ছিল, কিন্তু সেদিকে মন ছিল না নীলাদ্রির; এ-পাড়ায় গত দশ বছরে কেউ তার দরজায় এসে যেকথা একটি বারের জন্যেও উল্লেখ করেনি, সেখানে এই ছোকরা ডাক-পিয়নের মুখে তারই প্রতিধ্বনি শুনে অবাক হয়ে তার কথাটাই শুধু ভাবছিল নীলাদ্রি। স্নানের জন্যে তাড়া দিয়ে স্ত্রী সুভদ্রা কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল, লক্ষ্য ছিল না তার।

এরপর প্রায় মাস দু'তিন কেটে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটিবারও আর চোখে পড়েনি শুভেন্দুকে। এই দু'তিন মাসে মনিঅর্ডার যে আরও দু'একখানি না পেয়েছে নীলাদ্রি, এমন নয়; কিন্তু যে নিয়ে এসেছে, সে নতুন পিয়ন, শুভেন্দু নয়। শুভেন্দুর মতই তার সঙ্গে আবার নতুন করে তোতাপাখীর বুলি আওড়াতে হয়েছে তাকে। প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে—নতুন পিয়নটির নাম সতীশ দাস। বলেছে: 'গরীবের দিকে একটু নজর রাখবেন বাবু, আপনার মনিঅর্ডারের কোনো গণ্ডগোল হবে না।'

নজর রাখা মানে—মাঝে মাঝে পকেট থেকে কিছু হাতে তুলে দেওয়া। শুনে ভালো লাগেনি নীলাদ্রির। নিজে থেকেই মুখফুটে তার কাছে ঘুষ চাচ্ছে সতীশ দাস। অথচ শুভেন্দুকে নীলাদ্রি খুশি হয়ে একটা টাকা দিতে গেলে সে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। শুভেন্দু মণ্ডলের অভাব কি সতীশ দাসের চাইতে কিছু কম? কিন্তু রুচি আলাদা। তা নিয়ে মুখে কিছু উল্লেখ করেনি নীলাদ্রি। উল্লেখ করতে গেলে উল্টে তাকেই হয়তো ঠকতে হবে! দেশ-গাঁয়ের যা অবস্থা, শুভেন্দু ঠিকই বলেছিল: 'বাংলাদেশটা আর রইল কোথায় স্যার, সবই যে গেল!'—এমনি করে ঘুষ নিয়ে আরও যেতে বসেছে দেশটা। কিন্তু তা নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিপদ আছে। নিজেকে যতখানি সম্ভব সংযত করে নিয়ে তাই নীলাদ্রি

শুধু জিজ্ঞেস করেছিল : 'এর আগে শুভেন্দু বলে যে ছেলেটি আসতো, তার কি হলো ?'

সতীশ দাস বলেছিল : 'এখন সে আর মনিঅর্ডারে নেই, হয়তো জেনারেল মেইল সেকশনে কিংবা অন্য কোনো ডিপার্টমেণ্টে ট্রান্সফার্ড হয়ে থাকবে।'

শুনে মনটা হঠাৎ যেন একবার কেমন করে উঠেছিল নীলাদ্রির, কিন্তু কেন, তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

এমনি করেই দু'তিন মাস কেটে গেল।...

সকালের দিকে সেদিন জানলার পাশে নিজের টেব্‌লে বসে কি কতকগুলো লেখার ফাইল নিয়ে কাজ করছিল নীলাদ্রি, হঠাৎ বাইরে দৃষ্টি যেতেই তার চোখে পড়লো—জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শুভেন্দু। তেমনি খাকী পোশাকে আবৃত, হাতে দু'ভাঁজ করা পুরু বোর্ডের ফোলিও। সে ফোলিও-এ এখন আর চিঠি বা কাগজপত্র নেই। হাতের ফাইল গুছিয়ে রাখতে রাখতে উৎসাহী হয়ে নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করলো : 'সে কি, তুমি! এখনও এ পাড়ায় তুমি ডিউটিতে আছো ?'

স্মিতমুখে শুভেন্দু বললো : 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সকালের বীটে কাগজ আর চিঠিপত্র ডেলিভারি দিয়ে চলে যাই। ঘরে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যায় বলে কাজের পর এক মিনিটও আর কোথাও দাঁড়াবার ফুরসত পায়নি।'

একটা স্বাভাবিক কৌতূহলের দৃষ্টিতেই এবারে তার মুখের দিকে চোখদুটো তুলে ধরলো নীলাদ্রি।—'আজ তা হলে ফুরসত পেয়েছ! কিছু বলবে ? কাজ আছে কিছু ?'

শুভেন্দু বললো : 'না, কাজ কিছু নয়, এমনিই এলাম। আজকের ডাক এমন কিছু ভারি নয়, অল্প সময়ের মধ্যেই তাই বীট শেষ হয়ে গেল। ভাবলাম—হাতে যখন কিছু সময় পেলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

ফাইলের কাগজপত্র গুছোতে গুছোতে তেমনি কৌতূহলের কণ্ঠেই নীলাদ্রি বললো : 'তবু ভালো যে, পাড়ায় এত লোক থাকতে আমাকে তোমার হঠাৎ মনে পড়লো !'

শুভেন্দু কিন্তু এতটুকুও সঙ্কোচ করলো না, বললো, 'লোক তো কতই আছে, কিন্তু আপনার মতো এমন দরদী লোক কে আছে ! শুধু দরদী লোক নয়, দরদী লেখক !'

শুনে হঠাৎ কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল নীলাদ্রি। এ বলে কি ? জানলো কি করে শুভেন্দু যে, অবকাশ মতো সে কিছু কিছু সাহিত্য-চর্চা করে কাটায়। বললো : 'তুমি আর কাউকে মনে করে আমাকে ভুল করোনি তো ? আমি আবার কবে দরদী লেখক হতে গেলাম ?'

শুভেন্দুর গলা এবারে আরও বেশী স্পষ্ট শোনালো, বললো, 'আপনি আমাকে মিথ্যে পরীক্ষা করতে চাইলে কি হবে, আপনিই যে কথাশিল্পী নীলাদ্রি চ্যাটার্জি, তা আমি প্রথম দিনের বীটে এসেই অনুমান করেছিলাম ; পরে সে অনুমান আমি সত্য বলে জেনেছি।'

একটা স্বাভাবিক কৌতূহলে নীলাদ্রির সারা মন এবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো : 'কি করে জানলে ?'

শুভেন্দু এবারে দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কোনোরকম দ্বিধা না করেই বললো : 'লক্ষ্য করে দেখলাম—প্রতিদিন আপনার যা ডাক আসে, এরকমটা আর কারুর আসে না। বাংলাদেশের এমন সাপ্তাহিক আর মাসিকপত্র নেই—যা নিয়মিত আপনার কাছে না আসে। অপরাধ নেবেন না, একদিন কৌতূহল হলো একখানি কাগজ খুলে দেখতে। দেখলাম সূচীপত্রে আপনার নাম রয়েছে, প্যাকেটের নামের সঙ্গে একটুও গরমিল নেই। প্রথম গল্পটাই আপনার। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম, সারা মনের মধ্যে আঁকা রয়ে গেল ছবিটা। কাগজখানিকে আবার প্যাকেটে পুরে

আপনার লেটারবক্সে ফেলে দিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু শ্যামলালের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে অলকার বৈধব্য প্রেমকে আপনি যেখানে এনে করুণভাবে দাঁড় করিয়েছেন, সেই দৃশ্যটা বার বার মনে এসে ধাক্কা দিতে লাগলো। খুব সম্ভব গল্পটার নাম ছিল মীমাংসা, কিন্তু শ্যামলাল আর অলকার ভাগ্যবিপর্যয়ের কোথাও মীমাংসা হয়নি। হলে বোধ করি গল্পটা নষ্ট হয়ে যেতো, আপনি নিপুণভাবে গল্পটিকে সার্থক রূপ দিয়েছেন।'

বেশ লাগছিল এতক্ষণ শুভেন্দুর কথাগুলিকে। অবাক-বিস্ময়ে তাই দু'চোখ বিস্ফারিত করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল নীলাদ্রি, আর মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছিল সেই প্রথম দিনের দেখা ছেলেটিকে। প্রথম দিনই মনে হয়েছিল—সাধারণ ডাকপিয়নদের চাইতে শুভেন্দু কিছুটা স্বতন্ত্র। আজ লক্ষ্য করে দেখলো নীলাদ্রি—ওর একটা আলাদা মন আছে, আছে আলাদা একটা জগৎ—যে জগৎটা এতদিন তার নিজের কাছেও একেবারে ঢাকা ছিল। আজ শুভেন্দুর মনের হিরণ্ময় পাত্র একটু একটু করে উন্মোচিত হয়ে নীলাদ্রিকে একেবারেই বিস্মিত করে দিল। এর পরেও কোন্ মুখে সে অস্বীকার করে বলবে যে, সে নীলাদ্রি চ্যাটার্জি নয়! বরং মুখ তুলে সে বললো : 'বাঃ, তোমার তো বেশ সাহিত্যবোধ আছে। এস, ঘরে এসে বোস।'

আপত্তি করলো না শুভেন্দু। অত্যন্ত সঙ্কোচে এবারে ঘরের মেঝের দিকে পা বাড়িয়ে শতরঞ্চি পাতা খাটের একপাশে এসে বসলো সে, তারপর ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো, 'শুধু মীমাংসা কেন, আপনার আরও অনেক গল্প আমি ইতিমধ্যে পড়ে নিয়েছি। আপনার 'গ্রাম-নগর' গল্পটিতে সোমনাথকে আপনি যে ভাবে এঁকেছেন, তার সঙ্গে আমার নিজের জীবনের অনেকখানি মিল আছে। সোমনাথ আমার কাছে এইজন্যে বড় যে, তার মধ্যে আমি আমার নিজেকেই দেখতে পেয়েছি।'

নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করলো : 'কি রকম ?'

শুভেন্দু বললো : 'আপনার সোমনাথ সৎমার সংসারে বর্ধিত, আমিও তাই। সোমনাথ নিজেকে সংসারের জন্যে নিঃশেষ করে দিয়েও সংসারকে পায়নি, আমিও না। তারপর সোমনাথ একদিন অন্ধকার রাত্রে গ্রাম ছেড়ে ছুটলো শহরের পথে ভাগ্যান্বেষণে, আমিও ছুটলাম। কলকাতায় এসে সোমনাথ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে দাঁড়ালো ; কিন্তু আমি তা পারিনি। জীবিকার লড়াইয়ে বিভ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে এসে ঢুকেছি এই পোস্টম্যানের চাকরিতে।'

নীলাদ্রি এতক্ষণ অবাক হয়ে যাচ্ছিল শুভেন্দুর কথা শুনে। গল্প লেখবার আগে এমন কোনও চরিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না, আজ শুভেন্দুর মধ্যে তার পরিচয় পেয়ে কাহিনী রচনায় নিজের কল্পনার ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেল নীলাদ্রির। বললো : 'এত বড় শহরে সোমনাথের জন্যে আমি কোনো কাজ খুঁজে পাইনি। সেদিক থেকে সোমনাথের চাইতে তুমি অনেক বেশী সার্থক।'

এবারে তার মুখের দিকে কেমন একটা ভাসা-ভাসা দৃষ্টি তুলে ধরলো শুভেন্দু, তারপর বললো : 'একে স্যার সার্থক বলে কিনা জানি না, কিন্তু এর পিছনে অনেক আঘাত লুকিয়ে আছে।'

কথাটা বলে যেন অনেক কথা বুঝিয়ে দিতে চাইল শুভেন্দু।

মমতার চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি বললো : 'বড় সার্থকতা যে বড় আঘাত থেকেই আসে। সে আঘাত বস্তু-জগতেরই হোক্ আর শিল্প-জগতেরই হোক্, তার রূপ কোথাও বদলায় না। আমরা ভুল করে দুটোকে শুধু আলাদা করে দেখি।'

শুভেন্দু কেন যেন এবারে আর কিছু একটাও বলতে পারলো না।

একটুকাল থেমে নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করলো : 'চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তো নিশ্চয়ই, চা দিতে বলি তোমাকে ?'

সলজ্জে মাথা নিচু করে শুভেন্দু বললো : 'আজ্ঞে না স্যার, চা খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই।'

'তবে আর কিছু খাও।'

এবারও সলজ্জ কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে শুভেন্দু বললো : 'না, না, কিচ্ছু দরকার নেই। এতক্ষণে তো অনেকটা বেলা হলো, আজ বরং উঠি স্যার। আবার কোনোদিন বীট বুঝে আসবো।'

এবারে নতুন কথা কিছু খুজে না পেয়ে নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করলো, 'কলকাতায় তোমার বাসা কোথায় ?'

খাটের পাশ থেকে উঠে পড়ে শুভেন্দু বললো : 'আজ্ঞে না, কলকাতায় আমার কোনো বাসা নেই ; বেলঘরিয়া থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি।'

সেই মুহূর্তে বোধ করি পাশের বাড়ি থেকে দেয়ালঘড়ির শব্দ কানে এলো : বারোটা। ত্রস্তে এবারে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়ে দিয়ে শুভেন্দু বললো : 'সে কি, এরই মধ্যে বারোটা বেজে গেল! অনেক দেরি হয়ে গেল স্যার, এসে আপনারও কমখানি কাজের ক্ষতি করে গেলাম না। এবারে আসি স্যার।'

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেলার দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি এমন কথাটা বলতে পারলো না যে, 'আর দু'দণ্ড বসো, আমার কাজের ক্ষতির চাইতে তোমার সঙ্গে আলোচনা করে অনেক বেশী ভালো লাগছে।' তার বদলে শুধু ছোট্ট করে 'এসো' বলে তাকে বিদায় দিল নীলাদ্রি।

পাশের দরজা দিয়ে এতক্ষণে সামনে এসে দাঁড়ালো সুভদ্রা। সেই কখন থেকে নিজের মধ্যে নিজে সে জ্বলে মরছিল ; এরই মধ্যে রাগে দু'বার গাল টিপে দিয়েছে সে ছ'বছরের বাবলুকে, সেই থেকে কলতলায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা। সেই দুঃখে পারলে সুভদ্রাও কাঁদতো, কিন্তু তা পারেনি, এবারে ঝঙ্কার দিয়ে এসে বললো : 'ধন্যি তুমি লোক যাহোক।

কোথাকার পিয়ন, ছু'খানা চিঠি বিলি করে ভিন্ন কিছু নয়, তাকে নিয়ে বক্‌বক্‌ করে বেলা বারোটা বাজালে। এদিকে সেই কখন থেকে বাবলু তার বাবার সঙ্গে খাবে বলে বায়না ধরে এত বেলা অবধি একগ্রাস ভাত পর্যন্ত মুখে দেয়নি। মানুষের কি খিদে-তেষ্টা আছে! সেই কোন্‌ সকাল থেকে হাঁড়ি ঠেলবো, অথচ সময় মতো তোমরা যদি আমাকে একটু অবসর করে দাও। বাংলাদেশে আর কেউ লেখক নেই, তারা সবাই তোমার মতো বেলা বারোটা অবধি পিয়নকে ঘরে ডেকে এনে এমন গ্যাজায় না। যেমন শ্রোতা, তেমনি তার বক্তা। লেখাপড়া-জানা ভদ্র পাঠক জুটলে না জানি কী হতো!'

থামতে কি চায় সুভদ্রা, তবু একবার দম নিতে হয়।

সেই ফাঁকে নীলাদ্রি বললো, 'এমন কতদিন বারোটার পরেও আমরা খেয়েছি,—তা নিয়ে কই তুমি তো কোনোদিন রাগ করোনি! বাবলু আমার সঙ্গে খাবে জানলে আমিই কি ছাই এতক্ষণ দেরি করি?'

সুভদ্রা বললো: 'না, দেরি কি আর করতে! তোমাকে যেন আজ নতুন চিনি?'

নীলাদ্রি বললো: 'পুরনো ইতিহাসে ডাকপিয়ন ছিল না, তবু দেরি হতো, তবে আর মিছেমিছি শুভেন্দুকে নিয়ে কথা শোনাচ্ছো কেন? ছেলেটি আসলে এ কাজের উপযোগী নয়, বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। নইলে ওর মধ্যে আগুন আছে, সংস্কৃতির ঐতিহ্য আছে, ছেলেটি সত্যিই ভালো। আলাপ করলে তুমিও খুশি হতে।'

'থাক, আমার আর খুশি দিয়ে দরকার নেই।' থেমে সুভদ্রা বললো: 'বইয়ের পর বই লিখে এক পয়সা তো কই কখনও ঘরে আনতে দেখি না; ওদিকে শুনি—সাহিত্য করে অমুকে বাড়ি করলো, অমুকে গাড়ি করলো, আর তোমার ঘরে আজ অবধি দাঁড়ি-পাল্লা ঠিক হলো না। চুলোয় যাক্‌ সে সব! বলি, এবারে কি

উঠবে—না আর কারুর জন্যে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বসে থাকবে?' বলে যেমন এসেছিল, তেমনি দ্রুত সে অন্তর্ধান হয়ে গেল।

হাতের ফাইলটাকে যে ভালো করে গুছিয়ে রাখবে এমন আর সময় হলো না নীলাদ্রির। সে জানে—সুভদ্রা সহসা চটে না, কিন্তু চটলে আর থামতে চায় না। যে কারণেই হোক্, এবারে তার না থামার পালা। অতএব নীলাদ্রিকে এবারে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়তে হলো, উঠে বাবলুকে গলা ছেড়ে ডাকতেই ভিতর মহল থেকে আর একবার সুভদ্রার কাংস কণ্ঠ কানে ভেসে এলো: 'থাক, ছেলেকে আর আদর দেখাতে হবে না। এবারে পারো তো মাথায় দু'মগ জল ঢেলে ছেলেকে নিয়ে এসে খেতে বসো, আমার সাত পুরুষ ধন্য হোক।'

সুভদ্রার সাত পুরুষের হিসেব নীলাদ্রির জানা নেই। আপাতত এক পুরুষই যথেষ্ট। কথা না বাড়িয়ে এবারে তাই সোজা সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকে পড়লো।...

বাইরে প্রখর রোদে তখন চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। শিয়ালদায় এসে পৌঁছোতেই অনেকটা ঘেমে উঠেছে শুভেন্দু। তবু মনটা খুশিতে যেন কেমন উপচে পড়েছিল। এতদিন যার লেখা পড়ে ভালো লাগতো, ইচ্ছে করতো নিজে থেকে সেধে গিয়ে পরিচয় করতে, আজ তার সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলতে পেরে বড় ভালো লাগছে। তীর্থে গিয়ে মানুষের যেমন ভালো লাগে, এও যেন ঠিক তেমনি ভালো লাগা! বিশেষ করে যে পথের পথিক সে নিজেও, সে-পথের উঁচু গাছ দেখে তার ছায়ায় দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে পারলে যে আনন্দ, নীলাদ্রি চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলেও ঠিক তেমনি আনন্দ পেলো বৈ কি সে? এই আনন্দের মধ্যেই যে আশ্রয় চেয়েছিল সে স্কুল-জীবন থেকে! এখনও সেদিনের কথা মনে পড়লে মন

রোমাঞ্চিত হয়। স্কুল-ম্যাগাজিনে সে তাদের মামুদপুরের চর নিয়ে ছোট্ট একটা গল্প লিখে মাস্টার আর ছাত্রদের কী প্রশংসাটাই না পেয়েছিল। সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র তখন সে। তার বয়সী ছেলের হাতে ও-রকম পাকা গল্প কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। বাংলার টিচার জগদীশবাবু কমনরুমে ডেকে নিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, মণ্ডল-বাড়ির গৌরব না বাড়লেও বড় হয়ে তুমি সাহিত্যিক হবে সন্দেহ নেই। তাই বলে পাঠ্য বই বুজিয়ে রেখে দিন-রাত যেন শুধু এদিকেই লেগে থেকো না, তাহলে পস্তাবে।' ছেলেরা পারে তো তখন তাকে মাথায় করে নিয়ে নাচে। সেই নাচের মধ্যেও জগদীশবাবুর কথাটা সে ভোলেনি। এনুয়ালে ভালো রেজাল্ট করে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল সে।

ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল শুভেন্দু, হঠাৎ সামনের সিট থেকে প্রৌঢ় গোছের কে এক ভদ্রলোক তাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন: 'পোস্টাল ধর্মঘটের কথা শুনতে পাচ্ছি, শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি আপনারা স্ট্রাইক করবেন নাকি?'

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বললো, 'পে-স্কেলের ডিশিসনের ওপরে সেটা নির্ভর করছে। আমার মতো যারা ছাপোষা মানুষ, তাদের পক্ষে স্ট্রাইকের ঝুঁকি নেওয়া কষ্টকর সন্দেহ নেই, কিন্তু অভাবটা যেখানে আমাদের সম্মিলিত অভাব, সে-ঝুঁকি না নিয়েই বা উপায় কি বলুন?'

'তা তো বটেই।' মাথা ঝাঁকিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, 'এদেশের প্রব্লেম যদি কোনোদিকে কিছু একটাও সলভ হয়! আমাদের মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কেরও সেই অবস্থা। ইউনিয়ন ডিশিসন নিয়েছে পেন-স্ট্রাইকের।'—বলতে বলতে উঠে পড়লেন ভদ্রলোকটি। তারপর দমদম স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াতেই নেমে পড়লেন।

কিছুটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো শুভেন্দু। মনটা এতক্ষণ কোথায় সেই কোন্ দূরে চলে গিয়েছিল, তাকে আবার প্রাত্যহিকের

সংগ্রামের মধ্যে টেনে এনে নিজের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেলেন ভদ্রলোকটি। নিশ্চয়ই বছর কুড়ি-পঁচিশের কেরানী হবেন ভদ্রলোক; নইলে অন্যকথা বলে আলোচনা করতেন। জাত-কেরানী বাঙালীর এ ভিন্ন আলোচনারই বা আর কি আছে? যেখানেই তারা দুজন জড়ো হলো, অমনি অফিসের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলো। এদেশের আষ্টেপৃষ্ঠে কেরানী মনোবৃত্তি।—কেমন একটা অস্বস্তিতে নিজের মধ্যে একবার জ্বলে উঠলো শুভেন্দু, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। গাড়িটা আবার নতুন করে মোশন নিতেই মনটা ধীরে ধীরে আবার বাউল হয়ে উঠলো।

স্কুলের চার-দেয়ালের গণ্ডিটা চিরকাল তার সারা মনে ছড়িয়ে আছে। তার প্রথম স্বপ্ন, প্রথম সাহিত্যপ্রীতি, সে যে সব কিছু সেই মামুদপুর স্কুলেই। কথাটা শুনতে হয়তো খারাপ লেগেছিল, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—ঠিকই বলেছিলেন সেদিন বাংলার টিচার জগদীশবাবু। তার সাহিত্যে মণ্ডল-বাড়ির গৌরব বাড়বার কিছু ছিল না, এখনও নেই। মণ্ডলরা সাত পুরুষের ব্যবসায়ী, তা ছাড়া শক্তি, সাহস ও দান-ধ্যানের প্রসিদ্ধি আছে তাদের। কিন্তু কেমন করে যেন কি হয়ে গেল! দু'হিস্যার শরিকের ব্যাপার নিয়ে এক সময় যদু মণ্ডলদের পরিবারের সঙ্গে তাদের মন-কষাকষিটা দানা বেঁধে উঠলো। জ্ঞাতি সম্পর্কে যদু মণ্ডল নবীন মণ্ডলের খুড়ো। সেই নবীন মণ্ডলের প্রথম সন্তান শুভেন্দু। ছোটবেলায় দেখেছে—তশীলদারি আর তেজারতির কাজ ছেড়ে বিশজন ঘরামী রেখে ঘর-ছাউনির কাজ খুলেছেন বাবা। এখান থেকে সেখান থেকে ডাক এসেছে, অমনি ছুটে গিয়ে হিসেবপত্রের খসড়া করে দিয়ে ঘরামী খাটিয়েছেন তিনি। এমনি কত জায়গায় ভাগে ভাগে গিয়ে বাংলো, চালাঘর, ইস্কুল আর ছাপরা বেঁধে দিয়ে এসেছে তারা। তাদের সেই তৈরী স্কুল-ঘরে বসে পড়া শিখেছে শুভেন্দু। কিন্তু এক উঠোনে উত্তর-দক্ষিণ পোতায় জ্ঞাতিদের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত

কেমন যেন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হতো বারার। একদিন তাই নিজেদের হিস্সা বিক্রি করে দিয়ে নতুন করে কার্তিকপুর এসে ঘর বাঁধলেন তিনি। নৌকোর ঘাটে এসে ঘরামীরা বললো, 'আমাদেরও সঙ্গে নেন কত্তা।'

নবীন মণ্ডল বললেন, 'তোদের নিয়ে গেলে সেখানে যে নতুন নতুন গিয়ে তোরা না খেতে পেয়ে উপোষ দিয়ে মরবি। আগে গিয়ে ঠিক হয়ে বসি, তারপর দেখি কার্তিকপুরের বাবুরা প্রাসাদে বাস করেন—না ছাপরায় থাকেন!'

ঘরামীরা বললো: 'আমাদের যেন পায়ে রাখেন কত্তা!'

উত্তরে জিভে কামড় দিয়ে নবীন মণ্ডল বললেন: 'ছিঃ, ছিঃ তোরা যে আমার মাথার মাণিক! গিয়ে একটা কিছু সুবিধে করতে পারলেই তোদের খবর দেবো।'

খবর দিয়েছিলেন বৈ কি তিনি! সেই খবর পেয়ে বিশজন না হোক্ অন্তত পাঁচজন ঘরামী এসে কার্তিকপুরে ঠাঁই নিয়েছিল। নতুন করে তাদের ব্যবসা ধরিয়ে দিয়েছিলেন নবীন মণ্ডল।...

কিন্তু একি? ট্রেনটা হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল কেন? খিদেয় যে এদিকে পেটের নাড়ী ক্রমেই পাক দিয়ে উঠছে! জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইঞ্জিনের দিকে একবার দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরলো শুভেন্দু।

সামনের সিট থেকে কে একজন বললো: 'লাইন ক্লিয়ার নেই, নিশ্চয়ই সিগ্‌নাল ডাউন দেয়নি। এ আপদ তো হামেশাই লেগে আছে!'

ভরাপেট থাকলে এ আপদ ঘটলে ক্ষতি ছিল না শুভেন্দুর। দেরি করে ফেরা মানে শুধু তো তারই দেরি নয়, ঘরে আট মাসের টুটুলকে নিয়ে জানলায় মুখ বাড়িয়ে আছে বীণা; বাংলাদেশের সতীসাধ্বী স্ত্রী। তা ছাড়া নির্মলাও তো আছে, নামে বিধবা, একমাত্র বোন। শুভেন্দু ফিরে না যাওয়া অবধি তারাও যে না খেয়েই বসে থাকবে।

ইতিমধ্যে কেমন একটা ভাঙা-ভাঙা স্বরে ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠতেই সামনের সিটের সেই লোকটি গলা খাঁকারি দিয়ে পুনরায় বললো : 'এবারে ছাড়লো ; ব্যাটা পয়েন্ট্‌সম্যানের এতক্ষণে হুঁশ হয়েছে !'

সত্যিই ছাড়লো গাড়িটা ! এক কথা ভাবতে গিয়ে নানা কথায় জড়িয়ে যাচ্ছিল শুভেন্দুর মনটা, আবার ধীরে ধীরে সেই কার্তিকপুরের জীবনে ফিরে এলো। সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলো সে। গ্রাম না পাল্টালে, স্কুল না পাল্টালে ফার্স্ট ডিভিশনটা অন্তত থাকতো। তার বদলে সেকেণ্ড ডিভিশন। সেই রেজাল্ট নিয়েই মামুদপুরের বাংলার টিচার জগদীশবাবুকে সে চিঠি দিয়ে আশীর্বাদ চেয়ে পাঠালো। উত্তরে তিন পয়সার একটা পোস্টকার্ড ব্যয় করতে কার্পণ্য করেননি জগদীশবাবু, লিখলেন : 'তুমি বড় হও, বড় হয়ে সকলের মুখ উজ্জ্বল করো। তোমার সাহিত্যসাধনা জয়যুক্ত হোক্। তোমার বয়সে আমার নিজেরও এককালে উন্মাদনা এসেছিল, কিন্তু পরে আর রইল না। আশীর্বাদ করি, তোমার যেন থাকে।'

কতক্ষণ সেই চিঠিখানির দিকে সেদিন মুগ্ধবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল শুভেন্দু, আজ আর তা মনে নেই। কিন্তু লেখাপড়ায় সেই বুঝি প্রথম বাধা এলো ! কিছুর মধ্যে কিছু নয়, মা হঠাৎ একদিন হার্টের রোগে শয্যা নিলেন। বাবা বুঝতেই পারেননি যে, রোগটা কঠিনের দিকে যাবে। চিরকাল টোট্‌কায় বিশ্বাস করতেন বাবা, সেই টোট্‌কা দিয়েই তিনি চিকিৎসা করতে লাগলেন মার। কিন্তু মা আর ভালো হলেন না, বললেন : 'আর কেন, এবারে তোমার চিকিৎসা রাখো, আমি শান্তিতে চোখ বুজি।'—বাবা তবু চিকিৎসা বন্ধ করেননি, কিন্তু মা আর রইলেন না। শান্তিতে যে তিনি যেতে পারেননি, তা তাঁর রোগপাণ্ডুর মুখখানির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল শুভেন্দু। অমন সুন্দর নিটোল চেহারার ওপর কালি পড়ে চুপসে

গিয়েছে। সেই চোপসানো চেহারার ওপর চোখ দুটো ভাসছিল। ম্যাট্রিক পাসের খবর নিয়ে শুভেন্দু ঘরে ফিরে এলে মার সেদিন কি আনন্দ! সে-কথা মনে করে মাতৃহীন সংসারে সেদিন চোখের জল ঢেকে রাখতে পারেনি সে। পাশে এসে বসে নির্মলাও চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলেছিল : 'মা নেই, আমরা তবে কি করে এঘরে কাটাবো দাদা?'—চোখের জল মুছতে মুছতে শুভেন্দু বলেছিল : 'বাবা তো আছেন, দুঃখ করিস কেন?—এতবড় নির্ভরতার কথা বলেও নিজের মনে কিন্তু সান্ত্বনা পায়নি শুভেন্দু, উঠে বাড়ির সামনের ফাঁকা মাঠ ছাড়িয়ে যেখানে দুটো বড় বড় বট আর অশ্বথ জড়াজড়ি করে আছে—তার ছায়ার নিচে গিয়ে চুপ করে বসে পড়েছিল।...

ট্রেনটা যত দ্রুত ছুটে চলেছিল, তার চাইতেও দ্রুত ছুটে চলেছিল শুভেন্দুর মনটা। এমন করে যে মন দৌড়োতে পারে, কোনোদিন পরীক্ষা করে দেখেনি সে। আজ ভাবতে গিয়ে মনে হলো, মনের মতো ভাগ্যটাও যদি দৌড়োতে পারতো, তবে অন্তত এই ডাকপিয়নের কাজে সেই কোন্ সাত সকালে কাক-না-ডাকতে উঠে এমন করে রোজ তাকে বেলঘরিয়া থেকে কলকাতায় ছুটে অধিক বেলায় পেটে খিদে নিয়ে ফিরতে হতো না।

ভাবতে গিয়ে নিজের ওপরেই ধিক্কার আসছিল শুভেন্দুর। হঠাৎ সেই মুহূর্তে হুইসেল বেজে গাড়িটা আবার দাঁড়িয়ে গেল। বেলঘরিয়া। এতক্ষণে তবু এসে যাহোক্ পৌঁছানো গেল। সারা পথের চিন্তা সহসা কোথায় যেন খণ্ডছিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, টের পেলো না শুভেন্দু। এবারে ফুটবোর্ডে পা বাড়িয়ে প্লাটফর্মে নেমে পিছনের সরু রাস্তা দিয়ে সোজা হন্‌হন্ করে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলো সে।

আট মাসের টুটুলকে নিয়ে বীণা এতক্ষণ কখনও বা জানলায় মুখ

বাড়িয়ে পথের দিকে লক্ষ্য করছিল, কখনও বা ঘর আর বার করে নিজের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সকাল থেকে টুটুলের যেন আজ কী হয়েছে, কেবলই ঘ্যান-ঘ্যান করছে, গাটাও একটু হয়তো গরম হয়ে থাকবে, কিছুতেই কোল ছেড়ে থাকতে চাচ্ছে না। তাকে নিয়েই হিম্‌সিম্ খাচ্ছিল বীণা, তার ওপর এত বেলা অবধি শুভেন্দু ফিরে না আসায় আরও বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কলকাতার পথে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি আর লরির যা অবস্থা, তাতে এ্যাক্সিডেন্ট তো একরকম লেগেই আছে। এত বেলা অবধি যদি ঘরের মানুষ ঘরে না ফেরে, তবে কার না দুশ্চিন্তা হয়। সেই দুশ্চিন্তায় এতক্ষণ মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল বীণার।

এবারে শুভেন্দুকে কাছে পেয়ে ফেটে পড়লো সে ; বললো, 'আর ফিরলে কেন, একেবারে কালকের বীট শেষ করেই তবে আসতে পারতে ! সংসারটা যেন একা আমার, মরি বাঁচি, পারি না-পারি, আমাকে সেই ভোর রাত থেকে সবদিক আগলাতে হবে ! কেন, আমিই বা এত ঠেকেছি কিসে ! আর এই শয়তানটাও হয়েছে তেমনি, একটু কিছু হলো তো অমনি গা তেতে উঠলো ! গেলেই পারিস বাপের সঙ্গে বেরিয়ে, দু'দণ্ড আমি তবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।' বলে শক্তহাতে ছেলের গাল টিপে দিয়ে কোল থেকে নামিয়ে দিল বীণা।

ব্যথা পেয়ে টুটুল এবারে কান্নায় ফেটে পড়লো।

হাতের ফাঁকা বোর্ড-ফাইলটাকে কোনোভাবে একপাশে নামিয়ে রেখে টুটুলকে এবারে নিজের কোলে টেনে নিয়ে শুভেন্দু বললো, 'সে কি, টুটুলের যে সারা গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ? তার ওপর এমনি করে ওকে মারলে তুমি ?'

দু'চোখ ফেটে ততক্ষণে বীণারও জল এসে গিয়েছিল। সেটুকু সম্বরণ করে নিয়ে সে বললো : 'এত যদি ছেলের ওপর মমতা, তবে কাজে না বেরিয়ে রাখলেই পারতে ছেলেকে ! আমার শরীরটা তো

রক্তেমাংসে গড়া নয়, লোহায় তৈরি, আছিই তো ঘরের বাঁদী, আর ভাবনা কি,—ধান ভানো, চাল কোটো, মসলা পেশো, বাসন মাজো, রাঁধো, কাপড় কাচো, ঘর-উঠোন ঝাড়ো, ছেলে আগলাও। আমি কি মানুষ, আমার দিকে চাইবে কেন কেউ এ সংসারে?'

কথা শেষ করতে গিয়ে এবারে বোধ করি অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হলো বীণার পক্ষে, তাড়াতাড়ি তাই শোবার ঘরের মেঝে ছেড়ে ছুটে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

শুভেন্দুও অপেক্ষা করল না, টুটুলকে শান্ত করতে করতে রান্নাঘরের দরজার চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'ঘরে তো নির্মলাও আছে, তোমার মাছের হেঁশেলে সে না ঢুকুক, কিন্তু টুটুলকেও কি সে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারে নি?'

আড়ালে চোখ মুছে আর্দ্রকণ্ঠে বীণা বললো: ঠাকুরঝি ঘরে থাকলে তো!'

'মানে?' মাথাটা এতক্ষণে বোধকরি গরম হয়ে উঠলো শুভেন্দুর, জিজ্ঞেস করলো: 'নির্মলা কি পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে নাকি?'

'তার বেড়াবার জায়গারই বা অভাব কি, আর নেমন্তন্ন পাবার জায়গারই অভাব কি!' থেমে বীণা বললো, 'রাখাল এসে তাদের বাড়িতে তার মায়ের সঙ্গে এবেলা খাবার কথা বলে ঠাকুরঝিকে সেই সকাল আটটার আগেই নিয়ে গেছে। রাখালেরও তো শুনেছি বিধবা মা, তোমার বোনের এবেলাটা তাই সুবিধেই হলো, হেঁশেল আগলাতে হলো না।'

কিছুকাল ধরে এই রাখাল ছেলেটি শুভেন্দুর বাড়িতে আসতে যেতে শুরু করেছে। কি কারণে নির্মলা একদিন পথে তার সাহায্য নিয়েছিল, সেই সূত্র ধরে নির্মলা যখনই এখানে ওখানে একটু হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছে, অমনি কোথা থেকে এসে তার সঙ্গে খাতির করে নিয়েছে ছেলেটি। তাদেরও দেশ নাকি পুব বাংলায় পদ্মার

পাড়ে। এখানে যখন সবাই একই দুঃখের দুঃখী, তখন নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা রক্ষা করে চলাটাই তো উচিত! এসে মাঝে মাঝে বীণাকে বলেছে নির্মলা: 'জানো বৌদি, ছেলেটা বড় ভালো। আমাদের মতোই এখানে রিফিউজি; বলে কি জানো? বলে—আমরা যদি এখানে একে অন্যকে না দেখবো, তবে কে দেখবে আমাদের! সংসারে শুনেছি—রাখালের এক বিধবা মা ভিন্ন আর কেউ নেই। ভাবছি, গিয়ে একদিন আলাপ করে আমাদের এখানে আসতে বলবো।'—কিন্তু তার আগেই রাখাল এলো, এবং যখন-তখন আসতে শুরু করলো। এমনি করে যখন কিছুকাল কাটলো, তখন বীণা নিজেই একদিন ঠাট্টা করে বলেছে: 'তোমাদের রাখাল নিশ্চয়ই কোথাও কিছু কাজ করে ঠাকুরঝি, তাই না?' উত্তরে নির্মলা বলেছে: 'তা কে জানে! করে কিছু একটা নিশ্চয়ই, নইলে সংসার চালায় কি করে!' মুখ টিপে হেসে বীণা বলেছে: 'ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো, বেশ আলাপী; বয়স দেখে মনে হয়—বছর ত্রিশেকের কাছাকাছি হবে, তা—বিয়ে-থা করবে না?' নির্মলা বলেছে: 'তা কে জানে, জিজ্ঞেস করলেই পারো!' বলে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছে নির্মলা।

সেই রাখাল। শুভেন্দু নিজেও দিন কয়েক কথা বলে দেখেছে তার সঙ্গে। ভেবেছে—অল্প বয়সে বিধবা হয়ে অবধি নির্মলার মনে তো শান্তি নেই, ছেলে হোক্ মেয়ে হোক্—যদি কারুর সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলতে পেরে শান্তি পায় নির্মলা তা পাক। তাতে বাধা দিতে চায় না সে। কিন্তু এই বা কেমন, ঘরে বীণা একা যেখানে টুটুলকে নিয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে উঠছে, সেখানে নির্মলা ঘরের দিকে না তাকিয়ে পাড়ার লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াবে, এতে তো নির্মলার লজ্জা হওয়া উচিত। বীণার কথায় শুভেন্দু তাই বললো, 'রাখাল এসে নিতে চাইলেই নির্মলা অমনি যাবে? তুমি তাকে যেতে দিলে কেন?'

এবারে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে শুভেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বীণা বললো : 'না যেতে দিয়ে ঠাকুরঝির কাছে আমি ছোট হতে পারবো না বলে!'

'না যেতে দিলেই তুমি ছোট হতে?'

কিন্তু একথার কিছু একটাও জবাব না দিয়ে টুটুলকে আবার নিজের কোলে টেনে নিয়ে বীণা বললো, 'যাও, অনেক হয়েছে, এবারে চান করে এস।'

খিদেয় যেখানে নিজের পেট জ্বলছে, সেখানে বীণার খিদের কথাটা তার না বোঝবার মতো ছিল না, তাই আর কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে অল্প সময়ের মধ্যেই স্নানের জন্যে তৈরী হয়ে নিল শুভেন্দু।

নির্মলা যখন বাড়ি ফিরলো, তখন খেয়ে-দেয়ে উঠে বিছানায় একটু কাত হয়ে নেবার সময় শুভেন্দুর কিন্তু আজ আর তা হলো না। নির্মলাকে চোখে পড়তেই হঠাৎ মুখের রাগ মাথায় গিয়ে উঠলো শুভেন্দুর। সে জানতো—নির্মলা এসময়ে তার কাছ দিয়েও ঘেঁষবে না, নিজে থেকেই তাই সে নির্মলাকে কাছে ডাকলো। বললো, 'শুনলাম সেই সকাল আটটায় ঘর থেকে বেরিয়েছিস, আর ফিরলি এই এত বেলা করে। বাংলাদেশের হাজার হাজার মেয়ের মতো তুইও যে মেয়ে, একথা হয়তো তুই ভুলে গেছিস। এ সংসারে তোর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবার মতো কেউ নেই, শেষ পর্যন্ত কি এই ধারণাই তোর হয়েছে?'

কিছু না বলে নির্মলা শুধু একবার চোখ দুটো তুলে ধরে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। সে দৃষ্টিতে কি ছিল, সে-ই জানে।

থেমে শুভেন্দু বললো : 'বাড়িতে টুটুলকে নিয়ে তোর বৌদি একা সব দিক সামলে উঠতে পারে না, তার ওপর সেই সকাল থেকে

টুটুলের সারা গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ; একবারও কি সেদিকে তাকিয়ে দেখেছিস ? কবে পথে একদিন কার সঙ্গে কি সূত্রে খাতির হলো, আর অমনি তার নেমন্তন্নটাই তোর কাছে বড় হলো ? একবার তো কপাল পুড়িয়েছিস, আবার পোড়াতে পারিস কিনা দেখ !'

কিন্তু এবারও এত বড় কঠিন কথাটার কিছু একটাও জবাব দিল না নির্মলা, শুধু আর একবার দাদার মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীরবে নিজের ঘরে চলে গেল। সে দৃষ্টিতে হয়তো অনেক কথাই ছিল, কিন্তু তা বোঝবার মতো মন ছিল না শুভেন্দুর।

বীণা তখন টুটুলকে কোলে নিয়ে কোথায় যেন আত্মগোপন করেছে, অনেকক্ষণের মধ্যেও কাছে কিনারে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না।

কাত হয়ে একটুকাল চোখ বুজে শ্রান্তি দূর করবার জন্যে দেহটাকে এবারে বিছানায় এলিয়ে দিল শুভেন্দু। সংসারের দিকে তাকাতে গিয়ে বীণার জন্যে যেমন তার দুঃখ হলো, তেমনি নির্মলার কথাটা ভাবতে গিয়ে যুগপৎ মমতায় ও ব্যথায় সারা মন তার আচ্ছন্ন হয়ে গেল। হঠাৎ মুখ দিয়ে তার বড়-একটা কড়া কথা বেরিয়ে গেছে, এত বড় কথা এর আগে কোনোদিন সে বলেনি নির্মলাকে। অথচ তার কোনো প্রতিবাদ নেই মেয়েটার মুখে। প্রতিবাদ করলে হয়তো আরও তীব্র মন্তব্যে ফেটে পড়তো শুভেন্দু, কিন্তু তার সুযোগ দেয়নি নির্মলা। বাংলাদেশের মেয়ে তো, মাথা উঁচু করে কোনো দিন প্রতিবাদ করতে শিখলো না, মুখ বুজে শুধু সব কিছু সহ্য করে গেল। ভাবতে গিয়ে আবার সেই অতীতের তীরে গিয়ে মনটা তার স্থির হয়ে দাঁড়ালো, মনে পড়লো মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তার আর নির্মলার দুঃখের দিনগুলিকে।—

কার্তিকপুরে মা সেই শেষনিশ্বাস ফেললেন। বাবা যা সামান্য পারলেন, তাই দিয়েই মায়ের পারলৌকিক কাজ করলেন। যে অশ্রুতে শুভেন্দু আর নির্মলার দু'চোখ ভেসে গিয়েছিল, সেই অশ্রুও

একসময় শুকালো। ম্যাট্রিক পাস করে তার সামনে তখন কঠিন সমস্যা। এরপর সে কি করবে? বাবার মতো ঘরামীদের পিছনে লেগে থাকবে—না কলেজে পড়ে একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবে সে? এতকাল মামুদপুর আর কার্তিকপুরের স্কুলের যে কোনো সাংস্কৃতিক কাজে আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে, স্কুল-ম্যাগাজিনে রচনা লিখে মাস্টারদের প্রশংসা পেয়েছে। সেই থেকে সাহিত্যের প্রতি আপনা থেকেই তার কেমন একটা স্বাভাবিক প্রবণতা জেগে উঠেছে। তাকে কই কিছুতেই তো মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না! ম্যাট্রিক পাস করেই যদি তার লেখাপড়া শেষ হয়ে যায়, তবে তার এত সাধের সাহিত্যটাও যে ডুবে যাবে! একদিন তাই উদ্যোগী হয়ে বাবাকে গিয়ে সে বললো: আমি কতকাল আর এভাবে বসে থাকবো? টাকা দাও, আমি শহরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হই।

নবীন মণ্ডল বললেন, 'তুই চলে গেলে আমাকে এখানে দেখবে কে? নির্মলাকেই বা দিনরাত চোখে চোখে রাখবে কে? ঘরামী খাটিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়, ঘরে বসে থাকলে আমিই বা দু'পয়সা কি করে ঘরে আনবো?'

কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু তার চাইতেও বড় সত্য জীবনে শুভেন্দুর নিজের প্রতিষ্ঠা। একটা কর্মঠ বিপ্লবী যৌবন ঘরে বসে শুকিয়ে মরবে, নিজের চোখে নিজের এত বড় মৃত্যু দেখতে রাজী নয় সে। একটুকাল থেমে সে বললো: 'নির্মলাকেও লেখাপড়া শিখতে হবে বৈ কি! তুমি বরং বাইরে বিশেষ না বেরিয়ে কিছুকাল ঘর আগলাও, বাইরের কাজ ঘরামীরাই দেখে-শুনে করতে পারবে। তাতে অন্তত আমার আর নির্মলার পড়াটা হবে। তারপর পাস করে বেরিয়ে আমি কিছু একটা-না-কিছু-একটা করতে পারবোই; তুমি তখন অনেকখানি মুক্ত হতে পারবে।'

এরপর নবীন মণ্ডল আর বড় একটা আপত্তি করেন নি, শুভেন্দুকে শহরে পাঠিয়ে দিলেন কলেজে ভর্তি হতে। হোস্টেলে

থেকে গোটা পনের টাকার একটা প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় করে নিয়ে কলেজ করতে শুরু করলো শুভেন্দু। মাঝে মাঝে নির্মলা তার একাকিত্বের জন্যে ত্বঃখ করে চিঠি লিখতো: 'দাদা, তুমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলে এসো, একা একা এখানে আমার একটুও ভালো লাগে না। বাড়িতে আমি পড়ি বটে, পাশের বাড়ির লোকেরা বলে: ওমা, এতবড় ধিঙ্গী মেয়ে নাকি মাত্র ফাইভ-সিক্সের বই পড়ে! ভাবি—আমিও তো কম বড় হলাম না, তোমার থেকে মাত্র দেড় বছরের ছোট; তোমার যদি সতেরো, তবে আমারই বা সাড়ে পনেরো না হবে কেন! কেউ তেমন করে পড়ালে আমিও এতদিনে প্রায় ম্যাট্রিকের দরজায় পৌঁছে যেতে পারতাম। কিন্তু বাবার তেমন চাড় নেই। তুমি বাবাকে একটু ভালো করে লিখো।'—এমনি আরও কত কথা। কিন্তু বাবাকে লিখেও কাজ হয় নি। মেয়ের লেখাপড়ার ওপর বাবা তেমন একটা গুরুত্বই দেন নি। বলেছেন: 'লাভ কি বেশী পড়িয়ে! ত্বদিন বাদে বিয়ে দিলে শ্বশুরের ঘরে গিয়ে তো হাঁড়ি ঠেল্‌বে! যা পড়েছে, এই ওর পক্ষে যথেষ্ট।' অথচ বাবাকে শুভেন্দু কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে নি যে, এটুকু শিক্ষায় কোনো মেয়েরই কিছু হয় না। নির্মলাকে চিঠি লিখতে বসে চিঠির তর্জমাতেই তাই তার বেলা কেটে যেতো; কি লিখলে নিজের একাকিত্বের মধ্যে নির্মলা কিছুটাও অন্তত উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে, ভেবে পেতো না শুভেন্দু।

এমনি করেই কলেজে তার একটা বছর কেটে গেল। এই একটা বছরে সে কলেজের স্টুডেন্ট্‌স্ ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছে, কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটোরিয়াল বোর্ডে স্থান পেয়েছে, ছাত্রদের মুখে মুখে শুভেন্দু মণ্ডল নামটা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে নি। স্কুল আর কলেজের মধ্যে কতখানি পার্থক্য, ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে সে পুলকিত হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হয় নি শহর ছেড়ে খুব শিগগির আর কার্তিকপুরে ফিরে যেতে। কিন্তু যেতে

হলো। হঠাৎ বাবার চিঠি এলো—নির্মলার জন্যে তিনি পাত্র ঠিক করেছেন, নির্মলার যা বয়স, তাতে বিয়ে না দিয়ে তাকে আর ঘরে রাখা যায় না, এরপর লোকের মুখে নিন্দে শুনতে হবে। তাই দেখেশুনে নির্মলার জন্যে পাত্র ঠিক করে বিয়ের দিনও তিনি পাকা করে ফেলেছেন, সামনের তেরই শ্রাবণ। ছেলের নাম মধুসূদন, নিজেদের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করে, ঘরে খাবারের অভাব নেই; মধুসূদনের সঙ্গে নির্মলার মানাবেও ভালো, থাকবেও সুখে।—একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শুভেন্দু ভাবলো—যাক্, এতদিনে নির্মলার তবে একাকিত্ব ঘুচলো; পাড়া-প্রতিবেশীরাও আর এমন কথা বলতে পারবে না যে, এতবড় ধিঙ্গী মেয়ে মাত্র ফাইভ-সিক্সের বই পড়ে। এবার থেকে তার যে পাঠ শুরু, সে পাঠের পাঠশালায় সব দেশের সকল বর্ষীয়সী মেয়েদের একই আসন। সেখানে আর সামনের বেঞ্চ বা পিছনের বেঞ্চ নেই, সেখানে সবাই তারা জায়া আর জননী। রওনা হবার আগে নির্মলাকে এবার তাই সে নিজে থেকেই চিঠি দিয়ে উৎসাহিত করে লিখলো: 'ঘরে আমাদের মা নেই, স্বামীর ঘরে গিয়ে তুই আবার মা পাবি; তোর যে সুখের দিন রে নির্মলা'!—এ চিঠির জবাবটা মনে মনে তৈরী করে রেখেছিল নির্মলা, কাছে পেয়ে তাই সে দু'হাতে দাদার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমাদের মা নেই, এরপর ঘরে বৌদি এসে সেই শূন্য জায়গা পূর্ণ করে দেবে। সবুর করো না, এরপর তোমার সুখেই বা ভাগ বসাবে কে।'

কিন্তু ঘরে বৌদি এলো না, এলো নতুন মা। নির্মলা শ্বশুরের ঘরে যাবার পর মাস কয়েকও কাটলো না। শুভেন্দু তখন শহরে। বাবা চিঠি দিয়ে জানালেন: 'এখানে তুই নেই, নির্মলা নেই, বুড়ো বয়সে আমাকে এখন দেখবে কে? তাই ঘরে তোদের নতুন মাকে আনলাম। এরপর তোরা এসে তোদের নতুন মার কাছেই দাঁড়াতে পারবি।

নির্মলার বিয়ের চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছিল শুভেন্দু, কিন্তু এবারের চিঠি পেয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত তার মাথায় গিয়ে উঠলো। বাবা বুড়ো হয়েছেন বলে কী ভীমরতিতে পেয়েছে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মানুষের রুচি বলে একটা পদার্থ আছে, বাবার কি তাও নেই? মা এ সংসার থেকে বেশী দিন বিদায় নেন নি, তাঁর স্মৃতি কি এত শিগ্‌গিরই বাবা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন? নির্মলার বিয়ে দিয়ে যাদের সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা পাতালেন, তাদের কাছেই বা এর পর মুখ দেখাবেন কি করে বাবা? ইচ্ছে করলো রাগে দুঃখে ঘৃণায় নিজের গা নিজে বসে কামড়াতে। সৎমা নাকি কোনোকালে আবার আপন হয়! তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু নিজেই বা কোন্ মুখে মা বলে ডাকবে? সে কি নতুন মা, না বাবার বিয়ে-করা নতুন বউ? শহরে থেকে কলেজে পড়ে বাবার এতবড় অন্যায়কে কোনোক্রমেই সে বরদাস্ত করতে পারলো না। লিখে জানালো: 'তোমাকে দেখাশুনা করবার মতো লোক সংসারে এলেই হলো, আমাদের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। নির্মলার যখন একটা আশ্রয় হয়েছে, তখন আর কি! আমার পক্ষে কার্তিকপুরে গিয়ে কাটানো বোধহয় হয়ে উঠবে না; লেখাপড়া শিখে জীবনে যদি ভালো কিছু করতে পারি, দেখি!'

এ চিঠি পড়ে নবীন মণ্ডল কি মনে করেছিলেন, প্রকাশ পায় নি। কিন্তু নির্মলা চুপ করে ছিল না, শুভেন্দুর যে কথাটা মনে আসে নি, নির্মলা সে কথাটা উস্কে দিয়ে লিখলো: 'বাবা বোধ করি এতদিন তবে আমার বিয়ের জন্যেই অনেক ধৈর্যে অপেক্ষা করেছিলেন। ভাবলেও হাসি পায় যে, আমার জন্যে পাত্র খুঁজতে বেরিয়ে ভিতরে ভিতরে বাবা তাঁর নিজের জন্যেই পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন; এতদিনে বাবা আশ্বস্ত হয়েছেন।'

সত্যিই হয়তো আশ্বস্ত হলেন নবীন মণ্ডল। এই নিয়ে কেউ কানাকানিও করলো না, কোথাও মুখ-হাসাহাসিও হলো না। তরুণী

ভার্যাকে নিয়ে প্রায়-বৃদ্ধ নবীন মণ্ডল নতুন সংসার শুরু করলেন। হিন্দু সমাজের একটি দুঃস্থ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নবীন মণ্ডলের মতো যোগ্য পাত্র পেয়ে বর্তে গেলেন। হিন্দু সমাজের জয়জয়কার পড়ে গেল।

কিন্তু হিন্দুসমাজের এতবড় জয়কে শহরে থেকে স্বীকার করে নিতে সংস্কারে বাধলো শুভেন্দুর। কলেজ ম্যাগাজিনে হঠাৎ সে একটা প্রবন্ধ লিখে বসলো, বিষয়—হিন্দুসমাজ ও বিবাহ। নতুন করে তখনও হিন্দুবিবাহ আইন পাস হয় নি। হিন্দুসমাজ সম্পর্কে এমন কিছু একটা স্পষ্ট ধারণা থাকবারও কথা নয় শুভেন্দুর, তবু দুঃসাহসই বলতে হবে। সেই দুঃসাহস যে একেবারেই নিন্দিত হলো শুভেন্দুর, এমন নয়, তার বক্তব্যের গরম গরম কথাগুলো নিয়ে একদল ছেলে কমন-রুম কাঁপিয়ে তুললো,—কেউ বললো—শুভেন্দু শুধু গল্প লিখিয়েই নয়, শক্তিমান প্রাবন্ধিকও ; পরবর্তী সংখ্যা থেকে ম্যাগাজিনের সম্পাদনার ভার সম্পূর্ণ শুভেন্দুর ওপরই ছেড়ে দেওয়া হোক। হাত উঁচিয়ে বাকী ছেলেরা বললো ঃ 'হোক।' কিন্তু যে-উদ্দেশ্য নিয়ে শুভেন্দু এ প্রবন্ধ লিখলো, তার মূল সূত্রটা সকলের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেল।

কিছুদিন পর নবীন মণ্ডল যখন তাকে বাড়ি ফিরতে লিখলেন, তখন সে সে-চিঠির ইচ্ছে করেই জবাব দিল না। সামনে তার ফাইনাল, বইয়ের মধ্যে মুখ ঠেসে তাই সে বসে রইল।

কিন্তু হায়রে পোড়া অদৃষ্ট, তার ফাইনালও শেষ হলো, আর শাঁখা-সিঁদুর খুইয়ে নির্মলা আবার ফিরে এলো কার্তিকপুরে। ভালো বর দেখে যার হাতে নির্মলাকে বাবা সম্প্রদান করেছিলেন, দেখতে-শুনতে ভালো হলেও স্বাস্থ্য বলে তার কিছু ছিল না, সেটা দেখতে যান নি বাবা। ফলে বিয়ের পুরো একটা বছর না পুরোতেই কপাল ভাঙলো নির্মলার। তাকে যে কী সান্ত্বনা দেবে, বুঝে উঠতে পারলো না শুভেন্দু। নির্মলার জন্যেই শুভেন্দুকে কার্তিকপুরে

ফিরতে হলো। বাবা বললেন, 'শ্বশুরের ঘরে থাকবার মতো যখন ওর আর কোনো আকর্ষণই রইল না, তখন এখানেই থাকুক নির্মলা; তোদের নতুন মারও খানিকটা উপকার হবে, নির্মলারও একাকিত্ব ঘুচবে। তারপর কোনো ছেলে যদি কখনও বিধবা-বিবাহে এগিয়ে আসে, চেষ্টা করবো নির্মলাকে আবার পাত্রস্থ করতে। এই বয়সে বিধবা হয়ে সত্যিই তো ও আর একা একা জীবন কাটাতে পারবে না!'

হয়তো নতুন করে নির্মলার লেখাপড়া নিয়ে কিছু বক্তব্য ছিল শুভেন্দুর, কিন্তু সেটুকু সে নিজের মধ্যে চেপে গেল।

নির্মলা বললো: 'পরীক্ষা হয়ে গেল, রেজাল্ট বেরোতে এখনও তো অনেক দেরি। ততদিন আমাকে ফেলে তুমি কোথাও যেতে পারবে না দাদা; তবে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো।'

শুভেন্দু বললো, 'তোকে আগলে আমি যদি ঘরে বসে থাকবো তবে কলেজের পড়া শেষ করবো কি করে? আজকাল বি-এ পাস না করলে কোথাও কিছু করে খাওয়া যায় না। এদিকে দুর্ভিক্ষ গেল, যুদ্ধ গেল, দাঙ্গা গেল, যেমন শুনছি দেশ হয়তো এবারে আর পরাধীন থাকবে না,—তার জন্যে হয়তো হিন্দু-মুসলমানে দুটো ভাগ হয়ে যেতে পারে। আমাদের কি অবস্থা হবে, কে জানে! এ সময়ে যদি নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারি, তবে যে জীবনের সব স্বপ্নই ব্যর্থ হয়ে যাবে!'

এত ঘটনার কিছু একটাও নির্মলার মাথায় ঢুকলো না, সে শুধু তার কাতর চোখ দুটো মেলে ধরে বললো, 'তুমি দেখে নিও, তোমার স্বপ্ন ব্যর্থ হবে না।'

কিন্তু তাতেও সাড়া দিতে পারলো না শুভেন্দু। রেজাল্ট বেরোলে দেখা গেল—সে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করেছে। অতএব সময় থাকতে আবার শহরে গিয়ে কলেজে না ভর্তি হলে সিট পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে টিউশনির আকর্ষণটা তার কাছে বড়।

সেই সঙ্গে আরও দু'একটা টিউশনি হাতে পেয়ে বাবার কাছে তাকে আর যখন-তখন হাত পাততে হবে না। যতটা পারলে নির্মলাকে প্রবোধ দিয়ে তাই সে আবার শহরে রওনা হলো। কিন্তু কাজ হলো না। কিছুদিনের মধ্যেই দেশ ভাগ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হলো। কার্তিকপুর পূর্ব-পাকিস্থানের এলাকা। হিন্দুরা তখন যে যেখানে পারে ভয়ে ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে শুরু করেছে। কার্তিকপুরে যেখানে একশো ঘর হিন্দু ছিল, দেখতে দেখতে সেখানে বিশ ঘরে এসে ঠেকলো। নবীন মণ্ডলের বেশীর ভাগ ঘরামীই ছিল হিন্দু, তারাও আর রইল না; দু'একজন মুসলমান ঘরামী যারা ছিল, তারা মুসলমান মহাজনের সঙ্গে গিয়ে ভিড়লো। এদিকে ঘরে তরুণী বউ আর সোমত্ত বিধবা কন্যা। কোনো দিকে কিছু একটাও আর ভেবে না পেয়ে শহরে চিঠি দিলেন তিনি ছেলেকে। শুভেন্দু এবারে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। ফিরে এলো কার্তিকপুরে। কিন্তু এ আসাই যে তার শেষ আসা হবে, কে জানতো! এসে দেখলো—নিষ্ক্রিয় জীবনে বাবা শয্যা নিয়েছেন। দুর্দিনের অভিঘাত তিনি সহ্য করতে পারেন নি। নতুন বিয়ে করে প্রাক্-বার্ধক্যে তিনি যে সুখের নীড় রচনা করেছিলেন, দুষ্ট দেবতা সেই নীড়ে ফাটল ধরিয়ে দিলেন। রোজগার নেই তো খাবেন কি তিনি? তা ছাড়া চারিদিকে যে রকম অবস্থা চলছে—তাতে নতুন বউ আর বিধবা নির্মলাকেই বা শেষ পর্যন্ত গুণ্ডা-ডাকাতের হাত থেকে কি করে রক্ষা করবেন তিনি? ভাবতে ভাবতে দেহের সমস্ত গ্রন্থিগুলো তাঁর শিথিল হয়ে গেল। শয্যা নিলেন তিনি। শুভেন্দুকে কাছে পেয়ে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলে বললেন, 'আমার আর কিছু করবার নেই—তুই যা পারিস কর, আমার দিন শেষ হয়ে গেছে।'

উত্তরে কিছু একটা বলে যে বাবাকে সান্ত্বনা দেবে, এমন ভাষা খুঁজে পেলো না শুভেন্দু। দিন শুধু বাবারই শেষ হয় নি, হয়তো সেই সঙ্গে তার নিজেরও শেষ হলো। বজ্রমুষ্টি ঊর্ধ্বে তুলে ঈশ্বরের

বিরুদ্ধে একবার সে প্রতিবাদ জানিয়ে বললো : 'তোমার নির্মমতার আর কত পরিচয় দেবে তুমি ?'

কিন্তু দিলেন, আর একবার সেই নির্মমতার পরিচয় দিলেন পৃথিবীর ঈশ্বর। নবীন মণ্ডলের শুধু দিনই শেষ হয়ে গেল না, সেই সঙ্গে নশ্বর দেহটাও শেষ হয়ে গেল। এতটুকুও চোখের জল পড়লো না শুভেন্দুর। যেটুকু পারলো, কর্তব্যকাজ শেষ করলো। এবারে নতুন মার দিকে তাকাবার পালা। কিন্তু নতুন মা-ই বা কার ভরসায় এখানে পড়ে থাকবেন ? শুভেন্দু আর নির্মলা তাঁর কে, তাঁর কতটুকু ? নিজে থেকেই একদিন তিনি বাপের বাড়ির লোককে খবর দিয়ে আনিয়ে তার সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন, বললেন, 'তোমরা যা পারো ব্যবস্থা করে নিও, আমার পক্ষে হয়তো আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না।' হবে না বলেই তিনি গেলেন,—হলে তিনি এভাবে যেতেন না। এবারে বাকী রইল নির্মলা। একসঙ্গে সুখে দুঃখে ছোটবেলা থেকে যার সঙ্গে খেলে বেড়িয়ে আজ এই বয়সে এসে পৌঁছেছে শুভেন্দু, পৃথিবীতে সবচেয়ে আপন তার সহোদরা এই নির্মলা। এ পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে চলে যাবার মতো মায়ের জায়গা হয়েছে, বাবার জায়গা হয়েছে, এমন নতুন মায়েরও জায়গার অভাব ঘটে নি, কিন্তু জায়গা নেই শুধু নির্মলার। তার জায়গা তার দাদা, তার বেকার দাদা। অথচ তার আজকের এই ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্যে শুভেন্দু দায়ী নয়। বাবা তাঁর আপন খেয়ালে মেয়েটাকে সংসারে এমন করে বলি করে রেখে গেলেন।

নির্মলা জিজ্ঞেস করলো : 'এখন আমাদের কি উপায় হবে দাদা ?'

শুভেন্দু বললো : 'উপায়ের মধ্যে আমার পড়া বন্ধ এবং এখান থেকে কোনো হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নেওয়া।'

'তারপর ?'

'তারপর যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে।'

তাই হলো। শুধু পড়াই বন্ধ হলো না শুভেন্দুর, সেই সঙ্গে তার যা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উদ্যম, সব তাতে ভাঁটা পড়লো। পয়সারও এমন কিছু সংস্থান নেই—যাতে বোনকে নিয়ে কোথাও সে নির্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। বাবার গচ্ছিত অর্থের সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল—বাজারের গণেশ মুদির কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাওনা আছে। অতএব গণেশ মুদিই ভরসা।—ভাগ্য ভালো যে লোকটা ঠকালো না। একবার চাইতেই থলে ঝেড়ে টাকাটা দিয়ে দিল। তার সঙ্গে ঘরের সামান্য তৈজসপত্র বিক্রির কিছু অর্থ যোগ করে নির্মলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে পথে। কিন্তু পথে বেরিয়েই বা যায় কোথায়? দেখলো—বেশীর ভাগ হিন্দুরই লক্ষ্যস্থল কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের এখানে-ওখানে। তা ভিন্ন ইজ্জত নিয়ে বাঁচবার জায়গা কোথায়? সেই জায়গার উদ্দেশেই একসময় নৌকো পাড়ি দিয়ে ট্রেন ধরলো সে। তারপর সোজা এসে নেমে পড়লো বেলঘরিয়ায়। একা থাকলে তার দুঃখ ছিল না, কিন্তু মুশকিল হলো নির্মলাকে নিয়ে। হাজার হোক সে মেয়েছেলে। যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাবে তাকে নিয়ে ওঠা যায় না। তাতে মানের ভয় আছে, প্রাণের ভয় আছে। মনে মনে সেই ভয় নিয়েই একসময় এক বস্তিঘরে এসে উঠলো সে। তাকিয়ে দেখলো—এখানে আশেপাশে যারা আছে—তারা সকলেই তার মতো পূর্ব-বাংলার মায়া কাটিয়ে ছুটে এসে এখানে মাথা গুঁজেছে। অথচ কেউ যে মিলে-মিশে আছে, এমন নয়; জল নিয়ে, জায়গা নিয়ে, রোদ নিয়ে, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি আর বাক্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই।

সেদিকে তাকিয়ে নির্মলা একসময় বললো, শেষ পর্যন্ত এ তুমি কোথায় এসে উঠলে দাদা, এ যে নরক!'

বুকের মধ্যে একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিয়ে শুভেন্দু

বললো : 'এই নরকদর্শনের পরেও তবু যদি যুধিষ্ঠিরের মতো স্বর্গের স্বাদ পাই, তবে হয়তো এ দুঃখ একদিন ভুলতে পারবো। আজ এই পরিবেশকে স্বীকার না করে নিয়ে আমাদের উপায় নেই নির্মলা। খাবো কি, জায়গা দেবে কে আমাদের ?'

উত্তরে নির্মলার মুখে আর কোনো কথা আসে নি।

সেই বস্তিঘরে থেকেই শুরু হলো শুভেন্দুর জীবন-সংগ্রাম। কোথায় নিজেদের শহরে বি-এ ক্লাসের ছাত্র হয়ে মনে মনে সৌধ নির্মাণ করছিল সে, সেই সৌধ এতদিনে বস্তিতে পরিণত হয়ে আজ তাকে কোথায় টেনে আনলো! কিন্তু তা নিয়ে তখন ভাববার সময় নেই। সকালে সে কলকাতার পথে বেরিয়ে পড়ে, আর ফেরে সেই সন্ধ্যায়। সারাদিন নির্মলার যে কী করে কাটে, তা নির্মলা ভিন্ন বোঝবার উপায় ছিল না কারুর। ততক্ষণে এখানে ওখানে নানা জায়গায়, নানা দরজায়, নানা লোকের কাছে চাকরি-চাকরি করে ঘুরে মরছে শুভেন্দু। দেশ ভাগ হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—তার পরিচয় লেখা আছে শুভেন্দুর মতো হাজার হাজার জীবনে। কিন্তু তা নিয়ে থেমে থাকবার সময় নেই। তার একটা পেট হলে কোনোভাবে চলে যেতো, কিন্তু নির্মলার চলবে কি করে? তার জন্যে যে নিরাপদ আশ্রয় চাই, খাদ্য চাই, কাপড় চাই। মামুদপুরের মণ্ডলদের অধঃস্তন পুরুষদের একটি জীবনে কোনোদিন এ ইতিহাস লেখা পড়বে, এ কি মণ্ডলদের কেউ কোনোকালে ভেবেছে! অতি দুঃখেও একবার হাসি পেলো শুভেন্দুর। তারপর আপন মনেই একবার উচ্চারণ করলো—

'মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাদের সবার সমান।'

তারপর সোজা আবার বেরিয়ে পড়লো পথে।...

একসময় নির্মলা বললো : 'এখানে অনেক মেয়েই তো অনেক কিছু করে খায়! সেদিন এদিককারই একটি মেয়ে বলেছিল—সে নাকি নিজের হাতে ধূপকাটি তৈরী করে মাসে মন্দ রোজগার করে না। আমিও তো সারাদিন চুপচাপ বসে না থেকে অমনি কিছু করতে পারি দাদা!'

শুভেন্দু বললো : 'দেখি, আর যদি কিছুদিনের মধ্যে কিছু না হয়, তবে তোকেও তাই করতে হবে। তুই ঘুঁটে দিবি, আর আমি ঠোঙা বানিয়ে বেচবো।'

বলতে গিয়ে অলক্ষ্যে চোখ ফেটে জল এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের মধ্যে সেটুকু সম্বরণ করে নিয়েছে শুভেন্দু।

এমনি করে আরও কিছুদিন কেটে যাবার পর একদিন নির্মলা বললো : 'এখানে আর বাস করা যায় না দাদা। এখানকার লোকগুলো বড় কুৎসিত, বড্ড যা তা বলে। জিজ্ঞেস করে—সারাদিন তোকে একা রেখে তোর কত্তা রোজ কোথায় বেরিয়ে যায়?'

শুনে মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো শুভেন্দুর, অনেকক্ষণ পাষাণের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললো : 'বাবা তোকে থান পরতে দেন নি, তোকে বুঝতে লোকের তাই ভুল হয়। এ ভুল একদিন ওদের শুধরে যাবে।'

কিন্তু এই নিয়ে নির্মলার মনে কোনো সমস্যাও ছিল না, যন্ত্রণাও ছিল না।

এমনি করে আরও কিছুকাল কেটে গেলে একটা ইণ্টারভিউ পেলো সে পোস্ট-অফিসে। এতদিন হাঁটাহাঁটি করে কত জায়গায়ই তো দরখাস্ত দিয়েছে সে, এতদিনে পোস্ট-অফিস যখন তাকে স্মরণ করেছে, তখন হয়তো ইণ্টারভিউতে না আটকালে কাজটা হতেও পারে। পৃথিবীর যে-ঈশ্বরকে এতদিন বিদ্রূপ করেছে শুভেন্দু, এবারে তাঁর উদ্দেশেই যুক্তকর স্পর্শ করে মনে মনে একবার বললো : 'তুমি

আর যা করো, আমাকে যেন পথে বসিও না। অবলম্বন না পেলে আমার আর দাঁড়াবার জায়গা নেই।'

অবলম্বন একটা সত্যিই পেয়ে গেল এবারে শুভেন্দু। ইণ্টারভিউর পর এপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্‌-লেটার পেলো সে পোস্ট-অফিস থেকে, পিয়নের চাকরি। আপাতত এই কাজেই তার পক্ষে যথেষ্ট। যেখানে হাজার হাজার লোক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে এ চাকরিটাই বা কম লোভনীয় কি!

নির্মলা বললোঃ 'দোকান থেকে আমাকে আনা তুয়েকের বাতাসা এনে দাও, হরির লুট দেবো। এতবড় খবরেও যদি কিছু না করি তো কবে করবো?'

খবরটাও যত বড়, নির্মলার ফরমাসও ততখানি। লোকে জজ-মেজিস্ট্রেট্‌ হয়ে মানুষকে ডিনার দেয়, তার ডাক-পিয়নের চাকরিতে তু'আনার হরির লুঠই যথেষ্ট। কিন্তু নিজের চোখে তা দেখবার মতো মন নেই শুভেন্দুর। নির্মলার হাতে তাই তু'আনার বাতাসা এনে তুলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কোথায় একদিকে বেরিয়ে গেল সে।—

এর পর বেশীদিন কাটলো না। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে নির্মলাকে নিয়ে সে উঠে এলো রিফিউজি কলোনীর তু'টো ছোট ছোট ঘর মিলিয়ে একটা বাড়িতে। তিনদিন একাদিক্রমে একা রাত্রিবাস করে তবে সে এই বাসার অধিকার পেলো। এতদিন যে বস্তি-ঘরে কাটিয়েছিল তারা, তার চাইতে অনেক ভালো। এখানে আশেপাশে যদিও পুব-বাংলার শরণার্থীরা ভিড় করে আছে, তবু তাদের অনেক পরিবারেই একসময়ে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। এখানে এসে তা প্রায় নষ্ট হতেই বসেছে। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় কেউই তাদের ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি কোনো স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিতে পারে নি। নির্মলা যতক্ষণ এটা-ওটা-সেটা দিয়ে ঘর গুছিয়ে তুললো, শুভেন্দু ততক্ষণে কলোনীর পাঁচজনকে ডেকে কয়েক-দিনের মধ্যেই একটা ফ্রি প্রাইমারী স্কুল গড়ে তুললো। নিজে সে

জীবনে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে লেখাপড়া শিখে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি, এ দুঃখ তার ঢেকে রাখবার জায়গা ছিল না। তাই কলোনীর ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন তার মনে হলো—এদের ভবিষ্যৎ কি, এরা তো বড় হয়ে কোনোদিন তাঁর মতো সামান্য একটা ডাক-পিয়নিও পাবে না, তখন আর চুপ করে থাকতে পারল না। কেউ কেউ বললো : 'এসব পাগলামি, দু'বেলা যাদের মুখে দু'গ্রাস ভাত তুলে দিতে পারি না, তাদের জন্যে বইখাতা জুটবে কোত্থেকে ?'—শুভেন্দু বললো : 'যে করে হোক, জোটাতেই হবে ; না পারি, বাবুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পুরনো বই খাতা ভিক্ষে করে এনে আমরা কাজ চালাবো।'

তাই চলতে লাগলো, এবং দেখা গেল—স্কুলটা উঠে গেল না, বরং দিনে দিনে বড় হয়ে উঠলো। তার জন্যে ডোনেশন উঠলো, বই যোগাড় হলো, মাস্টাররা মাইনে না পাক অন্তত পান-বিড়ি খাবার পয়সা পেলো। কিন্তু একটা ফ্রি প্রাইমারী স্কুলই কি যথেষ্ট ? সারাদিন যাদের এখানে কাজ নেই, তাদের জন্যেও যে বইয়ের প্রয়োজন। একটা ভালোমতো লাইব্রেরি চালু করতে পারলে লোকগুলো অন্তত পরচর্চা থেকে নিবৃত্ত হতে পারে—প্রস্তাবটা উপস্থিত করতেই কয়েকটি যুবক বেশ উৎসাহ দেখিয়ে এগিয়ে এলো। বয়সে তারা শুভেন্দুর চইতেও কিছু ছোটই হবে। কিন্তু ছোট হলেও মন তাদের সমুদ্রের মতো, সেই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে একসময় সারা কলোনী ভেসে গেল। লাইব্রেরি ঘর তৈরী হলো, কাচের আলমারির অভাবে কেরোসিন কাঠের তাক এলো, নতুন পুরাতন নানা বই এসে জড়ো হতে লাগলো ; লাইব্রেরিয়ানের অভাব হলো না, অভাব হলো না তেমনি মেম্বারের, মাসে মাত্র দু'আনা চাঁদা, লোকে তাই কার্পণ্য করলো না। এমনি করে কিছুকালের মধ্যে লাইব্রেরিটাও দাঁড়িয়ে গেল। অফিসের ডিউটি থেকে ফিরে এসে দুপুর থেকে রাত অবধি স্কুল আর লাইব্রেরির পিছনেই লেগে রইল শুভেন্দু। মাঝে

মাঝে বৈঠক বসিয়ে গান-বাজনা আর আলোচনা দিয়ে সারা কলোনীতে নতুন প্রাণ নিয়ে এলো সে। এতদিন লোকগুলো যেন মরে ছিল, এবারে একটু একটু করে তারা বেঁচে উঠছে, জীবনের ওপর মমতা আসছে সকলের। মনে হচ্ছে—অতীত যা অপহরণ করেছে জীবনের তা একটা ভগ্নাংশ মাত্র, ভবিষ্যৎকে ফলবান করে তুলতে পারলে অতীতের সব স্মৃতি একদিন জীবন থেকে মুছে যাবে।

কিন্তু শুভেন্দু নিজেই কি মুছে ফেলতে পারলো তার অতীতকে? বিগত কালের বেদনা যে সমস্ত মনে তার আজ কাঁটার মতো বিঁধে আছে! একটা মহাস্বপ্নের ব্যর্থতাকে সে যে তার নিজের জীবন দিয়েই উপলব্ধি করলো! সেখানে শান্তি কোথায়, সান্ত্বনা কোথায়, সার্থকতা কোথায়? কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল রবীন্দ্র-নাথকে—

'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
হোক সে যতই ধূলি মাঝে অবহেলা।'...

ভোর হতেই মন থেকে অতীতকে মুছে ফেলে দিয়ে তাই আবার পোস্টাল ডিউটিতে বেরিয়ে পড়লো শুভেন্দু।

এমনি করেই দিন কাটছিল।

কিন্তু নির্মলা সেই যে প্রশ্নটা তুলেছিল, সেখানেই তার শেষ হয়নি। একদিন বললো: 'চাকরি পেলে, বাসাও একটা মোটামুটি হলো, এবারে তুমি বিয়ে করো দাদা, বৌদিকে নিয়ে আমার বেশ কেটে যাবে।'

শুভেন্দু বললো: 'কিন্তু আমার যে কাটবে না!'

'মানে?'

মানে—যা মাইনে পাই, তা দিয়ে আমাদের নিজেদেরই চলে না, তার উপর পরের বাড়ির একটা মেয়েকে ঘরে এনে একেবারেই যে অচল হয়ে পড়বো।'

কথা কেটে নির্মলা বললো: 'এখনও যা চলে, তখনও তাই

চলবে। তা ছাড়া তোমার কাজেরই কি কিছু উন্নতি হবে না? সত্যি, এবারে তুমি বিয়ে করো দাদা।'

শুভেন্দু জিজ্ঞেস করলো: 'কেন রে, তুই-ই বা হঠাৎ এমন আমাকে নিয়ে পড়লি কেন?'

'কেন, বুঝতে পারো না?' থেমে মাথা নিচু করে নির্মলা বললো: 'এখানে লোকের কাছে পরিচয় দিতে দিতে আমার গলা ব্যথা হয়ে গেল। মাথায় সিঁদুর না দিয়ে অনেক বউই নাকি আজকাল বোন বলে পরিচয় দিয়ে ঘরকন্না করে। এমন সব পাপের কথা দিনের পর দিন ঘরে বসে আমি আর শুনতে পারি না দাদা।'

হঠাৎ মুখখানি বড় গম্ভীর হয়ে গেল শুভেন্দুর। এরকম কথা আর-একদিনও বলেছিল নির্মলা, কিন্তু সেদিন সেকথার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেয়নি সে। আজ কিন্তু কথাটা শুনে শুভেন্দু উড়িয়ে দিতে পারলো না। উঠে একসময় কোথাও উধাও হয়ে গেল।—এর পর মাস দু'তিনও কাটলো না। খোঁজখবর করে একদিন বিনা জাঁকজমকে বীণাকে এনে ঘরে তুললো। যে ঘর নির্মলা নিজের হাতে গুছিয়ে তুলছিল, এবারে বীণা এসে তাকে পরিপাটি করে সাজিয়ে নিল। নির্মলাকে কাছে ডেকে শুভেন্দু বললো: 'কি রে, এবারে তুই নিশ্চিন্ত হলি তো? এবারে যদি কেউ এসে পরিচয় জিজ্ঞেস করে, তবে তার গালে একটা চড় বসিয়ে বিদেয় করে দিস।'

নির্মলা বললো: 'একেই কাউকে তুমি নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে না, এর পর শুধু চড় খেয়ে তারা কি ভেবেছ খালি হাতেই ফিরে যাবে?'

শুভেন্দু বললো: 'যা, জ্যাঠামি না করে নিজের কাজে যা।'

উপস্থিত মতো তাই গেল বটে নির্মলা, কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, শুভেন্দুর মনে হলো—সে যেন তার আর বীণার কাছ থেকে নির্মলাকে ক্রমেই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে! অথচ উপায় নেই। তার যে-সময়টা নির্মলা কেড়ে নিতো, এখন তার চাইতেও বেশী সময়

কেড়ে নিয়েছে বীণা। তার উপরে আছে পোস্টাল ডিউটি, স্কুল, লাইব্রেরি আর সভাবৈঠক। এগুলো না থাকলে বা বাঁচবে কি করে সে। অনেককাল গল্প-প্রবন্ধ কিছু না লিখতে পেরে মনটা বড় অস্থির করছিল, এবার থেকে গল্পের খাতায় নিজেকে নিয়ে কিছু কিছু ডায়েরি রাখতে শুরু করলো শুভেন্দু। নির্মলার দিকটা যে ফাঁক, সেই ফাঁকই থেকে গেল। এমনি করেই একটা বছর ঘুরে এলো। বীণার কোলে এলো টুটুল। ঠিক এই সময়েই রাখালের সঙ্গে যেন কেমন করে যোগাযোগ ঘটলো নির্মলার। বাড়িতে এসে রাখাল আলাপও করে গেল। শুভেন্দু ভাবলো—সংসারে নির্মলা বড় একা, রাখালের সঙ্গে গল্পগুজব করে নির্মলা যদি ওদের পারিবারিক সংস্পর্শে শান্তি পায় তো পাক। তাছাড়া বাবা তো নির্মলাকে আবার বিয়ে দিতেই চেয়েছিলেন, তাই নির্মলা বিধবা হয়ে ফিরে এলে তাকে আর থান পরতে দেননি বাবা। বিয়ের আগে যেমন কুমারী ছিল নির্মলা, ঠিক তেমনি কুমারী-পরিচ্ছদেই নিজেকে আবৃত করে রাখলো সে। শুভেন্দু ভাবলো—কারুর সঙ্গে কিংবা বিনা-খরচে রাখালের সঙ্গেই যদি নির্মলার ভাগ্য-বিনিময়টা হয়ে যায় তো মন্দ কি! তাতে শুভেন্দুর দায়িত্ব এবং খরচ দুটোই কমে। এই মনে করেই নির্মলার স্বাধীন বিচরণে বাধা দেয়নি শুভেন্দু। কিন্তু বীণা আর টুটুলের দিকে তাকাতে গিয়ে ইদানীং মাঝে মাঝে তাও দিতে হয় বৈ কি! তেমনি একটা বাধা আর প্রতিবাদই আজ প্রথম তার আচরণে প্রকাশ পেলো। সেই প্রকাশকে হয়তো নির্মলাও সহ্য করতে পারলো না।

খেয়ে উঠে একটুকালের বিশ্রামের অবকাশে এক নিমেষে আজ এত কথা মনে পড়ে গেল শুভেন্দুর। মনে পড়ে সমস্ত মনটা তার জ্বালা করতে লাগলো।

এসময়ে কোথা থেকে এতক্ষণ বাদে টুটুলকে কোলে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো বীণা, বললো, 'আজ যদি একবার ডাক্তার

কবরেজ কাউকে ডেকে টুটুলকে না দেখাও, তবে ওর গা থেকে এ জ্বর আর নামবে না।'

ব্যস্ত হয়ে শুভেন্দু বললো, 'আর খানিক বাদেই এখানকার বুড়ো হোমিওপ্যাথ শিবেন ডাক্তার তাঁর ডিস্‌পেনসারীতে আসবেন। এলেই আমি টুটুলকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো। ওকে বরং একটুকাল আমার কোলে দাও।'

'থাক, টুটুলের জন্যে তোমাদের যে কি দরদ, তা আমার জানা আছে।' বীণা বললো, 'তার চাইতে পারো তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়, নয়তো নিজের কাজে যাও।'

শুভেন্দু আর কথা না বাড়িয়ে এবারে ধীরে ধীরে উঠে পড়লো, তারপর একটা জামা টেনে কোনোরকমে গায়ে গলিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লো। কাজের তার শেষ নেই। ফ্রি প্রাইমারী স্কুলটাকে চেষ্টা করে যদি হাইস্কুলে না দাঁড় করানো গেল, তবে আর কি কাজ হলো! এখানে যে এত লোক আছে, অথচ কারুর কোনো বিষয়ে যদি কিছু উৎসাহ থাকে! একদিন যারা বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত করেছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছে, আজ তারা হতমান, নিষ্ক্রিয়, ঘুমন্ত প্রাণীর মতো আজ তারা নিভে গেছে। অথচ কোন জাতির এটা জীবনীশক্তির লক্ষণ নয়। দেশ গেছে, জীবন-সংগ্রাম মুখর হয়েছে, তাতে মিথ্যে নেই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে জেগে ওঠার মতোও যে সত্য কিছু নেই! সেই সত্যের পথে সকলে একসঙ্গে পা বাড়ালে তবেই না আগামী যুগের জন্যে তাদের পথ-রচনা সার্থক হবে! তার জন্যে লোক চাই, অর্থ চাই। সেই লোকের সন্ধানেই এবারে পা বাড়ালো শুভেন্দু।···

সেদিন ডাকে অনেক কাগজপত্র ছিল নীলাদ্রি চ্যাটার্জীর। অন্যান্য দিন সাধারণত তার লেটারবক্সটা কাজে এলো না। কাগজপত্র এত বেশী যে লেটারবক্সে তার সবগুলো ধরল না, বাধ্য হয়ে

তাই ছুয়ারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল সে : 'চিঠি আছে স্থার।'

গলার আওয়াজটা অপরিচিত ছিল না নীলাদ্রির কাছে। ঘরে একাই সে পড়াশুনা করছিল, সাড়া দিয়ে বললো : 'কে, শুভেন্দু না, এস, এদিকে নিয়ে এস যা আছে।'

তবু সোজা তার ঘরে গিয়ে ঢোকবার মতো সাহস ছিল না শুভেন্দুর, এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাগজপত্রগুলোকে এগিয়ে ধরে বললো : 'এই সব কাগজেই বুঝি আপনার লেখা আছে স্থার?'

স্মিত হেসে নীলাদ্রি বললো : 'বল কি, এত কাগজে একসঙ্গে লিখতে পারা কি চাট্টিখানি কথা! এগুলোর বেশির ভাগই কম্প্লিমেণ্টারী আসে। মাঝে মাঝে লিখি।'

শুভেন্দু জিজ্ঞেস করলো : 'মাঝে মাঝে লিখলে মাসে মাসে তবে এমনি সব কম্প্লিমেণ্টারী কপি পাওয়া যায়? বাঃ, খুব ভাল তো! আমি যদি স্থার আপনার মতো লিখতে জানতাম, তবে বিনে পয়সায় ঘরে বসে অনেক কাগজ পড়বার সুযোগ পেতাম।'

উঠে কাগজপত্রগুলিকে নিজের হাতে টেনে নিয়ে তেমনি স্মিতকণ্ঠেই নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল : 'কেন, অভ্যাস আছে নাকি?'

'না স্থার। অভ্যাসটা তো সাঙ্ঘাতিক জিনিস, সংসারে ক'জন আর কটা কাজকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারে!' থেমে শুভেন্দু বললো, 'তবে পাঠ্যজীবনে অনেকের মতো আমারও একটু বাতিক ছিল, সে কিছু নয়।'

নীলাদ্রি বললো : 'মনে হচ্ছে বীটের কাজ তোমার এখনও শেষ হয়নি, নইলে কিছুক্ষণ বসে যেতে।'

হাতের বোর্ড-ফাইলটার দিকে ইঙ্গিত করে শুভেন্দু বললো : 'দেখতেই তো পাচ্ছেন, আজকের ডাক খুব ভারী। অন্য কোনোদিন সুযোগমতো এসে বসব। আপনার কাছে এসে বসতে পারলে যে তীর্থের পুণ্য নিয়ে যাই স্থার।'

'কি যে বল!' থেমে নীলাদ্রি বললো: 'একদিন বরং হাতে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে এস, বসে বসে গল্প করা যাবে।'

শুভেন্দু বললো: 'যে কাজে ঢুকেছি, তাতে আর সময় বলে কিছু নেই। ছুটি না নিলে পোস্টাপিসে ছুটির বালাই নেই। আর বীট নিয়ে না বেরোলে পাবলিকেরও যে অসুবিধে!'

নীলাদ্রি বললো: 'অন্যান্য অফিসের মতো তোমাদের তো শুধু সার্ভিসই নয়, এ যে সোস্যাল ওয়ার্ক। তোমাদের ডিগ্‌নিটিই আলাদা। মাইনে বা পজিশন দিয়ে তাকে বিচার করা যায় না।'

চলে যেতে উদ্যত হয়েও শুভেন্দু একটুকালের জন্যে দাঁড়ালো, বললো: 'আপনার মতো শিল্পী-মন যদি সকলের হতো, তবে এদেশ কবেই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হতো! কিন্তু তা নয় স্যার। আজকের দুনিয়ায় মাইনে আর পজিশনটাই বড়, এ দুটো যাদের আছে, লোকের কাছে টাকা ধারও তারাই পায়। তা যাক, ওসব কথা বড় কথা, আমার মুখে সাজে না।'

একথা নীলাদ্রি নিজেও জানে বৈ কি! শুধু শুভেন্দুকে উৎসাহিত করতে ডিগনিটি কথাটা তুলেছিল। দেখলো—সেটুকু ধরে নিতে শুভেন্দুর এক সেকেণ্ডও লাগলো না। বললো: 'তুমি যদি পড়তে চাও, তবে মাঝে মাঝে এসে কিছু কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে যেতে পারো আমার কাছ থেকে। সব কাগজ তো সত্যিই আর আমি পড়ে উঠতে পারি না, অনেক দিন পড়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত হকাররা এসে নিয়ে যায়।'

শুভেন্দু বললো: 'সে যে আপনার ইন্‌কাম, সেটা ডিস্‌টার্ব করা কি আমার উচিত হবে স্যার?'

'এমন কিছু ইন্‌কাম নয় যে, তুমি দুখানা কাগজ নিয়ে বাদ সাধবে?' নীলাদ্রি বললো: 'আমি তোমার জন্যে বেছে রেখে দেব, এরপর যেদিন আসবে, নিয়ে যেয়ো। পড়ে যদি তোমার সময় কাটে, আমি তবে খুশিই হবো।'

হেসে শুভেন্দু বললো : 'কাগজ হাতে না পেলেও আমাদের পড়া আটকায় না। অনেকটা ধোপাদের মতো। তারা বাবুদের ধুতে দেওয়া কাপড় পরেই নিজেদের কাপড়ের অভাবটা মিটিয়ে নেয়। আমরাও বীটের কাগজ কখনও কোনোসময় একদিনের বদলে অন্যদিন ডেলিভারী দিয়ে তেমনি পড়ার সখ মিটিয়ে নিই। আপনার লেখাও যে এমনি করে পড়েই প্রথম জানলাম—আপনি এতবড় শিল্পী।' তারপর একদণ্ডও আর অপেক্ষা না করে বিদায় নিয়ে বললো : 'কি করবো স্যার, অবস্থার চাপে পড়ে এমনি করেই আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে হয়। আজ আসি, আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালে বীট শেষ করে উঠতে পারবো না। কেউ কোথা থেকে রিপোর্ট ঠুকে দিলে এত কষ্টের পাওয়া এ সামান্য চাকরিটাও আর থাকবে না।' বলে নিজের ডিউটির পথে পা বাড়ালো শুভেন্দু।

এবারে প্যাকেট থেকে কাগজ খুলে খুলে একটা একটা করে দেখতে লাগলো নীলাদ্রি। হঠাৎ 'চৈতালী' মাসিক পত্রের একটা পৃষ্ঠায় এসে কিছুক্ষণের জন্যে তার চোখ দুটো একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো। গ্রন্থ-আলোচনা বিভাগে তার 'মিতাক্ষরা' উপন্যাসটি সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মূল বক্তব্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে কিছু কটুভাষণ করেছে। পড়তে গিয়ে বিরক্তিতে নিজের মধ্যে হঠাৎ জ্বলে উঠলো নীলাদ্রি। এদেশের পত্র-পত্রিকায় আজ পর্যন্ত এমন একজন সমালোচক চোখে পড়লো না—যে অন্তত খাঁটি জিনিসকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে মমতার সঙ্গে খাঁটি বলে প্রকাশ করতে পারল! নন্‌সেন্স।

সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকে সুভদ্রা জিজ্ঞেস করল : কাকে নিয়ে আবার পড়লে? কাগজপত্রে দেখি তলিয়ে আছো। আজকের ডাকে এলো বুঝি?'

'না এলেই ভাল হত, চোখে পড়তো না।' থেমে নীলাদ্রি

বললো : 'চৈতালী কাগজ আমার মিতাক্ষরার শান্তনু আর বিতুলা সম্পর্কে কিছু না বুঝে কি লিখেছে দেখ।' বলে চৈতালীর পৃষ্ঠাটা স্ত্রীর চোখের সামনে মেলে ধরল নীলাদ্রি।

তার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুভদ্রা বললো : 'ওমা, সে কি, এ কি ছাই লিখেছে! এ ভদ্রলোক হয় লেখাপড়া জানে না, নয়তো না পড়েই পাণ্ডিত্য জাহির করেছে। এসব কাগজে সমালোচনার জন্মে তুমি বই দাও কেন ?'

'আমি কি দিয়েছি, দিয়েছে প্রকাশক।' নীলাদ্রি বললো, 'তালুকদার কোম্পানীকে বলে দিতে হবে—তারা যেন আমাকে না জানিয়ে কোনো কাগজে আর সমালোচনার জন্মে বই না দেয়।'

সুভদ্রা বললো : 'তোমাদের কাগজপত্রের ব্যাপার বুঝি না বাপু। কাউকে মাথায় তোলে তো একেবারে আকাশে উঁচিয়ে ধরে, আবার কাউকে নিচে নামায় তো একেবারে পাতালে পাঠিয়ে ছাড়ে। এই না কি তোমাদের সাহিত্যের রীতি ?'

'সাহিত্যের রীতি নয়, এই হচ্ছে আমাদের দেশের রীতি।' থেমে নীলাদ্রি বললো : 'এই রীতির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরও কিছু করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথও কিছু করতে পারেন নি ; আর আমি কোন্ ছার নীলাদ্রি চাটুজ্জে।

কথা শেষ করে কিছুক্ষণ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নীলাদ্রি। এই মুহূর্তে সুভদ্রাকে কেন যেন অন্যান্য সব দিনের চাইতে বেশী ভাল লাগছে। অনুভূতি আছে, প্রাণ আছে সুভদ্রার। মাঝে মাঝে সংসার নিয়ে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠলেও আসল প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সুভদ্রার মতামতকে না মেনে উপায় থাকে না। বাংলাদেশের সাহিত্যের রীতিটা সুভদ্রার কাছে অবধি ঢাকা নেই। তাকে তার নারী মন যেখানে স্বীকার করে নিতে পারছে না, সেখানে সাহিত্যে কলম ধরে নীলাদ্রি কেমন করে স্বীকৃতি জানাবে সেই কুৎসিত মানসিকতাকে ?

সুভদ্রা বললো : 'কি দেখছ এমনি করে ? সমালোচনা পড়ে মনে খুব লেগেছে তো ?'

তেমনি করেই সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নীলাদ্রি বললো : 'তোমার রান্নার নিন্দে করলে তোমার মনে লাগে না ?'

সুভদ্রা এবারে না হেসে পারলো না, বললো : 'তোমার রান্না বুঝি উপন্যাস, আর তার মসলা বুঝি নায়ক-নায়িকা ? নাও, অনেকক্ষণ কাগজপত্র পড়েছ, এবারে ওঠো, উঠে চলো—রান্নাঘরে আমার পাশে বসবে।' বলে রান্নাঘরের দিকেই আবার পা বাড়ালো সুভদ্রা। সেই সঙ্গে নীলাদ্রিও কাগজপত্র রেখে উঠে পড়লো।'

দিনকয়েক বাদ দিয়ে আর একদিন শুভেন্দু এসে নীলাদ্রির দরজায় দাঁড়ালো। নীলাদ্রির আজ হাতে বিশেষ কাজ ছিল না, শুভেন্দুকে চোখে পড়তেই জিজ্ঞেস করলো : 'এই যে শুভেন্দু, কিছু আছে নাকি আমার, না একেবারেই ফাঁকা ?'

'আজ্ঞে না, আজ আর কিছু দিতে পারলাম না।' থেমে শুভেন্দু বললো, 'ভাবলাম—আর আধঘণ্টাটাক ঘুরলেই যখন হাতের বীট শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।'

'বেশ করেছ, এস, বসবে এস।' বলে ভিতরে গিয়ে বসতে আহ্বান জানালো নীলাদ্রি, তারপর থেমে বললো : 'তোমার জন্যে খানকয়েক ম্যাগাজিন বেছে রেখে দিয়েছি, নিয়ে যাও, পড়তে পারবে।'

'এ আমার সৌভাগ্য স্যার।' ভিতরে এসে বসতে বসতে শুভেন্দু বললো : 'পড়ে যদি ফেরত দিতে না হয়, তবে আমাদের লাইব্রেরিতে দিতে পারি। আমার মতো লাইব্রেরির মেম্বাররাও পড়তে পারবে।'

নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করলো: 'কি লাইব্রেরি তোমাদের, পোস্টাল ?'

'আজ্ঞে না স্যার, আমাদের কলোনীর লাইব্রেরি।' শুভেন্দু বললো, 'চেষ্টা করে দু-পাঁচজন ছেলেকে নিয়ে আমিই লাইব্রেরিটা স্টার্ট করেছিলাম, এখন প্রায় দাঁড়িয়ে গেছে। এবার থেকে মিউনিসিপ্যাল এইড পাবার কথা আছে, তার সঙ্গে যদি গভর্নমেণ্টের কিছু সাহায্য পাই, তবে লাইব্রেরিটাকে আরও বড় করে তুলতে আটকাবে না। আমরা এরই মধ্যে আপনার প্রায় খান আষ্টেক বই লাইব্রেরিতে নিয়েছি।'

বিনয় প্রকাশ করে নীলাদ্রি বললো, 'বলো কি, একা আমারই আটখানা বই নিয়েছ ? আমি দেখছি অত্যন্ত ভাগ্যবান লেখক।'

কিন্তু একথার কোনো জবাব না দিয়ে শুভেন্দু বললো, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, একটা জিজ্ঞাস্য আছে।'

'কি, বলো।'

'আচ্ছা, আপনি কি পুব বাংলার লোক ?'

'কেন বলো তো ?'

শুভেন্দু বললো: 'আপনার ছিন্নমূল উপন্যাসখানি পড়ে কেবলই মনে হলো—আপনি নিশ্চয়ই পুব বাংলার মানুষ, নইলে উদ্বাস্তুদের জীবনকাহিনী এমন দরদ দিয়ে লেখা আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজ ও সভ্যতার ভাঙনের ইতিহাসের একটা মস্ত বড় অধ্যায় আপনি স্বর্ণাক্ষরে ফুটিয়ে তুলেছেন; আজ না হলেও ভবিষ্যতের বাঙালী একদিন এর পুরস্কার আপনাকে দেবে।'

নীলাদ্রি বললো, 'কোনো সত্যকে আঁকতে হলে কোনো বিশেষ স্থানের মানুষ না হলেও চলে। এককালে পুব বাংলায় আমি অনেক ঘুরেছি। তার বিভিন্ন জনপদের নানা মানুষকে আমি জানতে চেষ্টা করেছি। তারা যখন পিতৃ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে অজানা পথে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে, তাদের সেই দুঃখের কাহিনী আমি

নীরবে চোখ বুজে সহ্য করতে পারিনি। ছিন্নমূল তারই বেদনাময় প্রকাশ।'

শুভেন্দু বললো, 'বাংলা সাহিত্যের মূলে তো বাংলাদেশ, অথচ দেশের এই এতবড় ভাঙন বাংলা সাহিত্যকে তেমন করে স্পর্শ করলো না। আপনার ছিন্নমূল না বেরোলে এদিকটা প্রায় পুরোপুরিই ব্ল্যাঙ্ক থেকে যেতো।'

'ঠিক তা নয়।' নীলাদ্রি বললো, 'তোমার পড়াশুনো আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু হয়তো তুমি ওভারলুক করে গেছ, পুব বাংলার সঙ্গে যাদের নাড়ীর সম্পর্ক, এরকম ছু-চারজন লেখক কিছু কিছু চিত্র এঁকেছেন, তবে তা হয়তো সামগ্রিক চিত্র নাও হতে পারে।'

শুভেন্দু বললো, 'আমার প্রশ্নটা যে সেইখানেই স্যার। বাংলা যে সোনার বাংলা, তার আবার পুব আর পশ্চিম কি! কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে গেল ; তাই সোনা পুড়ে দস্তা হয়ে গেল বাংলাদেশ, সেই সঙ্গে আমাদেরও কপাল পুড়লো।'

নীলাদ্রি বললো, 'ঘুঁটে পুড়ে অঙ্গার হয় জানো তো ? আজ যারা পুড়ে মরলো, কাল তারা অঙ্গার হয়ে সেই আগুনকে দগ্ধ করবে। তার জন্যেই এই যজ্ঞাহুতি। সে কিছু নয়।'

শুভেন্দু বললো, 'এরকম আশার কথা কেউ বলে না স্যার, আজকাল বেশির ভাগ বই দেখি লেখা হয় নর-নারীর যৌন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর বীভৎস রস নিয়ে। একটা মরা জাত তা থেকে নিশ্চয়ই নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা পায় না!'

কিন্তু এপথে বেশিদূর এগোতে চাইল না নীলাদ্রি। একটু কাল চুপ করে থেকে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো : 'আচ্ছা, তুমি আমার মিতাক্ষরা পড়েছ ?'

'বলেন কি স্যার, মিতাক্ষরা পড়িনি ? সেই শান্তনু আর বিহুলা তো ?' শুভেন্দু বললো : 'মিতাক্ষরা নিয়ে আমাদের

লাইব্রেরির মেম্বারদের মধ্যে যে একদিন ডিবেট হয়ে গেল। এরকম এ্যানালিটিক্যাল বই আজকাল খুব একটা কেউ লেখেন না।'

উৎসাহে ফেটে পড়ে নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করলো: 'চরিত্র দুটো তোমার কেমন লেগেছে?'

শুভেন্দু বললো, শুধু যদি বলি—খুব ভালো লেগেছে, তা হলে ভালো লাগার আসল প্রকাশে ফাঁকি থেকে যায়। তার জন্যে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। সে সময় বোধ করি আমার হাতে এখন নেই। তবু বলবো—যেখানে নিরীশ্বরবাদী শান্তনু চাচ্ছে ভগবানের নিয়মকে ভেঙে বিজ্ঞানের পথে প্রকৃতিকে জয় করতে, বিহুলা চাচ্ছে সেখানে প্রকৃতির অনিন্দ্য রূপের মধ্যে ঈশ্বরকেই নতুন করে উপলব্ধি করতে। এই নিয়ে তাদের বিরোধ, অথচ তাদের প্রেম ঈশ্বরের মতো নিরাকার হয়েও দুজনের মনের মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত। এই নয় কি?'

এবারে নীলাদ্রির কি যেন কি হলো, জায়গা ছেড়ে উঠে এসে সহসা সে শুভেন্দুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো: 'ইউ আর পারফেক্ট, এ্যাবসোলিউটলি পারফেক্ট।' তারপর গলা ছেড়ে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললো: 'সুভদ্রা, শিগগির একবার এঘরে শুনে যাও।'

রান্নাঘর থেকে সুভদ্রা ভাবলো—কি যেন কী হয়েছে, তাই উনুনে গরম তেলসুদ্ধ কড়া নামিয়ে না রেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো।

নীলাদ্রি বললো: 'শোনো, শুভেন্দু কি বলে শোনো। আমি তো দেখচি—শুভেন্দুর মতো সমালোচক চৈতালীর স্টাফে একজনও নেই। ওরা কাগজ চালায় কি করে, পড়ে কারা?'

অনুচ্চকণ্ঠে সুভদ্রা বললো: 'এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম—হঠাৎ পড়ে গিয়ে তুমি কি অনর্থটাই না বুঝি বাধালে!'

'পড়ে যাবো কোথা থেকে!' নীলাদ্রি বললো: 'শুভেন্দু এমন সুন্দর করে বলছিল, ঠিক যেন রিডিং দিচ্ছিল। ওদের

লাইব্রেরিতে নাকি আমার আট-আটখানা বই নিয়েছে। শুভেন্দু ইজ এ ভোরেসাস রিডার, বুঝলে সুভদ্রা ?'

শুভেন্দু ততক্ষণে লজ্জায় মাথা নিচু করে নিয়েছে।

কিন্তু নীলাদ্রির মতো সুভদ্রা অতখানি বুঝতে চাইল না; বললো, 'ওদিকে বোধ করি কড়ায় তেল পুড়ে আগুনের তাপ উঠেছে! যদি চা চাও তো একটু দেরি করতে হবে। কড়া না নামিয়ে আমি কেৎলি চাপাতে পারবো না।'

নীলাদ্রি এবারে হঠাৎ কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কি কথা বলতে গিয়ে সুভদ্রার কাছে কি জবাব পেলো সে! বললো, 'না, না, চা তোমাকে এখন আর করতে হবে না। শুভেন্দু যে চা খায় না, সে তো প্রথম দিনই শুনেছি; আমারও এখন খুব একটা দরকার নেই।'

সুভদ্রা এবারে আর এক মিনিটও না দাঁড়িয়ে দ্রুত আবার রান্নাঘরের দিকেই ছুটে গেল।

সেই সঙ্গে শুভেন্দুও উঠে পড়লো, বললো, 'এখনও বীটের কাজ কিছু বাকী আছে, এখন চলি স্যার।'

পাশেই র‍্যাকে পত্রিকা সাজানো ছিল, তা থেকে খান তিনেক কাগজ টেনে শুভেন্দুর দিকে এগিয়ে ধরে নীলাদ্রি বললো, 'এই নাও, পড়ে ভালো লাগলে তোমাদের লাইব্রেরিতেই দিয়ে দিয়ো, আমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না।'

মুখে ধন্যবাদ শব্দটা এসেও কেমন বেধে গেল শুভেন্দুর। তার বদলে একটুকরো হাসি বিস্তার করে নিজের ডিউটির পথে বেরিয়ে গেল সে।

কিছুদিন থেকে টুটুলের শরীরটা কিছুতেই ভালো যাচ্ছিল না। আজ জ্বর, কাল আমাশা, পরশু সর্দিকাশি; একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে। এই নিয়ে বীণারও তাড়নার শেষ ছিল না,

শুভেন্দুরও দৌড়োদৌড়ির কমতি ছিল না। কোনো কোনো দিন সারা রাত কেঁদেকেটে একশা করছে টুটুল। এতটুকু বাচ্চা, কী যে তার কষ্ট, কে বুঝবে? তাকে কোলে করে সারা রাত মেঝের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি পর্যায়ক্রমে ঘুরেছে শুভেন্দু আর বীণা। পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে এসেছে নির্মলা, বলেছে: 'দাও, আমার কোলে দাও, তোমরা ওকে শান্ত করতে পারবে না।' কিন্তু নির্মলাও হার মেনেছে। হোমিওপ্যাথ শিবেন ডাক্তারের ওষুধে এক সময় বেশ কাজ করেছে, আবার এক সময় কোনো উপকারই হয়নি। বীণা বলেছে: 'ডাক্তার পাল্টাও, নইলে টুটুল ভালো হবে না।' কিন্তু পাল্টাতে বললেই তো আর পাল্টানো যায় না। শিবেন ডাক্তারকে যাই হোক ঘরে ডেকে এনে ফি দিতে হয় না, ওষুধের দামটা হাতে গুঁজে দিলেই খুশি। পয়সা দিয়ে এখানকার মিলের ডাক্তারকে 'কল' দেবার মতো সঙ্গতি কোথায় শুভেন্দুর?

এরকম নানা দুশ্চিন্তায় কদিন ধরে তার নিজের শরীরটাও বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। সকালে ঘুম থেকে উঠতে স্বভাবতই তাই দেরি হয়ে যাচ্ছিল। আগে আগে বীণাই তাকে ডেকে তুলে দিতো, তারপর কোনোদিন কাঁচা সাগু ভিজিয়ে তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে দিতো, কোনোদিন বা ডালদায় একটু সুজির হালুয়া করে দিতো। তাই মুখে দিয়ে সেই কাক-ডাকা ভোরে ট্রেনে বেরিয়ে পড়তো শুভেন্দু কলকাতায়। তারপর সোজা একেবারে অফিসে লেটার-সর্টিংয়ের টেবলে। কিন্তু টুটুলের অসুখে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। রাত্রি জেগে জেগে বীণারও আর সময় মতো বিছানা ছেড়ে ওঠা হয় না, শুভেন্দুরও আর কাজে বেরনো হয়ে ওঠে না। অফিসে গিয়ে পৌঁছুতে দিন কয়েক তাই বেশ দেরি হয়ে গেল। এই নিয়ে সহকর্মিরা যে কানাঘুষো না করেছে, এমন নয়; ইন্‌চার্জকে তাই নিজে থেকেই শুভেন্দু দিনকয়েক ছুটির কথা বলেছিল, কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়নি। ইন্‌চার্জ বললেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এ্যালাউ করেন নি।

বাধ্য হয়ে তাই দিনকয়েক একটু দেরি করে কাজে আসার জন্যে আবেদন করেছিল শুভেন্দু। কিন্তু তাও দিনদুয়েকের বেশী তাকে এ্যালাউ করলেন না ইন্‌চার্জ। সেদিন গাড়িটা বেশ লেট করে ছাড়ার ফলে তার এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সহকর্মিরা সব নিজের বীটে বেরিয়ে গিয়েছিল। একেই লজ্জায় নিজের মধ্যে মরে যাচ্ছিল শুভেন্দু, তার উপর ইন্‌চার্জ শিবতোষ ব্যানার্জি হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, বললেন, 'ছেলের অসুখের অজুহাত দেখিয়ে তুমি দেখছি গায়ে দিব্বি ফুঁ দিয়ে চলতে শুরু করেছ শুভেন্দু! এরকম হলে আমি কাজ চালাই কি করে? তোমার বীট আগলে এখানে বসে থাকবে কে? কেউ কি এখানে সরকারের জামাই হয়ে বসে আছে? যাও, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে এস; তিনি যদি এ্যালাউ করেন, তবে বীট নিয়ে বেরও। আমি তোমাকে কাজ দিতে পারবো না।'

একটুকাল চুপ করে থেকে শুভেন্দু বললো, 'ঘরে কি আপনার নিজের ছেলে নেই; তার কি কখনও অসুখ করে না?'

শিবতোষ ব্যানার্জি বললেন, 'তর্ক কোরো না; যা বললাম, তাই করো।'

শুভেন্দু ভেবে দেখলো—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করা মানে সার্ভিস বুকে নিজের রেকর্ড খারাপ করা। বাধ্য হয়ে এবারে তাই সুর নরম করতে হলো তাকে। বললো, 'আপনি থাকতে কেন মিছেমিছি আমাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে পাঠাচ্ছেন বলুন তো? বেলঘরিয়া থেকে আসি, কোনোদিন গাড়ি লেট করে ছাড়লে এসে পৌঁছাতে স্বভাবতই দেরি হয়ে পড়ে। আপনি যদি তা কনসিডার না করেন, তবে কে করবে বলুন! চাকরি করতে এসে টাইমলি ডিউটি করবো না, এ কি একটা কথা! যদি অনুমতি করেন তো আমি কাজে বেরোই!'

শিবতোষ ব্যানার্জি এবারে কিছু একটাও না বলে ভারীমুখে কোথায় একদিকে সরে গেলেন।

শুভেন্দু আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে নিজের বীট নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু বেরিয়ে পড়েও কাজে যেন তেমন উৎসাহ পেলো না। ফুটপাতের একপাশে এসে দাঁড়াতেই অতীতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে মনটা হঠাৎ কেমন উদাসীন হয়ে গেল তার। কোথায় সেই কলেজের মধুর দিনগুলি! কিন্তু বেলার দিকে তাকিয়ে বেশীক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না শুভেন্দু। এরপর বীট শেষ করে বেলঘরিয়ায় গিয়ে পেঁৗছাতে পেঁৗছাতে বেলা ফুরিয়ে যাবে। সে গিয়ে খায়, তবে বীণা খেতে বসে। বাঙালী ঘরের মেয়েরা কী অদ্ভুত উপাদানেই না গড়ে উঠেছে! একবার যাকে স্বামী বলে চিনলো, তার জন্যে সতীত্বের আর সাধ্বীপনার অন্ত নেই। কতদিন শুভেন্দু নিজে থেকেই বলেছে: 'আমার তো ফিরতে ফিরতে কত বেলা হয়, তুমি তো নির্মলার সাথে বসেই সময় মতো একসঙ্গে খেয়ে নিতে পারো! মিথ্যে আমার জন্যে বসে থেকে থেকে কষ্ট পাও কেন?' উত্তরে বীণা বলেছে: 'আমার একটুও কষ্ট হয় না, তুমি ফিরে আসতে আসতে এদিককার সব কাজ আমার গুছনো হয়ে যায়। তুমিই বরং খিদে চেপে রোদে পুড়ে কত কষ্ট করে ফেরো!'—এ কথার জবাব দিতে পারেনি শুভেন্দু। মনে মনে সে এই ভেবে খুশি হয়েছে—সংসারে তাকে বুঝতে অন্তত একটি মানুষ আছে—যে নির্মলার চাইতেও কাছের, সে বীণা।—এমনি সব নানা চিন্তার দোল খেতে খেতে একসময় বীট শেষ করে সে শিয়ালদায় এসে ট্রেনে চাপলো।

বাড়ি এলে একসময় এক হাঁড়ি দই আর একটা মিষ্টির খুরির দিকে শুভেন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বীণা বললো, 'সেই রাখাল ছেলেটার কি কাণ্ড দেখ, দই আর মিষ্টি হাতে করে এনে বললো—তাদের কোন্ এক আত্মীয়-বাড়ি থেকে এসেছে, তা থেকে সামান্য কিছু আমাদের জন্যে নিয়ে এলো।' তারপর গলা খাটো করে, বললো, 'আসলে ঠাকুরঝিকে উপলক্ষ করেই এনেছে, এসে

আমার সামনে তার হাতে আর তুলে দেয় কি করে, বলো? রাখাল চলে গেলে ঠাকুরঝিকে বললাম, এসব তো ভাই তোমার দৌলতেই পাওয়া, খাবার পাতে তুমি ভাই আগে চেখে দেখ, তারপর না হয় আমরা মুখে দেবো। কিন্তু সে কথা কানে নিলে তো। ঠাকুরঝি বললো—তুমি আর দাদা মুখে না দিলে আমিই কি আগে মুখে দিতে পারি! অথচ দেখগে, সে এতক্ষণে বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।'

শুভেন্দু বললো, 'ওদের বোধকরি তুজনকে তুজনের খুব মনে ধরেছে! আমি তো ঠিক ভালো করে চিনি না, নির্মলাকে দিয়ে কথায় কথায় একসময় ওদের বংশ-পরিচয়টা একবার বার করতে চেষ্টা করো তো দেখি! যদি না আটকায়, তবে নির্মলার সঙ্গে একবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দেখি রাখালকে, কি বলে!'

সারা মুখের উপর দিয়ে কেমন যেন একটা হাসির আভা খেলে গেল এবারে বীণার। বললো, 'আমিও ঠিক এই কথাটাই কদিন ধরে ভাবছিলাম। রাখাল হোক, যেই হোক, ঠাকুরঝির জন্যে আর দেরি না করে এবারে কাউকে দেখা দরকার। পাছে তুমি কিছু মনে করো, তাই মুখ ফুটে বলছিলাম না।'

শুভেন্দু বললো, 'বিধবা হয়ে অবধি সংসারে নির্মলা বড় একা হয়ে পড়েছে। বাবাই চেয়েছিলেন ওকে আবার বিয়ে দিতে। আবার কাউকে সঙ্গী পেলে নির্মলা খুশিই হবে। রাখালকেই যদি ও উপযুক্ত মনে করে, তাতেই বা আমাদের আপত্তির কি আছে! তবে রাখাল সম্পর্কে আগে থেকে সব কিছু না জেনেশুনে নির্মলাকে কিছু খুলে বলা ঠিক হবে না।'

প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বীণা বললো, 'আচ্ছা, সে যখন হবে, হবে। টুটুল ঘুমোচ্ছে, এই বেলা তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নাও।'

শুভেন্দু বললো, 'এস না আজ তুজনে একসঙ্গে বসে খাই! নির্মলা

শুনলাম ঘুমোচ্ছে, সুতরাং অসুবিধার কি আছে, ও তো আর উঠে এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে না।'

স্বামীর মুখের দিকে কেমন একবার মিটমিট করে তাকিয়ে বীণা বললো, 'টুটুলের জামা ইজেরগুলো তবে আর আমাকে এ-বেলা কাচতে দেবে না দেখছি। যাও, আগে তো স্নানটা করে এস!' বলে নিজেও এবারে স্নানের জন্যে উঠে পড়লো বীণা।

দিন কয়েক কেটে গেলে টুটুলের মুখে আবার স্বাভাবিক হাসি ফুটে উঠলো। এতদিন যে-ছেলে খিদেয় খেতে অবধি চায়নি, মুখের সামনে দুধ ধরলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, খাবার জন্যে সেই ছেলের আবার কি কান্না! শুনে ডাক্তার বললো, 'এবারে বেশী করে ছেলেকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করো, শরীরে ওর আর রোগ নেই।'

কিন্তু টুটুলের রোগটা বোধকরি এবারে তার বাবাকে এসে ভর করলো! কদিন ধরেই শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছিল শুভেন্দুর। ইচ্ছে হয়নি ঘর থেকে কাজে বেরোতে, তবু সংসারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে পারেনি। বিশেষ করে ইন্‌চার্জ শিবতোষ ব্যানার্জি যে-প্রকৃতির মানুষ, ছুটির কথা বলতে গেলে মুখের উপর খেঁকিয়ে উঠবে। শরীরে জ্বর নিয়েই দিন দু-তিন তাই সে কাজে বেরলো, তারপর যখন আর কিছুতেই মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে পারলো না, ছুটির দরখাস্ত পেশ করে ঘরে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। শুশ্রূষার লোকের অভাব ছিল না, যাদের পরিচালনায় স্কুল আর লাইব্রেরি চলছিল, তারা এসে যখন-তখন দেখে যেতে লাগলো, দরকার মতো ওষুধ এনে দিল ডাক্তারের কাছ থেকে। তাদের আড়ালে একটি ছেলের মুখ ভুল হবার কথা নয় শুভেন্দুর। সে রাখাল। কখন থেকে যেন এসে বসে থেকে উঠে গেল। না গেলে হয়তো তাকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করা যেতো, কিন্তু সে সুযোগ আর মিললো না। একসময় নির্মলা এসে শিয়রে বসলে সে জিজ্ঞেস

করলো : 'রাখাল কি নিজে থেকেই এসেছিল, না তোর কাছে শুনে আমাকে দেখতে এসেছিল ?'

একটুও সঙ্কোচ না করে নির্মলা বললো : 'বাইরের কাজে দরকারে লাগতে পারে বলে ওকে খবর দিয়েছিলাম।'

কাতর কণ্ঠে শুভেন্দু বললো : 'এখানে এত লোক থাকতে ওকে আবার ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া কেন। আমার এ ফ্লু অল্পতেই সেরে যাবে ; তবে বড় দুর্বল করেছে, এই যা—।'

নির্মলা বললো, 'চাকরিতে ঢুকে অবধি কোনোদিন তো একটা দিনেরও ছুটি নিলে না, এবারে লম্বা ছুটি নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর যা হবার হবে।'

রোগক্লান্ত ঠোঁটে একটুকরো ম্লান হাসি টেনে শুভেন্দু বললো, 'কত কষ্টের চাকরি, এখনও ভালো করে প্রবেশনারী পিরিয়ডটাই কাটলো না, এরপর নষ্ট করে দিলে তোদের নিয়ে কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবো ?'

কিন্তু এ কথার উত্তর নির্মলাও জানে না, তাই সে এবারে চুপ করে গেল।···

ছুটিটা ঠিকই এক্স্‌টেণ্ড করতে হলো শুভেন্দুকে। জাপানী ফ্লু, ধাক্কা সামলে উঠতে কমপক্ষে অন্তত দশ-বারো দিন। তারপর মাথা খাড়া করে কাজে বেরোতে আরও অন্তত সাতদিন। এতদিন ছুটি নিলেই বা চলবে কি করে ? যদি কর্তারা চটে গিয়ে কলকাতা থেকে মফঃস্বলে ট্রান্সফার করে দেয়, তবে বিপদের শেষ থাকবে না।

কলকাতার ন' নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পিয়ন বিশ্বনাথ চট্টরাজও সেদিন নীলাদ্রি চ্যাটার্জির কাছে এই কথাই বলছিল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করলো : 'তুমি বুঝি এ পাড়ায় নতুন এলে ?'

বিশ্বনাথ বললো : 'এরকম অফিসিয়েটিং করতে প্রায়ই আমাকে নতুন নতুন পাড়ায় যেতে হয়। বয়স হয়েছে, অথচ এখনও আমাকেই

ছোকরাদের তালিম দিতে হয়। অথচ যারা ছুটি নেয়, একবারও ভাবে না—ট্রান্সফার করে দিলে বাইরে গিয়ে তাদের কী অসুবিধেয় পড়তে হবে।'

নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করলো : 'শুভেন্দু তাহলে ট্রান্সফার্ড হয়নি, ছুটি নিয়েছে ?'

'আজ্ঞে, অফিস থেকে তো তাই বলছে। এখন যদ্দিন খুশি আমাকে দিয়ে চালাবে।' থেমে প্রৌঢ় বিশ্বনাথ বললো, 'ছিলাম ভবানীপুরে, এলাম বউবাজারে, তারপর এরকম নানাজনের এ্যাবসেন্সে তালিম ঠুকে চলেছি।'

নীলাদ্রি বললো, 'শুভেন্দুর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ও তো ঠিক সংসারের হিসেবকরা ছেলেদের মতো নয়, ওর একটা আলাদা জগৎ আছে ; ছুটিটা ওর হয়তো মাঝে মাঝে তাই দরকার হয়ে পড়ে।'

প্রৌঢ় বিশ্বনাথ বললো : 'ছুটি কার না দরকার বলুন ? আমি ছুটি পেলে ইচ্ছে ছিল একবার মথুরা থেকে ঘুরে আসি। কিন্তু গত পঁচিশ বছর চেষ্টা করেও তা পারলাম না। বোধ হয় নিমতলায় যাবার আগে আর পারবোও না। ঐ শুভেন্দু ওরা পারবে, ওদের বয়স কম, হালের ছেলে, আমাদের চাইতে ওদের ভবিষ্যৎ ভালো।'

নীলাদ্রি বললে, 'এতে দুঃখ করার কি আছে ! চিরকাল তাই হয়। যে যুগ বুড়ো হয়ে যায়, তা নবীন যুগকে সামনে এগিয়ে দেয়। তোমরাও দিচ্ছ।'

'আমরা নই স্যার, দিচ্ছে গভর্নমেণ্ট। আমাদের রিটায়ারমেণ্ট আর ওদের এপয়েণ্টমেণ্ট। তাকেই বোধ করি আপনারা বলেন প্রবীণ আর নবীন।' বলে একটুকালও আর না দাঁড়িয়ে নিজের কাজে চলে গেল বিশ্বনাথ।

কিন্তু শুভেন্দুর জন্যে সত্যিই কদিন ধরে বড় ভাবছিল নীলাদ্রি। ছেলেটি এখন যেন আর শুধুই পিয়ন নয়, তার মনন জগতের একজন, তার সাহিত্যের একজন অন্যতম রসিক পাঠক। তার সঙ্গে যে

নীলাদ্রির এক জায়গায় বসতি! সংসারে সকলকে নিয়ে থেকেও সকলকে আত্মীয় বলে স্বীকার করা যায় না। অথচ এমন কেউ আছে—যে দূরে বাস করেও আত্মীয় হয়ে ওঠে। শুভেন্দু বুঝি আজ সেইরকম আত্মীয়। তাকে দু'দিন না দেখলে মন বিচলিত হয়। ইচ্ছে হয়—সে এসে রোজ সামনে দাঁড়াক, কথা বলুক, তর্ক করুক, জানাক, জানুক। ক'দিন তাকে না দেখে তাই মনটা সত্যিই ভালো লাগছিল না নীলাদ্রির।

এমনি করে আরও কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর আবার একদিন শুভেন্দু এসে দরজায় দাঁড়ালো। চেহারা ভেঙে একেবারে বিশ্রী হয়ে গেছে। সাগ্রহে তাকে কাছে ডেকে বসিয়ে নীলাদ্রি বললো: 'তাই বলো, যে লোকটা এতদিন তোমার জায়গায় এসে কাজ করছিল, সে তবে তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানে না! এর মধ্যে তা হলে বড় ভুগে উঠলে তো তুমি।'

শুভেন্দু বললো: 'দেহ থাকলে ব্যাধি মাঝে মাঝে আসবেই স্যার, কিন্তু এবারে আমাকে বড় দুর্বল করেছে। এ্যাদ্দিন ফ্লুর কথা শুনছিলাম, বুঝতে পারিনি, এবারে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম।'

ভিতরে আহ্বান করে নীলাদ্রি বললো: 'এস, বসবে এস।'

শুভেন্দু বললো: 'ভাবচি, সকাল সকাল বাড়ি চলে যাবো। আপনাকে দেখবার লোভ সামলাতে পারছিলাম না, তাই—'

বাধা দিয়ে নীলাদ্রি বললো, 'হাতে যখন আজ আর ফাইলপত্র বিশেষ কিছু দেখছি না, তখন কাজ বোধকরি তেমন একটা নেই। তা—এখান থেকে বেলঘরিয়ায় যেতে কতক্ষণই বা লাগবে! শরীর যা হয়েছে, তাতে তোমার রেস্ট নেওয়া উচিত।'

নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিয়ে শুভেন্দু বললো, 'যেদিন থেকে কলেজের পড়া বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে আমার আর রেস্ট নেই স্যার।'

এবারে কেমন একবার বিস্ময়ের চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকালো নীলাদ্রি : 'সে কি, তুমি তবে কলেজেও পড়েছিলে ?'

'ডাকপিয়নী করি, বিশ্বাস না হবারই কথা।' ক্লান্ত কণ্ঠে শুভেন্দু বললে, 'এসব চাকরির জন্যে বড় জোর ম্যাট্রিকুলেশনই যথেষ্ট। কিন্তু ভাগ্যদোষে আমি আর একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। আজ দেখচি, আমার মতো অনেকেই আছে।'

'কোন্ ইয়ারে উঠে তুমি পড়া ছাড়লে ?'

'আজ্ঞে থার্ড ইয়ারে।'

'বলো কি !' আর একবার বিস্ময়ে থেমে গেল নীলাদ্রির কণ্ঠ ; কিন্তু তার পরেই গলার স্বর অনেকখানি শান্ত হয়ে এলো। বললো, 'থার্ড ইয়ারে উঠে তোমার পড়া আর তবে হলো না ?'

'না স্যার। শুধু পড়া নয়, আমার স্বপ্ন দেখাও শেষ হলো।' থেমে শুভেন্দু বললো, 'একমাত্র বোন নির্মলা বছরখানেক স্বামীর ঘর করে বিধবা হয়ে এলো, বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে চোখ বুজলেন, নতুন মাও সব ফেলে রেখে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। নির্মলাকে নিয়ে একা দাঁড়াই কোথায় তখন ? ভুলে গেলাম যে—মামুদপুরের মণ্ডলদের আমি জ্ঞাতি। চুকে গেল কলেজের পড়া। দেশ স্বাধীন হলো, হিন্দুরা পালাতে শুরু করলো পাকিস্তান থেকে, নির্মলাকে নিয়ে আমিও পালিয়ে এলাম এখানে, জায়গা পেলাম বেলঘরিয়ায়। তারপর কত চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এই চাকরি।'

নির্বাক দৃষ্টিতে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল নীলাদ্রি শুভেন্দুর মুখের দিকে। এবারে জিজ্ঞেস করলো : 'তুমি বিয়ে করেছ ?'

মাথা নিচু করে সলজ্জে শুভেন্দু বললো : 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। একটি ছেলেও আছে। তার অসুখ নিয়েও এতদিন বড় ঝামেলায় কাটলো।'

নীলাদ্রি বললো : 'এসব এ্যাদ্দিন কিছুই তো শুনিনি। সংসারে তাহলে তোমরা চারটি প্রাণী ?'

'আজ্ঞে, আপাতত চারটিই।' শুভেন্দু বললো, 'বাবার ইচ্ছে ছিল নির্মলাকে আবার বিয়ে দেন। সেরকম কোন উপযুক্ত ছেলে পেলে ভাবচি বিয়েটা দিয়েই দেবো। জীবনের সাধ-আহ্লাদ থেকে ও যে একেবারেই বঞ্চিত। আপাতত একটি ছেলেকে দেখছি, জানি না শেষ পর্যন্ত কাজ হবে কিনা!'

'দেখ না, ভালোই তো।' থেমে নীলাদ্রি বললো, 'অনেকটা তাহলে তুমি হাল্কা হতে পারবে।'

শুভেন্দু বললো, 'হাল্কা বোধ করি আর কোনোকালেই হতে পারবো না স্যার। কি সামান্য মাইনে পাই, তাই দিয়ে গোটা সংসারটাকে কোনো রকমে ঠেলে নিয়ে চলতে হচ্ছে। এইজন্যেই ভেবেছিলাম বিয়ে করবো না। কিন্তু না করে উপায় ছিল না, নির্মলার পক্ষে একা ঘরে কাটানো কঠিন ছিল।'

নীলাদ্রি বললো, 'না, না, ভালোই করেছ বিয়ে করে। প্রত্যেকটি সক্ষম পুরুষেরই উচিত বিয়ে করে সংসারী হওয়া। আর বিয়েটা তো আসলে বিয়ে নয়, নতুন জীবন গ্রহণের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠা। বিয়ে না করলে বলতাম—তুমি ইম্‌পারফেক্ট থেকে গেছ।'

'তা হলে সংসারে যারা বিয়ে করেনি, তারা সকলেই ইম্‌পারফেক্ট বলতে চান?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এবারে নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু পুনরায় বললো, 'স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—তাঁরাও তবে ইম্‌পারফেক্ট?'

'একদিক থেকে তাঁরা সত্যিই ইম্‌পারফেক্ট।' নীলাদ্রি বললো, 'কিন্তু সাধকের পারফেক্‌শন আর সাধারণের পারফেকশন এক বস্তু নয়। আমাদের মতো সাধারণ জীবনের সঙ্গে তাঁদের কমপেয়ার করা চলে না।' তারপর একটু থেমে নীলাদ্রি বললো, 'তা যাক, আজ তুমি কিছু মুখে দিয়ে তবে যাবে; খালিমুখে উঠে যেতে পারবে না।'

শুভেন্দু বললো, 'চা খাওয়ার অভ্যাস যে আমার নেই, তা তো

আপনি জানেনই স্যার। তা ছাড়া আপনার ঘরে কিছু মুখে দেওয়া, সে যে আমার পুজোর প্রসাদ পাবারই শামিল। তার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না স্যার।'

'না, না, তা কি হয়! তোমার শরীর ভালো নয়, এই শরীর নিয়ে বেলা করে গিয়ে খাবে, তাতে যে শরীর আরও খারাপ হবে! তুমি বসো, আমি এক্ষুনি আসচি।' বলে বাড়ির ভিতরে উঠে গেল নীলাদ্রি; তারপর একটু বাদেই আবার ফিরে এসে নিজের আসনে বসে বললো, 'তোমাকে আর একটুও দেরি করাবো না শুভেন্দু, এক্ষুনি ছেড়ে দেবো। তা—সেদিন তুমি তোমার পাঠ্যজীবনের বাতিকের কথা বলছিলে না, এখনও যদি সে বাতিক থাকে, তবে লিখতে পার মাঝে মাঝে। তাতে আর কিছু না হোক অন্তত দৈনন্দিন কর্মজীবনের একঘেয়েমি কিছু কাটে, পৃথিবীকে মৃত বলে মনে হয় না, ইচ্ছে হয় সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতে।'

সহজ হতে চেষ্টা ক'রে শুভেন্দু আবেগমিশ্রিত অথচ ধীরকণ্ঠে বললো, 'অনেক আশা ছিল, অনেক ইচ্ছে ছিল, অনেক স্বপ্ন ছিল জীবনে, কিন্তু সব স্বপ্নই কি জীবনে সার্থক হয়! তা বোধকার কারুরই হয় না, আমারও হয়নি। আজ যা করছি, এও তো জীবনের মস্ত বড় লেখা! আজ আর বাতিক নেই, জীবনটা আজ আমার কাছে সত্য, বাতিক ছেড়ে তাই বোধকরি সাত্ত্বিক হয়ে উঠেছি!'

কিন্তু একথার জবাব আর নীলাদ্রিকে দিতে হলো না। তার আগেই হাতে এক ডিস চিঁড়ের মিষ্টি খাবার আর জলের গ্লাস নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো সুভদ্রা, তারপর শুভেন্দুর সামনে নামিয়ে রেখে বললো, 'বেশী কিছু করতে পারলুম না, সামান্য একটু চিঁড়ে।'

মাথা তুলে শুভেন্দু বললো, 'এই কি কম! তার চাইতেও বেশী আপনাদের স্নেহ। জীবনে মাকে হারিয়েছি, ঘরের বড় ছেলে বলে বৌদি বলে কাউকে পাইনি, একটা দিদি পর্যন্ত মাথার উপর নেই।

সেই তিনজনের অভাব একা আপনার স্নেহে ভুলে যেতে হয়।'

শুনে সুভদ্রা হঠাৎ বড় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো, বললো, 'না, না, সে কি, আমি আজ পর্যন্ত কি করতে পেরেছি। এভাবে বলে আমাকে মিছিমিছি অপ্রস্তুত করা।'

নীলাদ্রি বললো, 'বেশ তো, শুভেন্দু তোমার মধ্যে যদি কিছু স্নেহের স্পর্শ পেয়েই থাকে, তাতে তোমার অপ্রস্তুত হবার কি আছে!'

সুভদ্রা এবারে কিছু একটাও না বলতে পেরে কিছুক্ষণ কেমন আবেশবিহ্বল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর 'যাই, ওদিকে আমার সব কাজ বাকী পড়ে আছে', বলে পুনরায় বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

বাইরে বেলার দিকে তাকিয়ে শুভেন্দুও আর বিশেষ বসলো না, চিঁড়ের ডিস খালি করে উঠে পড়ে বললো, 'আপনার সোমনাথ আমার চাইতে উঁচু ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি, কিন্তু সে আরও বেশী ভাগ্যহত যে, আমার মতো সে আপনার স্নেহটুকু পায়নি। যদি পেতো তবে হয়তো তার হতভাগ্য জীবনে কিছু সান্ত্বনা থাকতো।'

নীলাদ্রি বললো, 'তুমি দেখছি সোমনাথকে কিছুতেই ভুলতে পারোনি। কিন্তু জানো তো, সংসারে যার যেখানে স্থান, তার বাইরে তাকে টেনে আনাও যেমন কঠিন, তেমনি যে যেটুকুর অধিকারী, তাকে তার বেশী দেয়াও তেমনি কঠিন। সোমনাথ যেটুকু পেয়েছে, তার বেশী তার পাবার ছিল না।'

'হয়তো ছিল, কিন্তু তা নিয়ে আজ আর কিছু বলে লাভ নেই।' বলে এবারে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়ে দিল শুভেন্দু, বললো, 'আসি স্যার এখন। আপনার কথামতো আপনার ম্যাগাজিনগুলো আমাদের লাইব্রেরিতেই দিয়ে দিয়েছি। মেম্বারদের তাতে অনেক উপকার হয়েছে।'

নীলাদ্রি বললো, 'বেশ তো, আবার কখনও এসে কিছু নিয়ে যেয়ো। আমি বেছে রাখবো।'

'তাই আসবো।' বলে সোজা এবারে পথে বেরিয়ে পড়লো শুভেন্দু।

সেদিন রাত্রে এসে বিছানায় শুয়ে টুটুলকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বীণা বললো, 'বুঝলে, ঠাকুরঝিকে বলেছিলাম রাখালের মাকে একদিন আমাদের এখানে নিয়ে আসতে।'

বালিশে মুখ রেখেই শুভেন্দু জিজ্ঞেস করলো, 'তা—কবে আনবে বললো?'

বীণা বললো, 'আনবে কি! তাঁকে নিয়ে রাখাল নাকি কাশী না কোথায় গেছে, কবে ফিরবে, তার কিছু ঠিক নেই।'

চোখ বুজেই শুভেন্দু বললো, 'তা হলে তোমার ইচ্ছেটা আপাতত চাপা থেকে গেল।'

'তাই তো দেখছি।' থেমে বীণা বললো, 'ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞেস করলাম—ঠিক করে বলো তো ঠাকুরঝি, তোমার সত্যিই আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে আছে কি না! উত্তরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঠাকুরঝি বললো, কি সব যা-তা বকছো, তোমার মুখে আর কি কোনো কথা নেই? বললাম—কথা কেন থাকবে না, কিন্তু তোমার কথা ভেবে ভেবে যে একটা রাত্রিরও আমার ঘুম হয় না। তাতে ঠাকুরঝি বলে কি জানো, বলে—এতই যদি দরদ, তবে দাও না আমাকে কোথাও পাঠিয়ে। কত আশ্রম আছে, হাসপাতাল আছে, কিছু একটা করতে পারলে আমিও যে নিশ্চিন্তে রাতটুকু ঘুমোতে পারি। বললাম—রাখালরাজের আশ্রমটা তোমার নিশ্চয়ই অপছন্দ নয়, সেখানে বোধকরি কিছু-একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হবে না। ওরা ফিরে এলে বলো তো আমিই কথা বলে কাজটা ঠিক করে নিই তোমার জন্যে। উত্তরে ঠাকুরঝি কিছুক্ষণ নীরবে

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বললো—ওরা ফিরে এলে দেখা যাবে। তারপর ছুটে কোথায় একদিকে চলে গেল, আর কিছু জিজ্ঞেস করা হলো না ঠাকুরঝিকে।'

শুভেন্দু বললো, 'বোঝা যাচ্ছে—ওর ইচ্ছে আছে, নইলে অন্য কিছু বলে নির্মলা তোমাকে থামিয়ে দিতো। এখন অপেক্ষা করে দেখ—ওরা কবে নাগাদ ফেরে!'

বীণা বললো, 'কিন্তু রাখাল ছাড়া পাত্র নেই, এই বা কেমন! তুমি পাঁচদিকে ঘোরো, পাঁচরকম লোকের সঙ্গে মেশো, একটু এদিকে-ওদিকে চেষ্টা করে দেখতে পারো না?'

'পারি বৈ কি, কিন্তু সেরকম করে দেখতে গেলে যে পরিমাণ টাকার দরকার, সে টাকা কোথায়!' থেমে শুভেন্দু বললো, 'এসব কথা এখন থাক্, এস, এবারে ঘুমোই।'

কথা রাখলো বীণা। রাত কম হয়নি। তাড়াতাড়ি না ঘুমোলে ওদিকে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যাবে। দেরি হলে আপত্তি ছিল না—যদি না শুভেন্দুর এ ধরনের চাকরি থাকতো। সেই কোন্ ভোরে-ভোরে উঠে কিছু-না-কিছু খাবার করে দিয়ে স্বামীকে কাজে বের করে দেয় বীণা। সপ্তাহের কোনো একটা দিনও যদি এর নড়চড় হয়? সারা বছরে তিন দিন না চারদিন শুধু ছুটি, সেই দিন কটা উৎসবের দিন বলে মনে হয় তার কাছে, বাকী বারো মাস ঘানিতে জোড়া বলদের মতো একই নিয়মে তাকে এ সংসারের চাকা ঠেলে চলতে হয়। প্রথম প্রথম কষ্ট হতো, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন আর কষ্টকে কষ্ট বলে বোধ হয় না; মনে হয়—এটুকু না করলে সে তবে কিসের জন্যে এ সংসারে আছে!—এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই স্বামীর গলা জড়িয়ে সে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

দিন কয়েক বাদে সেদিন বিকেলের দিকে স্কুল আর লাইব্রেরির একটা সংযুক্ত মিটিং বসলো লাইব্রেরিঘরের সামনে। যারা প্রধান

কর্মী, সেই নকুল বিশ্বাস, প্রাণকৃষ্ণ বরাট আর শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী আগে থেকেই মিটিংয়ের এজেণ্ডা ঠিক করে রেখেছিল। শুভেন্দুর তা অজানা ছিল না। এবারে মহেন্দ্র ভাণ্ডারীকে দিয়েই সে প্রস্তাব তুললো—ফ্রি প্রাইমারী থেকে এই স্কুল যাতে অবিলম্বে সেকেণ্ডারীতে রূপান্তরিত হয়ে মাল্টি-পারপাসে রূপ পেতে পারে, তার জন্যে এখানকার সমস্ত অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। দেশের শিক্ষানীতি ক্রমেই বদলে যাচ্ছে, এর পর দেরি করলে আমাদের উত্তর-পুরুষের অপূরণীয় ক্ষতি কোনো কিছু দিয়েই পূর্ণ হবে না।—এই নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে নানা রকম তর্ক-আলোচনা দেখা দিল, এবং কেউ কেউ এর সমর্থনে হাত তুলে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। নকুল আর প্রাণকৃষ্ণ লাইব্রেরির উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করে ঘোষণা করে বললো, 'আগামী শ্রীপঞ্চমীতে আমরা এবার এই প্রথম সারস্বত সম্মেলন আহ্বান করে বিভিন্ন খ্যাতিমান শিল্পী-সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছি। আমাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শুভেন্দুদা আমাদের আশা দিয়েছেন—সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে কথাশিল্পী নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়কে তিনি আমাদের মধ্যে আনতে পারবেন। আশাকরি আপনাদের সমবেত উৎসাহ এই সম্মেলনকে সার্থক করে তুলবে।'

চারদিক থেকে এবারে করতালির শব্দ ফেটে পড়লো। সর্বহারা কলোনীতে এমন প্রাণের স্পর্শ যে অভিনব। যুবকেরা সঙ্গে সঙ্গেই মেতে উঠলো। কুমোর লক্ষ্মীকান্ত দাস নিজের জাতব্যবসা ফেলে এখানে এসে বাঁশের কারবারে মন দিয়েছিল; কথাবার্তা শুনে সে বললো, 'পুজোয় সরস্বতী প্রতিমার জন্যে আপনাদের খরচা করতে হবে না, আমি নিজের হাতে মানুষের সমান উঁচু প্রতিমা গড়িয়ে দেবো আপনাদের; আপনারা বরং অন্যদিকের ব্যবস্থা করুন।'

সেই ব্যবস্থাতেই এবারে সবাই মিলে উঠে-পড়ে লাগলো। আগে শুভেন্দুর হাতে এতটুকুও সময় থাকতো না, এবারে সে

স্নান-খাওয়া অবধি ভুলতে বসলো। সকালটা যদি চাকরিতে না বেরোতে হতো, ভালো হতো, কিন্তু উপায় নেই। বাকী সময়টা নিয়ে সে যে কী করবে, বুঝে উঠলো না। বিশেষত একটা পক্ষকালও আর বাকী নেই শ্রীপঞ্চমীর। এর মধ্যে টাকা তোলা, পুজোর ব্যবস্থা করা, চিঠি ছাপা, প্যাণ্ডেল বাঁধা—কত কাজ!

সেই কাজের স্রোতেই একে একে প্রায় দিন দশেক কেটে গেল। এই দশ দিনের মধ্যে ঘরে বসে নিশ্চিন্তমনে টুটুলকে অবধি দু'দণ্ড কোলে নিয়ে আদর করতে পারেনি শুভেন্দু। সকালে বীট কম থাকলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে, অন্যান্য দিনের মতো নীলাদ্রির দরজায় দাঁড়িয়ে বা তার ঘরে বসে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটায়নি। তাতে যে ভালো লেগেছে, তা নয়, কিন্তু সময়ের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংবরণ করে নিতে হয়েছে। কিন্তু চিঠিপত্র না থাকলেও এবং কাজের তাড়া থাকলেও এরই মধ্যে আর-একদিন গিয়ে নীলাদ্রির দরজায় দাঁড়াতে হলো তাকে সম্মেলনের খবর নিয়ে।

শুনে নীলাদ্রি বললো, 'বলো কি, দেশে এত গণ্যমান্য লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত আমাকে তোমরা সভাপতি ঠিক করলে?'

বিনয় প্রকাশ করে শুভেন্দু বললো, 'এটা আইন বা রাজনৈতিক সম্মেলন নয় যে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার বা কোনো মন্ত্রী-উপমন্ত্রীকে সভাপতি করে আনবো! সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আপনার মতো বিশিষ্ট সাহিত্যিককেই আমাদের প্রয়োজন। এতদিন ঘরোয়া অধিবেশন আমরা অনেক করেছি, এবারে আপনাকে পাবো বলেই আমরা সম্মেলনের আয়োজন করছি। আপনাকে যেতেই হবে স্যার। কোনো অসুবিধে হবে না। সকালে এসে আমি নিয়ে যাবো, আপনার দুপুরের খাওয়া সেদিন আমার ওখানেই হবে; সন্ধ্যার দিকে মিটিং ভেঙে গেলে আপনাকে স্টেশনে এসে গাড়িতে তুলে দেবো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীলাদ্রি বললো, 'কিন্তু এরকম পাগলামি আবার শুরু করলে কেন, বলো তো ?'

'একে আপনি পাগলামি বলবেন স্যার ?' থেমে শুভেন্দু বললো, 'আমরা বাস্তুহীন বলে কি কালচারও খুইয়েছি ? আর কালচারই যদি না রইল, তবে বেঁচে থাকাটাই যে আমাদের নিরর্থক ! সেই কালচারকে বাঁচিয়ে রাখতেই যে ভিক্ষে করে লাইব্রেরি করলাম, স্কুল করলাম ! আপনার মতো দরদী শিল্পীদের পায়ের ধুলো পড়লে তবে তো প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে উঠবে।'

লজ্জায় এবারে এতটুকু হয়ে গেল নীলাদ্রি। বললো, 'ছিঃ, ছিঃ, ও কথা কেন। তোমার ফাংশনে আমি যাবো না, সে কি হতে পারে ? তুমি এসো, আমি তৈরী থাকবো।'

শুনে খুশিতে বুকখানি এবারে ভরে গেল শুভেন্দুর। বললো, 'একথা আমাদের ওখানকার লোকেরা যখন শুনবে, তখন কত খুশি হবে তারা, আপনি ভাবতেই পারবেন না স্যার।' তারপর বিদায় নিয়ে বললো, 'এর মধ্যে দরকার মতো আসি তো দেখা হবে, নইলে সোজা একেবারে শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালে এসেই উপস্থিত হবো। আমাদের ওখানে পুজো দেখে প্রসাদ নিয়ে তবে খেতে বসবেন।'

হেসে নীলাদ্রি বললো, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।'

আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে সোজা এসে এবারে গাড়ি ধরলো শুভেন্দু।...

এমনি করে আরও দিন দুয়েক কেটে যাবার পর সেদিন দুপুরে তার ঘরে যা না হবার, তাই হলো।—

কুমারীর মতো থাকলেও কিছু বা লোকনিন্দার ভয়ে, আর কিছু বা সংস্কারের বশে এতকাল স্বপাকে স্বতন্ত্র হবিষ্যান্নেই কাটিয়েছে নির্মলা। কিন্তু কদিন ধরে হঠাৎ তার সব কিছুতে কেমন যেন অরুচি দেখা দিল। যা কিছু মুখের সামনে তুলে ধরে তাতেই যেন কেমন বিশ্রী গন্ধ বোধ করে। বীণা যে এটা লক্ষ্য না করেছিল,

এমন নয়। অনেক সময় এই থেকে অনেক রকম কঠিন অসুখও হতে পারে। কথাটা তাই সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে জানাতে চেয়েছিল বীণা ; কিন্তু শুভেন্দুকে একমুহূর্তও যদি সুস্থ অবস্থায় কাছে পেয়েছে সে! পোস্টাফিসের কাজ থেকে ফিরে এসে বাড়িতে ভালো করে দু'গ্রাস ভাতও মুখে দেয় না শুভেন্দু। শুধু স্কুল, লাইব্রেরি আর লোকের পিছনে ধাওয়া। এই মানুষকে ঘরের কথা কি করে বুঝিয়ে বলবে বীণা!—এইভাবেই কদিন কাটছিল। কিন্তু সেদিন দুপুরে কোনোরকমে একগ্রাস ভাত মুখে নিয়েই উঠে গিয়ে নির্মলা যখন গল্-গল্ করে বমি করে অস্থির হয়ে পড়লো, তখন চোখ কপালে উঠলো বীণার। সে কি! এ তো সে যা ভেবেছিল, তা নয়। এ তো অসুখ হবার লক্ষণ নয়, এ যে মা হবার পূর্বাভাস! টুটুল হবার আগে বীণারও যে এমনিই হতো। একটু একটু করে মনে করতে লাগলো বীণা। হ্যাঁ, ঠিক এমনিই হতো ; এমনি অরুচি, এমনি সবকিছুতেই কেমন বিস্বাদ গন্ধ, এমনি করে মুখে কিছু নিলেই উগরে বমি কবে ফেলতো সে। তার লক্ষণগুলির সঙ্গে ঠাকুরঝির লক্ষণগুলি যে একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু টুটুলের তো বাবা আছে! স্বামী বর্তমানে বীণার অমন লক্ষণে সন্তানের স্বপ্নে মন ভরে উঠেছিল দু'জনের। কিন্তু ঠাকুরঝি? এতকাল বৈধব্য জীবন যাপনের পর এ আজ তার কি হলো, এ কি করে সম্ভব হলো তার জীবনে? তবে কি নির্মলা তার অতৃপ্ত যৌবনের সাধ মেটাতেই রাখালের সঙ্গে মিশেছিল? তাই কি রাখাল তার মন জয়ের নানা জাল বিস্তার করে তাকে তাদের ঘরে আকর্ষণ করেছিল? উপলক্ষ ছিল রাখালের মা, কিন্তু লক্ষ্য ছিল রাখাল। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ আজ কি হলো তাদের ঘরে? এ যদি সত্যি হয় তবে বীণা আর শুভেন্দুই বা মানুষের কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

শুভেন্দু বাড়ি নেই, টুটুল বিছানায় শুয়ে আপন মনে খেলা করছে।

উঠে এবারে নির্মলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো বীণা।

নির্মলা বললো, 'বৌদি, আমাকে একটু ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও তো। মাথাটা ঘোরাচ্ছে, শরীরটা বড্ড অস্থির করছে।'

বীণা তাই করলো। তারপর মিনিট কয়েক কেটে গেলে একসময় জিজ্ঞেস করলো: 'এতদিন তুমি কি কিছুই বুঝতে পারোনি ঠাকুরঝি?'

নিমীলিত চোখে মাথা ছুলিয়ে নির্মলা জানালো: 'না।'

বীণার অনেক প্রশ্ন মুখে এসেছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে তার নিজেরই লজ্জা বোধ হচ্ছিল। এবারে তাই স্থির হয়ে কিছুক্ষণ সে নির্মলার শিয়রে বসলো।

একটু পরে নিজে থেকেই চোখ মেললো নির্মলা, তারপর বীণার চোখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, 'এরপর তোমার মনে কি কি প্রশ্ন জাগা উচিত এবং আমাকে কি কি জিজ্ঞেস করবে, তা আমি জানি বৌদি।'

'কি জানো?' অধীর চোখ ছুটোকে এবারে স্থির করলো বীণা।

নির্মলা এতটুকুও সঙ্কোচ করলো না, বললো, 'জানি, আমার যা হয়েছে, তা যারা মা হতে যায়, তাদেরই শুধু হয়। আমার অদৃষ্টে যে এমন হবে, আমি ভাবতে পারিনি বৌদি।' বলতে গিয়ে এবারে কেঁদে ফেললো নির্মলা, তারপর বীণার একখানি হাত শক্ত করে নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বললো, 'তুমি বিশ্বাস করো বৌদি, আমার নিজের ইচ্ছেয় আজ এসব কিছু হয়নি। ভেবেছিলাম— সময় এলে একদিন তোমাকে সব কথাই খুলে বলবো। তোমাকে না বললে কাকে বলবো বলো? রাখাল কথা দিয়েছিল—আমাকে সে গ্রহণ করবে। আমি তার কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম—এতদিন সে শুধু আমাকে নিয়ে খেলেছেই, তারপর যখন খেলা ফুরলো, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সে তার মাকে নিয়ে এখান থেকে পালালো।'

বীণা বললো, 'কেন, এই না সে তার মাকে নিয়ে কাশী গেছে শুনেছিলাম।'

'আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু আজ আর করি না।' নির্মলা বললো, 'আমি বুঝে নিয়েছি—সে আর এখানে ফিরে আসবে না ; হয়তো সে কাশীও যায়নি, আর কোথাও চলে গেছে—যার খবর এখানকার কেউ রাখে না।'

'তুমি তবে এই লোককে বিশ্বাস করে তোমার নিজেকে দিয়েছিলে ঠাকুরঝি ?' চোখের মণি দুটো যেন একবিন্দু থেকে আর একটুও কোনোদিকে নড়লো না বীণার।

নির্মলা বললো, 'এ আমার নিয়তি, এর বাইরে আমার কিছু করবার ছিল না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি বৌদি, এ কথা দাদা জানবার আগে তুমি আমার একটা উপকার করো। কোথাও থেকে একটু বিষ এনে দাও, আমি খেয়ে চোখ বুজি।' বলে এবারে দুহাতে বীণাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠলো নির্মলা।

কি একটা বলবে ভাবছিল বীণা, ইতিমধ্যে পাশের ঘরে আপন মনে খেলতে খেলতে কখন উঠে হামা দিতে গিয়ে তক্তপোশ থেকে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো টুটুল। সঙ্গে সঙ্গে নির্মলাকে ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে টুটুলকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো বীণা। কিন্তু টুটুলকে শান্ত করতে গিয়ে টুটুলের দিকে মন রইল না তার। এতক্ষণ সে যেন একটা অভাবনীয় সবাকচিত্র দেখে সবেমাত্র উঠে এসেছে, এবং তার রেশ যেন কিছুতেই মন থেকে কাটছে না,—এমনি একটা মানসিকতায় সারা মন অনবরত দুলতে লাগলো। শুভেন্দু ঘরে ফিরলে তাকেও যে মুখ ফুটে এতবড় কঠিন কথাটা বুঝিয়ে বলা যাবে না! বললেই বা এর সমাধান কি ? ক্রমে লোক-জানাজানি হলে এখানে আর তারা একটা দিনও তিষ্ঠোতে পারবে না। টুটুলকে বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে যতই ঘুরে ফিরে কথাগুলি তার মনে আসতে লাগলো, ততই যেন কেমন দারুণ

একটা অস্থিরতায় নিজের মধ্যে কেবলই সে পাক খেয়ে উঠতে লাগলো।

বাইরের কাজ শেষ করে শুভেন্দুর ফিরতে অনেক রাত হলো। সে যে দূরে ছিল এমন নয়। কলোনীর মধ্যেই এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে হচ্ছিল তাকে। যখন ঘরে ফিরলো, ক্লান্তিতে ইচ্ছে হলো শুয়ে পড়ে। ফ্লু থেকে উঠে অবধি শরীর তার ভালো করে শোধরায় নি। তার ওপর এই অমানুষিক পরিশ্রম। সে জানে, স্কুল বা লাইব্রেরির আর যারা—তারা সবাই কলের মানুষ, সুইচ টিপলে তবে তারা চলে। সেই সুইচ হলো শুভেন্দু। সে নিষ্ক্রিয় হলে সবাই এখানে নিষ্ক্রিয়। অথচ কোনো কিছু গড়ে তুলতে হলে সেখানে নিষ্ক্রিয়তার কোনো প্রশ্ন নেই। চাই উদ্যম, উৎসাহ আর কাজ। সেই কাজ করে করে নিজেকে নিয়ে আর পেরে উঠছে না শুভেন্দু। তবু যদি স্কুলটা বড় হয়ে ওঠে, লাইব্রেরিটা মাথা তুলে দাঁড়ায়, তবে আজকের এই গোলামী জীবনের স্বপ্ন তার সার্থক হয়ে উঠবে।

ঘরে এসে ঘুমন্ত টুটুলের গালে একবার চুম্বন করে তার পাশেই অল্পক্ষণের জন্যে কাত হয়ে শুয়ে পড়লো শুভেন্দু।

বীণা বললো, 'হাত মুখ ধুয়ে এসে খাবে তো ?

সে কথার সোজা জবাব না দিয়ে শুভেন্দু বললো, 'ফাংশনটা চুকে গেলে শ্বাস ফেলে বাঁচি। এভাবে দৌড়োদৌড়ি করে আর পারছি না।'

বীণা বললো, 'আমি কেবল ভাবছি—তুমি আবার অসুখে না পড়ো !'

'না, না, ভেবো না, তোমার বিছানায় আমি আর শিগগির রোগ আনবো না।' থেমে শুভেন্দু বললো, 'তবে কি জানো, অসুখ থেকে ওঠার পর ইদানীং কেমন যেন অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অথচ আগে আমার এরকম শরীর ছিল না, অসম্ভব খাটতে পারতাম, উৎসাহও পেতাম তেমনি খাটতে।'

এবারে সাদরে স্বামীর গায়ের উপর দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বীণা বললো, 'চলো, হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নিয়ে একেবারে শুয়ে পড়বে।'

'তাই চলো।' বলে এবারে উঠে পড়লো শুভেন্দু। তারপর বীণার কথামতই একসময় এসে পাতা-বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো সে। ঘুম আসতেও দেরি হলো না, কিন্তু বীণার দু'চোখে আজ আর ঘুমের দেখা নেই। সে জানে—শুভেন্দুর এখন ঘুমোবার দরকার, নইলে ভোরে উঠে সে কাজে বেরোতে পারবে না, তবু তার ইচ্ছে হলো না যে শুভেন্দু ঘুমোয়। নানা অছিলায় কেবলই সে তাকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করলো।

হাই তুলে শুভেন্দু বললো, 'কি গো, আজ তোমার কি হলো, ঘুমোবে না?'

এতটুকুও দ্বিধা না করে এবারে বীণা বললো, 'ঠাকুরঝি যা কাণ্ড বাধিয়ে নিয়েছে, তা শুনলে তোমারও ঘুম আসবে না!'

স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করলো শুভেন্দু: 'কেন, কি আবার কাণ্ড বাধালো নির্মলা?'

সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টা বীণা মুখে আনতে পারলো না। বললো, 'ঠাকুরঝির কাছে শুনলাম—রাখাল নাকি তার মাকে নিয়ে কাশী যায়নি, এখান থেকে পালিয়েছে; কোথায় গেছে, কেউ জানে না, এমন কি ঠাকুরঝিও না।'

আর একবার হাই তুলে শুভেন্দু বললো, 'এমন ছেলের সঙ্গে তবে নির্মলার সম্বন্ধ না এনে ভালই হয়েছে। এই জন্যেই আগে থেকে রাখাল সম্পর্কে একটু ভালো করে খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম।'

অনুচ্চকণ্ঠে বীণা বললো, 'কিন্তু খোঁজখবর নেবার আগেই যে সে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে গেল! নিজের বোনকে নিয়ে এখন দাঁড়াবে কোথায়, বলো?'

'মানে? কি বলছো তুমি, কিছু বুঝতে পারছি না যে?'

'এখনও যদি কিছু না বোঝো, তবে আর বুঝবে কবে?' বীণা বললো, 'রাখাল পালিয়ে বেঁচেছে, কিন্তু তার সন্তান যে ঠাকুরঝির পেটে, সে বাঁচবে কি নিয়ে?'

শুনে সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে উঠে বসে পড়লো শুভেন্দু, বললো, 'কি বললে? নির্মলা অন্তঃসত্ত্বা? নির্মলা তবে মা হতে যাচ্ছে? রাখাল'—কিন্তু আর কিছু বলতে পারলো না শুভেন্দু। ক্লান্ত শরীরটা হঠাৎ তার কেমন ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠলো।

বীণা এবারে দুপুরের আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বললো, 'এতদিন তুমিও কিছু বলো নি, আমিও ঠাকুরঝির চলাফেরায় কখনও নাক গলাতে যাইনি। বরং রাখালকে আমরা আত্মীয় করেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তার পরিণতি যে এই হবে, কে ভেবেছিল? এবারে কি উপায় হবে, বলো?'

শুভেন্দু বললো, 'নির্মলা বুঝতে পারেনি, তাই তোমার কাছে বিষ চেয়েছে। সে বিষ নির্মলার জন্যে নয়, দরকার আমার জন্যে। আমার যে এর পর আর কারুর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পথ রইল না। থানায় গিয়ে যে সব খবর জানিয়ে ডায়েরী করে আসবো, তারই বা উপায় কি! সঙ্গে সঙ্গে যে লোক জানাজানি হয়ে যাবে; এখানে যে নির্মলাকে রাখবো, তারও তো কোনো উপায় নেই। উঃ, এ আমাকে আজ তুমি কী সংবাদ দিলে বীণা?'

স্বামীর সঙ্গে বীণাও বিছানার উপর উঠে বসেছিল, এবারে তার মুখে একটি কথাও ফুটলো না।

নিজের ঘরে শুয়ে তখন হয়তো ঘুমের মধ্যে নানা দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝে মাঝেই শিউরে উঠছে নির্মলা! শিউরে উঠে আপন মনেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

অল্পক্ষণ পরে স্বগতোক্তির কণ্ঠে শুভেন্দু বললো, 'আমার চিরকালের আদরের বোন নির্মলা। চিরকাল সুখে দুঃখে একসঙ্গে দুজনে মানুষ হয়েছিলাম। জানতাম—জীবনে বহু আকাঙ্ক্ষা থেকে

ও বঞ্চিত। ওকে তাই সুখী করতেই চেয়েছিলাম। তার বদলে আজ ও নিজে থেকেই দুঃখের ঝড় ডেকে আনলো। সেই ঝড়ে আমাকেও ও পিষে দিল। এদিকে নানা কাজের বোঝায় মাথা ভারী হয়ে আছে; এখন কি দিয়ে যে কি করবো, কিছুই যে মাথায় আনতে পারছি না।

ধীরকণ্ঠে বীণা বললো, 'তোমাকে জানানো দরকার বলে তোমাকে বিব্রত করলাম, নইলে এভাবে এখন তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করতাম না। এস, এবারে ঘুমোই, যা ভাববার কাল ভেবো। এখন রাত জেগে কালকের সকালটাকে তাই বলে ক্ষতি করে লাভ নেই। নাও, শুয়ে পড়ো।' বলে স্বামীকে আকর্ষণ করে নিজেও পুনরায় শুয়ে পড়লো বীণা।

আপন মনেই শুভেন্দু একবার উচ্চারণ করলো: 'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, শেষ পর্যন্ত এই ছিল কপালে!' তারপর সারা রাত্রির মতো থেমে গেল শুভেন্দু।

রাত্রিটা যে ঘুমিয়ে কাটলো শুভেন্দুর, এমন নয়। মাঝে মাঝে তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে এসেছে, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো একটানা ঘুমে ভোর হলো না। ভোর হবার আগেই তাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো শুভেন্দু। ভাবলো—বীণাকে এখনই ডেকে কাজ নেই, আর একটু ঘুমোক, ততক্ষণে নিজে সে কাজে বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নেবে। কিন্তু পারলো না, বীণার পাতলা ঘুম অল্পতেই ভেঙে গেল। জিজ্ঞেস করলো: 'এখনও বোধ করি ভালো ফর্সা হয়নি, তাই না?'

শুভেন্দু বললো, 'প্রায় হয়ে এলো।'

আড়ামোড়া ভেঙে বীণা জিজ্ঞেস করলো: 'আজ যে এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে তুমি?'

'ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল, তাই।' শুভেন্দু বললো, 'প্রায়ই তো বেরোতে দেরি হয়, আজ একটু সকাল-সকালই বেরিয়ে পড়ি।'

বীণার মুখে এবারে কথা শোনা গেল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাসের আভাস পাওয়া গেল।

শুভেন্দু আর অপেক্ষা না করে দরজা খুলে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে এলো। দেখলো বীণা এতক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে হেঁশেলে গিয়ে ঢুকেছে।

অন্যান্য দিন শুভেন্দু যখন কাজে বেরোয়, তখন নির্মলারও ঘুম ভেঙে যায়, উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়, কিংবা বৌদির কাছাকাছি দিয়ে ঘোরে। কিন্তু আজ আর নির্মলার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

স্বামীর জন্যে খাবার তৈরী করে এনে বীণা বললো, 'ঠাকুরঝির উঠতে হয়তো দেরি আছে। ওকে তুমি কিছু বলবে না?'

কিছুক্ষণ নীরবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বললো, 'কি বলবে বলো?'

বীণা বললো, 'কিছু না বললে শেষ পর্যন্ত ঠাকুরঝিও যদি কিছু একটা অনর্থ বাধিয়ে বসে! তুমি তো ঘরে থাকো না, সব ঠ্যালা যে একা আমাকেই সামলাতে হয়!'

স্ত্রীর কথার পর এবারে আর একবার ভাবতে হলো শুভেন্দুকে, তারপর বললোঃ 'আচ্ছা, যা বলবার দুপুরে এসেই বলবো।' বলে এবারে ট্রেন ধরতে বেরিয়ে পড়লো শুভেন্দু।...

নির্মলার যেন আর ওঠবার তাড়া ছিল না। রাত্রিটা যে কী করে তার কেটেছে, ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যে একবার শিউরে উঠলো সে। তারপর একসময় দরজা খুলে মুখ ধুয়ে এসে বৌদির সামনে দাঁড়ালো।

মুখ তুলে বীণা বললো, 'আজ তোমার দাদা এক কাণ্ডই করলো। রাত্রে বোধ করি ভালো ঘুম হয়নি, অন্ধকার থাকতে উঠেই সোজা কাজে বেরিয়ে পড়েছে।'

এতটুকুও সঙ্কোচ না করে নির্মলা জিজ্ঞেস করলো, 'আমার কথা কিছু দাদাকে বলো নি বৌদি?'

সত্য গোপন করে বীণা বললো, 'ভেবেছিলাম বলবো, কিন্তু কিভাবে কথাটা বলবো, ভেবে পেলাম না। দাদার কাছে তোমার লজ্জা কি, তুমিই মুখ ফুটে দাদাকে বলো না সব কথা! সে এত বোকা নয় যে, এই নিয়ে তোমার উপর রাগ করবে!'

নির্মলা বললো, 'আমি জানি, দাদা কিছু বলবে না, বললে এর আগে অনেক কথা বলতে পারতো। কিন্তু সে যে আমার কাছে আরও অসহ্য বৌদি।' বলতে গিয়ে এবারে চোখ ফেটে জল এলো নির্মলার। সেটুকু গোপন না করে পুনরায় সে বললো, 'আমার যা অদৃষ্টে আছে, তা হবে। এ কলঙ্ক ঘোচাতে আমার একটা দিনও সময় লাগবে না; কিন্তু তোমরা? আমার কলঙ্ক নিয়ে তোমরা সমাজে মুখ দেখাবে কি করে বৌদি? আমার জন্যে কি শেষ পর্যন্ত তোমরাও মরবে?'

বীণার কেমন করে যেন মাথায় খানিকটা বুদ্ধি খেলে গেল, বললো, 'ছিঃ, চোখের জল মুছে ফেল ঠাকুরঝি! এমনও তো হতে পারে, রাখালকে পাওয়া গেছে! সব কিছু শুনে তোমার দাদা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। যাও, ঘরে গিয়ে বসো দিকি! আজ তোমার রান্না আর তোমাকে নিজে করতে হবে না। আমি চান করে আগে তোমার জন্যে যা হোক কিছু নামিয়ে দিয়ে তবে আমাদের রান্না চাপাবো। দেখো, খেতে তোমার একটুও অরুচি হবে না! টুটুলের এতক্ষণে ওঠার সময় হয়েছে; যাও, তুমি বরং টুটুলের কাছে গিয়ে বসো।'

নির্মলা এবারে নীরবে গিয়ে তাই বসলো।

কলকাতার ন নম্বর ওয়ার্ডে বীট নিয়ে ঘুরছে তখন শুভেন্দু। আজও নীলাদ্রি চ্যাটার্জির কোনো চিঠিপত্র ছিল না; তার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবার তাই প্রয়োজনও ছিল না। কথা ছিল—ডাক না থাকলে একেবারে শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালে এসেই তাকে নিয়ে গিয়ে

সে ট্রেনে চাপবে। কিন্তু আজ অপ্রয়োজনের আবশ্যকতাটাই বেশী ভারী হয়ে উঠলো। নিজের মন আর বুদ্ধি নিয়ে নিজের মধ্যে এতটুকুও তিষ্ঠোতে পারছিল না শুভেন্দু। নির্মলার কৃতকর্মের কথা যতই তার মনে হচ্ছিল ততই একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় নিজের মধ্যে কেবলই যে শিউরে উঠছিল। জীবনে কোনদিন এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি তাকে। বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে নতুন মাকে ঘরে আনলেন, তখন তা সহ্য করতে পারেনি শুভেন্দু, কিন্তু বিধবা নির্মলার অবৈধ সন্তানসম্ভাবনাকে আজ বাধ্য হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হচ্ছে। অথচ এর প্রতিকার কি, কিছুই সে ভেবে উঠতে পারলো না। বাধ্য হয়ে আজ তাকে এসে আবার তাই নীলাদ্রি চ্যাটার্জির দরজায় দাঁড়াতে হলো। তাকে ভিন্ন এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যার কাছে শুভেন্দু নিজের বিপদের কথা বলে প্রতিবিধানের পথ খুঁজে পেতে পারে। নীলাদ্রি চ্যাটার্জির উপন্যাসে বহু চরিত্রের সন্ধান আছে—কিন্তু সেখানে নির্মলার মতো কোনো চরিত্র খুঁজে পায় না শুভেন্দু। কিন্তু না পেলেও তার মতো এরকম ঘটনায় একমাত্র নীলাদ্রি চ্যাটার্জির মতো দরদী শিল্পীই তাকে সাহায্য করতে পারেন। নানা কথার সূত্র ট্রেনে একসময় তাই সে বললো, 'আপনার কাছে আমার কয়েকটা গোপন প্রশ্ন আছে স্যার।'

নীলাদ্রি বললো, 'বেশ তো, বলো না কি প্রশ্ন ?'

সময়ক্ষেপ না করে শুভেন্দু বললো, 'ধরুন, যদি কোনো যুবতী বিধবা অবৈধভাবে সন্তানসম্ভবা হয়, এবং সেই ভ্রূণের পিতা হয় ফেরারী, তা হলে সেই বিধবাকে নিয়ে তার আত্মীয়দের কি করা উচিত ?'

নীলাদ্রি বললো, 'এমন প্রশ্ন অনেক সময় আমার মনেও জেগেছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অনেক মনীষীই এই নিয়ে নানা বিধান দিয়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে ততক্ষণে সেই সন্তানসম্ভবা নারী হয় আত্মহত্যা করে নিজের পাপ স্খালন করেছে,

কিংবা নিজেও ফেরারী হয়ে সমাজের কাছ থেকে লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেদিন আজ আর নেই। আজ সমাজের কাজ হচ্ছে সেই নারীকে বাঁচিয়ে রেখে তার সন্তানকে মানুষ করে তোলা। সেই সঙ্গে সেই ফেরারী পুরুষকেও সন্ধান করে বার করতে হবে। সাজা যদি পেতে হয়, তবে তাকে, সেই নারীকে নয়।'

শুভেন্দু বললো, 'কিন্তু এর কোনোটাই যদি তার আত্মীয়দের পক্ষে সম্ভব না হয় ?' বলতে গিয়ে গলার স্বর একবার কেঁপে উঠলো শুভেন্দুর।

সেটুকু ধরে ফেলতে অসুবিধে হলো না নীলাদ্রির। বললো, 'তোমার গলার স্বরে মনে হচ্ছে, তুমি খুব ক্লান্ত। এস, বসে বসে বরং কথা বলি।'

আপত্তি করলো না শুভেন্দু। ঘরে এসে বসতেই নীলাদ্রি বললো, 'তোমার না একটি বিধবা বোন আছে বলেছিলে ? যদি কিছু না মনে করো তো জিজ্ঞেস করি—তার তো এমন কিছু হয়নি ?'

এবারে কথা না বলে মাথা নীচু করে নিল শুভেন্দু, তারপর একটুকাল চুপ করে থেকে বললো, 'আপনার কাছে তাইতো ছুটে এলাম স্যার! আমার মাথায় কিছু আসচে না ; এরপর ওকে নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো ?' বলে অসঙ্কোচে আদ্যপান্ত সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করে পুনরায় শুভেন্দু বললো, 'এতদিন গুরু বলে, অভিভাবক বলে যাকে চিনেছি, তিনি আপনি। আপনি যদি এ ব্যাপারে সমস্ত বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার না করেন স্যার, তবে আমাকে আত্মঘাতী হতে হবে, নয় কোথাও পালাতে হবে ; যেখানে থাকি, সেখানে আমার আর বাস করা চলবে না।' কথা শেষ করতে গিয়ে অলক্ষ্যে চোখ দুটো তার একবার ছলছল করে উঠলো।

যে চরিত্র আঁকতে গিয়ে নীলাদ্রি চ্যাটার্জিকে জীবনে বার বার কলম থামাতে হয়েছে, আজ সেই জাতীয় একটি চরিত্রের সম্মুখীন

হয়ে তারই সাহায্যে নিজেকে এগিয়ে আসতে হবে, একথা কল্পনা করতে পারে নি সে। কিন্তু জীবনে যা-কিছু ঘটে, তার সবটুকুই বোধ করি সাহিত্য নয়, অথচ প্রতিদিনের যা-কিছু ঘটনাবর্ত, তাই তো জীবন! তাই কলম দিয়ে যার রূপ দেওয়া যায় না, জীবনের বৃহত্তর অর্থবোধের ক্ষেত্রে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, দাঁড়িয়ে তার সমাধানও করতে হয়। নইলে বুঝি জীবনও ব্যর্থ হয়, সাহিত্যও ব্যর্থ হয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অনেক-কিছু ভেবে শেষে নীলাদ্রি বললো, 'ঐ রাখাল ছোকরাকে খুঁজে বার করবার জন্যে আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টকে বলবো, বলবার মতো আমার সোর্স আছে; তা ছাড়া আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া এখানকার এক নার্সের কোয়ার্টারে থেকে নার্সিং করে। দরকার মতো তার ওখানেই তোমার বোনকে কিছুকাল রাখবার ব্যবস্থা করতে পারবো। সুবিধেমতো সেও নার্সিংটা শিখে নিতে পারবে। ইতিমধ্যে রাখাল ধরা পড়ে যদি নির্মলাকে বিয়ে করে তো ভালো, নইলে পরের ব্যবস্থা পরে। এই নিয়ে তুমি মুষড়ে পড়ো না শুভেন্দু। একটা জিনিস জানবে—আমরা এখন মনু-পরাশরের যুগে নেই, এটা এটমিক যুগ; জীবনের সমস্ত কিছু ঘটনাকে আমাদের তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে সলভ করতে হবে। তাতে সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে।'

উঠে এবারে উপুড় হয়ে নীলাদ্রির পায়ে হাত স্পর্শ করে শুভেন্দু বললো, 'কাল সারা রাত আমি দু'চোখের পাতা একবারও এক করতে পারি নি স্যার। আপনি আজ আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন। আপনি ভিন্ন এতবড় সমাধান আমাকে এ পৃথিবীতে কেউ করে দিতে পারতো না। দয়া করে নির্মলার জন্যে এই ব্যবস্থাই তবে করে দিন স্যার। আজ আমি উঠি। শ্রীপঞ্চমীর প্রোগ্রামটা যেন ভুলবেন না, ওদিকে সবাই প্রায় তৈরী হয়ে নিয়েছে। আমি আর সেদিন কাজে বেরবো না, আপনাকেই শুধু নিতে আসবো।'

একটু ইতস্তত করে নীলাদ্রি বললে, 'কথা দিয়েছি, যাবো সন্দেহ নেই, তবে—তোমার এই অবস্থায়—'

শুভেন্দু বললো, 'ব্যক্তির জন্যে সমাজ কখনও থেমে থাকতে পারে না। যে-কোনো অবস্থার মধ্যেই সমাজ এবং দেশের জন্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আজ তবে আসি স্যার!'

'এস।' বলে শুভেন্দুকে এবারে বিদায় দিল নীলাদ্রি।...

বীটের কাজ বড় একটা বাকী ছিল না, তাড়াতাড়ি করে ঘরে ফিরে আজ প্রথমেই স্নান সেরে খেতে বসলো শুভেন্দু। ভাবলো—খেয়ে উঠেই তবে স্কুল আর লাইব্রেরির কাজে বেরোবে সে। নইলে তাকে নিয়ে বীণার কষ্টের শেষ থাকে না! খেতে বসে গলা ছেড়ে নির্মলাকে সে কাছে ডাকলো।

ডাক শুনে নির্মলার বুকের মধ্যেটা হঠাৎ যেন কেমন একবার কেঁপে উঠলো। খেতে বসে এমনি করে দাদা তাকে কোনো-দিন কাছে ডাকে না। আজ যেন দাদার সবটাই অভিনব। নিজেকে কোনোভাবে সামলে নিয়ে একসময় সে দাদার সামনে এসে দাঁড়ালো।

ভাতের গ্রাস মুখে নিয়ে শুভেন্দু বললো, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বস্ না!'

নীরবে এবারে একপাশে কোনোভাবে জড়োসড়ো হয়ে বসলো নির্মলা।

তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে শুভেন্দুর কান্না পেলো, তবু নিজেকে যথাসম্ভব চেপে নিয়ে সে বললো, 'তোকে যদি একটা ভালো সংবাদ দিই, তবে আমাকে কি খাওয়াবি বল?'

নির্মলার মুখে একথার কোনো জবাব এল না।

শুভেন্দু জিজ্ঞেস করলো, 'কিরে, বললি না যে কিছু?'

মেঝের দিকে চোখ রেখে এবারে নির্মলা বললো, 'তোমার সংসারে তুমি যেখানে সকলকে খাওয়াচ্ছো, সেখানে তোমাকে খাওয়বো, এমন সাধ্য আমার কোথায়?'

শুভেন্দু বললো, 'একসময় তো কাজ করতেই চেয়েছিলি, ধর, কিছু একটা কাজ যদি তুই পেয়েই যাস, তবে তো নিশ্চয়ই খাওয়াবি।'

তবু ভালো! নির্মলার আশঙ্কা হয়েছিল—রাখালের কথা উল্লেখ করে দাদা হঠাৎ কিছু না বলে বসে! তার পরিবর্তে এ যে একেবারে ভিন্ন জগতের কথা, তবে কি সত্যিই বৌদি তার সম্পর্কে একটা কথাও বলে নি দাদাকে? একটুকাল থেমে নির্মলা বললো, 'আমি পাবো কাজ, আর সেই কাজের টাকায় তোমাকে খাওয়াবো, তা হলেই হয়েছে। মিছেমিছি এমনি করেও ঠাট্টা করতে হয়!'

'নারে না, ঠাট্টা নয়।' শুভেন্দু বললে, 'সত্যিই তোর জন্যে কলকাতায় একটা কাজের ব্যবস্থা করে এলাম। নার্সিংয়ের কাজ। কিছুকাল শিখে নিয়ে তবে কাজ করতে পারবি। হাজার হাজার মেয়ে আজ মানুষের সেবার জন্যে এই কাজ করছে। তোর পক্ষে কাজটা খুবই উপযোগী হবে। ক'দিন অপেক্ষা কর, আমাদের ফাংশনটা চুকে গেলেই তোকে নিয়ে যাবো।'

নির্মলা আর বেশীক্ষণ বসলো না। কথাটা শুনে সে খুশি হলো কিনা, তাও বোঝা গেল না। উঠে যেতে যেতে শুধু বললো, 'তুমি যা ব্যবস্থা করো, তাই করবো।' তারপর চাপা কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু সে-সময় বোধকরি এ জীবনে আর পাবো না।'

কথাটা ভালো করে শুনতে পেলো না শুভেন্দু, তাই তা নিয়ে তার মনে কোনো প্রশ্নও উঠলো না। খাওয়া শেষ করে উঠে একসময় এসে সে ঘরে বসলো।

কাছে এসে অনুচ্চকণ্ঠে বীণা জিজ্ঞেস করলো, 'ঠাকুরঝিকে যা বললে, তা কি সত্যি? না—এ কথা বলে ওকে শুধু ভোলাতে চাইলে?'

শুভেন্দু বললো, 'ভোলাতে চাইলেই কি ও ভুলবে; যে সাহিত্যিক এখানে আসচেন, তিনিই ওর জন্যে কলকাতায় কিছু

একটা ব্যবস্থা করবেন বলে আশা দিয়েছেন, দেখি কি হয়! তুমি যাও, এবারে খেতে বসো গে, আমি বেরোই।'

বীণা বললো, 'কাল রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারো নি, এখন না বেরিয়ে একটু ঘুমোও না! তারপর উঠে বরং বেরোবে!'

'আর যারা কাজ করছে, তারা কি ভেবেছো তবে আমাকে আস্ত রাখবে?' থেমে শুভেন্দু বললো, 'তুমি যাও, খাওগে। আমি পারি তো তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো।' বলে আর বসে না থেকে বেরোবার জন্যে উঠে পড়লো শুভেন্দু।···

নকুল বিশ্বাস, প্রাণকৃষ্ণ বরাট আর মহেন্দ্র ভাণ্ডারী ততক্ষণে অনেক কাজ এগিয়ে এনেছে। কাঁচা রঙের প্রলেপ বুলানো তার নিজের হাতে গড়া সরস্বতী মূর্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লক্ষ্মীকান্ত দাস বললো, 'কেমন, এবারে বাবুদের পছন্দ তো? এর উপর পাকা রং চড়লে আর দেখতে হবে না। পুজোর দিন দর্শকদের ভিড় সামলাতে পারবেন না, এই বলে দিচ্ছি।'

খুশির কণ্ঠে শুভেন্দু বললো, 'তাতে তোমারই জয়। কলকাতায় যারা রমেশ পালের প্রতিমা দেখতে যায়, তারা এবারে কলকাতায় না ছুটে তোমার প্রতিমা দেখতেই ভিড় করে আসবে। এরপর তো তোমার উচিত হবে আমাদের খাইয়ে দেওয়া!'

লক্ষ্মীকান্ত বললো, 'বাঃ, ভারী চমৎকার প্রস্তাব করলেন তো! খেটে মরছি আমি, আর খাওয়াবোও আমি! তাও তো প্রতিমা গড়বার পয়সা পাচ্ছি না!'

কৌতুক করে এবারে প্রাণকৃষ্ণ বরাট বললো, 'সে তো তুমি চাইলে না বলে! চাইলে কি আর আমরা ন্যায্য দাম দিতে পারতাম না, বলতে চাও?'

লক্ষ্মীকান্ত বললো, 'না, তা আর বলি কি করে! এত কিছু করে কাণ্ড ঘটাচ্ছেন, আর সরস্বতী গড়বার টাকা দিতে পারবেন না,

সে কি একটা কথা! তবে তাতে আমার ঘাড়েও বোধ করি কিছু চাঁদার বরাদ্দ পড়তো, সেটা বেঁচে গেল, এই যা লাভ।'

হেসে শুভেন্দু বললো, 'হয়েছে, হয়েছে, আর লাভ লোকসানের হিসেব করতে হবে না, আমরাই তোমাকে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াবো; অন্তত সে-চাঁদাটা তুমি দিয়ো।'

এবারে সকলের সমবেত হাসিতে লক্ষ্মীকান্ত পারে তো পালিয়ে বাঁচে। কিন্তু রসিক সেও কম নয়, বললো, 'আমার প্রতিমার বিলের টাকাটা আগে আদায় হোক, তারপর আপনাদের খাবারের চাঁদা।' বলে আর অপেক্ষা না করে পুনরায় সে প্রতিমার কাঠামোয় রঙের তুলি বুলোতে শুরু করলো।

এমনি করেই মাঝের কয়েকটা দিন কোথা দিয়ে কেমন করে একসময় কেটে গেল।...

ঠিক ছিল—নীলাদ্রি চ্যাটার্জিকে এনে শুভেন্দু তার নিজের বাড়িতেই তুলবে, বাকী যাঁরা স্থানীয় অতিথি অভ্যাগত আসবেন, তাঁদের জন্যে লাইব্রেরি ঘরের এক পাশে ফরাশ আর তাকিয়ার ব্যবস্থা। নিজের ঘরের ঘেরাও করা বারান্দার অংশটাকেও এই উপলক্ষে শুভেন্দু যতদূর সম্ভব পরিপাটি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলো। তবু কি দারিদ্র্য ঢেকে রাখা যায়? সূর্যের আলো যেমন করে সমস্ত বাধা ভেদ করে এসে চোখে ঠিকরে পড়ে, দারিদ্র্যও তেমনি। হাজার গুছিয়েও তাকে চাপা দেওয়া কঠিন। তবু একটা দিকে শুভেন্দু সান্ত্বনা আছে যে, যিনি এসে এখানে বসবেন, তাঁর কাছে তার কোনো কিছুই ঢাকা নেই, তাই লজ্জাও নেই।

সেই লজ্জামুক্ত মন নিয়েই শ্রীপঞ্চমীর সকালে গিয়ে নীলাদ্রি চ্যাটার্জিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো সে। এসে ট্রেন থেকে নামতেই কোথা থেকে দু'তিন ছড়া মালা এসে পড়লো নীলাদ্রির গলায়।

শুভেন্দু বললো, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, এখান থেকে

সাইকেল রিকশা ভিন্ন আমাদের কলোনীতে যাবার সুবিধে নেই। বুঝতে পারছি—আপনার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু—'

বাধা দিয়ে নীলাদ্রি বললো, 'না, না, সাইকেল রিকশায় যেতে কষ্ট হবে কেন, ডাকো রিকশা, দিব্বি তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতে পারবো।'

অগত্যা তাই হলো।

মনে মনে সঙ্কোচের অন্ত ছিল না শুভেন্দুর। কিন্তু তার সুসজ্জিত বারান্দার আসন-পাতা চেয়ারে এসে বসে নীলাদ্রির কিন্তু বেশ ভালো লাগলো। টিনের ঘরে বাঁশের বেড়ার আচ্ছাদন হলেও তাকে যতখানি সম্ভব নিজের রুচি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে শুভেন্দু। যেখানে যেমনটা না হলে বেমানান হয়, ঠিক যেন চিত্রকরের মতো সেখানটায় ঠিক তেমনি করে সাজিয়ে রেখেছে শুভেন্দু। প্রতিদিনের জীবনচর্যার প্রস্ফুট ছাপ চারিদিকে। বেড়ার গায়ে গৌতমবুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ আর স্বামীজীর ছবি শোভা পাচ্ছে, সেই সঙ্গে আছে বড় সাইজের একখানি নেতাজী-ক্যালেণ্ডার। দরজার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যায়—ঘরের একপাশে তক্তপোশ, তাতে চাদর ঢাকা, কাঠের র‍্যাকে কিছু বই আর ম্যাগাজিন। জীবনে অর্থের স্বাদ না পেলেও পরমার্থের স্বাদ পেয়েছে শুভেন্দু। তাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই।

বললো, 'আপনাকে একটা দিন অন্তত সম্পূর্ণভাবে কাছে পাবার লোভ সামলাতে পারি নি, তাই, নইলে, এরকম জীর্ণ পরিবেশে আপনাকে টেনে এনে শুধু কষ্ট দেওয়া স্যার।'

নীলাদ্রি বললে, 'কষ্ট পেতাম, যদি রাজ্যপালের ঘরে গিয়ে বসতে হতো। আমরা তপোবনের সাধক, জানো তো শুভেন্দু? তুমি আজ নতুন করে যেন সেই বাগিচায় ফুল ফুটিয়েছ! এরকম আরামের নিশ্বাসই বা ক'জায়গায় নিতে পারা যায়!'

একটুকাল মাথা নিচু করে বসে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে শুভেন্দু বললো, আমার দীনতা আমি তো অন্তত জানি স্যার।'

ইতিমধ্যে দরজার আড়াল থেকে একটি মেয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো, হাতে তার একগ্লাস শরবত।

শুভেন্দু বললো, 'আমার বোন নির্মলা।'

তাকাতে গিয়ে সেই মুহূর্তেই নীলাদ্রি দৃষ্টি নামিয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু নির্মলার চোখে চোখ পড়ার কিছুক্ষণ চোখের মণি দুটোকে স্থির করতে হলো।

নির্মলা নিঃশব্দে এবারে পাশের টেবিলের উপর শরবতের গ্লাসটাকে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুভেন্দু বললো, 'এতক্ষণে তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়ই; খান শরবতটুকু খেয়ে নিন স্যার।'

কিন্তু কেন যেন সহসা সে-কথায় সাড়া দিতে পারলো না নীলাদ্রি। নির্মলার কথাটাই তার সারা মনে ঘুরছিল। চেহারায় একটা প্রচ্ছন্ন বৈধব্যের ছাপ থাকলেও চোখে কলুষতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। তার জীবনের ঘটনার সঙ্গে চেহারার যেন একটা প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। ভাবতে গিয়ে বিস্মত হচ্ছিল নীলাদ্রি। শুভেন্দুর ডাকে সহসা সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললো, 'এ আবার কেন, এখনই শরবত খাবার কি হয়েছে!'

বিনয় প্রকাশ করে শুভেন্দু বললো, 'এতটা পথ কষ্ট করে এলেন, একটু শরবত মুখে দেবেন না, সে কি হয়! নিন, হাতে তুলে নিন স্যার।'

এবারে বাধ্য হয়ে গ্লাসটাকে হাতের মুঠোয় টেনে নিতে হলো নীলাদ্রির।

বাইরে বোধ করি কাদের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। সাড়া দিয়ে শুভেন্দু বললো, 'কে, এদিকে এস না!'

এবারে সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো নকুল বিশ্বাস আর প্রাণকৃষ্ণ

বরাট। বললো, 'আপনাকে কিছুক্ষণের জন্যে একবার মিটিংয়ের জায়গায় যাবার দরকার।'

'বেশ তো, যাচ্ছি।' শুভেন্দু বললো, 'এরপর তো স্যারকে এমন নিরিবিলি পাবে না, বসে আলাপ করে দুটো কথা বলে যাও না!'

নীলাদ্রির উদ্দেশে নমস্কারের হাত তুলে নকুল বিশ্বাস বললো, 'কথা বলবো কি, কথা শুনবো বলেই যে স্যারকে কাছে পাওয়া! ওদিককার কাজকর্মগুলো আগে চুকে যাক, দুপুরটা তো তস্ত হাতে আছে! তখন বসে বসে অনেক কথা শুনবো।' বলে প্রাণকৃষ্ণকে নিয়ে পুনরায় প্রস্থানোদ্যত হলো নকুল বিশ্বাস। কাজের ক্ষতি হতে পারে মনে করে শুভেন্দুও এবারে তাদের পিছু নিল। বললো, 'আপনি একটুকাল বিশ্রাম করুন স্যার, আমি এক্ষুনি আসচি। নকুল আর প্রাণকৃষ্ণ বড় নিষ্ঠাবান কর্মী। সবকিছুকে ওরাই সার্থক করে তুলছে। ওদের হয়তো কিছু আলোচনা করবার আছে, শুনেই আমি চলে আসবো।'

নীলাদ্রি বললো, 'ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধে নেই, তুমি এস।'

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল শুভেন্দু।

নীলাদ্রির চোখে পড়লো—যে টেবলটার উপর নির্মলা শরবতের গ্লাসটা রেখে গিয়েছিল, সেই টেবলটা একেবারেই ফাঁকা নয়। এক-পাশে কিছু নতুন ম্যাগাজিন শোভা পাচ্ছে। সময় কাটাবার জন্যে এবারে একটা হাতে টেনে নিল নীলাদ্রি তারপর আর একটা, তারপর আর একটা। তারপর, সর্বশেষ যেটা তার হাতে উঠে এলো, সেটা কোনো মাসিক বা সাপ্তাহিক নয়, একখানি খাতা। তার উপর মক্সো করে শুভেন্দুর নাম লেখা। কভারের পাতাটা উল্টোলেই দেখা গেল—অজস্র রচনায় খাতাখানি ভর্তি। তার অধিকাংশই ডায়েরীর ফর্মে লেখা, তার পাশাপাশি দু-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পও আছে। শুভেন্দু ফিরে আসচে না দেখে সেই লেখাগুলির মধ্যেই

এবারে নিজেকে ডুবিয়ে দিল নীলাদ্রি। ডায়েরীগুলিতে নিজেদের পারিবারিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত নানা কথা ও মন্তব্য গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে নির্মলার কাহিনীও আছে। গল্পগুলিতে গল্পাংশ যদিও বড় নয়, কিন্তু ফর্ম ও ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করবার মতো। পড়তে পড়তে নীলাদ্রির মনে হচ্ছিল সেই সব হতভাগ্যদের কথা—যারা জীবনে সুযোগ পেলে অনেক বড় হতে পারতো। শুভেন্দুও যে তাদেরই একজন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ঝড়ের গতিতে ফিরে এলো শুভেন্দু, বললো, 'কতকগুলো জরুরী কাজে আটকে পড়ে দেরি হয়ে গেল; একা একা আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছিল, তাই না স্যার?'

কিন্তু নীলাদ্রির উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ তার হাতের খাতাখানির দিকে লক্ষ্য পড়তেই লজ্জায় নিজের মধ্যে এতটুকু হয়ে গেল শুভেন্দু। বললো, 'যা নিজে থেকে আপনাকে দেখাতে কোনোদিন সাহস হয় নি, আজ আমার নিজেরই অসতর্কতায় আপনি তা দেখে ফেললেন স্যার? ওটা রেখে দিন, ও কিছু নয়, স্রেফ পাগলামি, বাতুলের প্রলাপ, ওগুলোর দিকে চোখ দিয়ে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না স্যার।'

খাতাখানি বুজিয়ে রেখে দিয়ে নীলাদ্রি বললো, 'কিন্তু আমার যে সবটাই পড়া হয়ে গেল! ভাবছিলাম—কি সুন্দর হাত তোমার, যদি নিয়মিত চর্চা করতে, তবে একদিন সাহিত্য-জগতে কিছু একটা হয়ে উঠতেও পারতে। নতুন যুগের ডাক-পিয়নেরা সেদিন তোমার দরজায় এসে ডাক বিলি করতো।'

শুনে যুগপৎ দুঃখে এবং আনন্দে বুকের ভিতরটা যেন একবার কেমন করে উঠলো শুভেন্দুর। একটুকাল স্থির হয়ে নিয়ে সে বললো, 'আপনি আমাকে স্নেহ করেন বলে আমার উপর এতখানি গুণ আরোপ করছেন স্যার। আমি তো জানি, আমি এর কতটুকু যোগ্য!'

নীলাদ্রি বললো, 'সংসারে কার যোগ্যতা কতখানি, সে যে

মানুষ নিজেই জানে না। তার জন্যেও সুযোগ এবং পরিবেশের প্রয়োজন আছে। হয়তো সেই সুযোগ তোমার জীবনে আসে নি, তাই বলে নিজেকে ছোট ভাববে কেন? মানুষের সৃষ্টির পথ কি শুধু একটাই? তা যদি হবে, তবে আজ কেমন করে স্কুল আর লাইব্রেরি গড়ে তুললে বলো?'

শুভেন্দুর মুখে এবারে কথা নেই।

একটুকাল থেমে নীলাদ্রি বললো, 'আগেও বলেছি, আজও বলি, তুমি লেখো শুভেন্দু। যখন যা মনে আসে, তাই লেখো। তা থেকেই দেশের মানুষ একদিন তাদের নিজেদের কথা খুঁজে পাবে। সব শিল্পীর জীবন থেকেই তাই পায়।'

অভিভূত কণ্ঠে এবারে শুভেন্দু হঠাৎ বলে উঠলো: 'আমার কথা থেকে দেশ তবে একদিন তার নিজের কথা খুঁজে পাবে? দেশ একদিন সত্যিই আমাকে চিনবে স্যার?'

নীলাদ্রি বললো, 'কেন চিনবে না, আগামী যুগ যে তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করে আছে!'

মনে হলো—অনেক দুঃখের মধ্য যেন অনেকখানি সান্ত্বনা পেয়ে মুহূর্তের জন্য বুকখানি ভরে উঠলো শুভেন্দুর। বললো, 'চিরকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এত বড়টি হয়েছি। মামুদপুরের মণ্ডলরা আমাদের জ্ঞাতি হলেও আমরা চিরকালের গরিব। একদিন মনে মনে স্বপ্ন ছিল—বড় হবো, নাম করবো, দেশকে গড়ে তুলবো, আরও কত কি! আজ শুধু ভাবি এত কষ্টের চাকরিটাও যদি না থাকে, তবে খাবো কি, টুটুলকে মানুষ করে তুলবো কি করে, নির্মলারই বা কি ব্যবস্থা করবো!' বলে বুকের মধ্য একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিল শুভেন্দু।

নীলাদ্রি বলতে যাচ্ছিল, 'নির্মলার ব্যবস্থার কথা আমি ভাবচি, তোমার তা নিয়ে ব্যস্ত হবার কারণ নেই,' কিন্তু তার আগেই তার হাতের সামনে বাণী-অর্চনার প্রসাদ এসে গেল। প্রসাদ রেখে

শুভেন্দুকে লক্ষ্য ক'রে প্রাণকৃষ্ণ বললো, 'আপনি নিজে গিয়ে প্রসাদ নেবেন ব'লে আপনার প্রসাদ আনলাম না।'

শুভেন্দু বললো, 'কাউকে দিয়ে টুটুলের জন্যে দু'টো ফল পাঠিয়ে দাও, আমার তাতেই হবে।'

কিছু-একটাও আর না ব'লে প্রাণকৃষ্ণ আবার পূজো-মণ্ডপের দিকে চ'লে গেল।

হেঁশেলে তখন রান্না শেষ করে খাবার আসন পেতেছে বীণা। দরজার আড়াল থেকে নির্মলার কণ্ঠ শোনা গেল: 'দাদা, বৌদি জিজ্ঞেস ক'রছে—উনি কি এখন খাবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, খাবেন না কেন, বেলা কি কম হলো।' উদ্যোগী হয়ে শুভেন্দু বললো, 'চলুন স্যার, খেয়ে উঠে শুয়ে শুয়ে বরং বিশ্রাম করবেন।' ব'লে নীলাদ্রি চ্যাটার্জিকে নিয়ে খাবার আসনে গিয়ে বসলো শুভেন্দু।

ঘরের পরিচ্ছন্নতা বেশ লাগছিল নীলাদ্রির। মাটির মেঝে দিব্বি নিকোনো। সূচের কাজ করা আসনের সামনে প্রকাণ্ড থালায় নানা ব্যঞ্জনে ভাত সাজানো। খাবার যে পরিবেশন ক'রছিল, তার মাথায় ঘোমটা লক্ষ্য ক'রে নীলাদ্রি বুঝলো—শুভেন্দুর স্ত্রী। দরজার একপাশে ঘোমটায় সারা মুখখানি আবৃত ক'রে নীরবে দাঁড়িয়েছিল সে, মাঝে মাঝে খাবার এনে হাতায় ক'রে পরিবেশন করতে লাগলো। অপাঙ্গে একবার তার মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে নীলাদ্রি দেখলো—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের চেহারা, কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ যেন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মনে হলো—ঈশ্বর সংসারে ব্যর্থ করে পাঠান নি শুভেন্দুকে। চাকরিটা ডাক-হরকরার হ'লেও সাংসারিক জীবনে সে সম্রাট।

ভাতের গ্রাস মুখে নিতে নিতে শুভেন্দু বললো, 'গরিব মানুষ। কিছুই ব্যবস্থা করতে পারি নি। আপনার কষ্ট হবে জেনেও কষ্ট দিলাম।'

নীলাদ্রি বললো, 'গরিব ব'লে যদি গরিবের মতো পরিচয় দিতে, তবে কথা ছিল না ; কিন্তু এ যা আয়োজন করেছ, তাতে যে জমিদার বাড়িকেও হার মানিয়েছ !'

শুনে সারা মুখে উজ্জ্বল একটা হাসির আভা টেনে নিয়ে এবারে দরজার দিকে মুখ ক'রে ঈষৎ ঘুরে দাঁড়ালো বীণা।

শুভেন্দু বললো, 'এমনি ক'রে ব'লে আমার দারিদ্র্যকে কেন লজ্জা দিচ্ছেন স্যার ? আপনাদের তেমন ক'রে খাওয়াতে পারি, আমার সাধ্য কি ! স্কুল আর লাইব্রেরি কমিটি থেকেই খাবার ব্যবস্থা করবে বলেছিল, আমি তা বাতিল ক'রে দিয়েছি, দিয়েছি আমার নিজেরই স্বার্থে, আপনাকে একটা পুরো দিন সম্পূর্ণ ক'রে পাবো ব'লে।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে নীলাদ্রি বললো, 'রান্না যা হয়েছে, চমৎকার। অনেককাল এমন রান্না খাই নি। যিনি রেঁধেছেন তাঁকে কি ব'লে যে ধন্যবাদ দেবো, বুঝতে পারছি না।'

বীণা এবারে কিছুক্ষণের জন্য দরজার আড়ালে একেবারেই লুকিয়ে গেল।

শুভেন্দু বললো, 'আপনাকে আর দু'খানা মাছ এনে দিক স্যার, এখানকার টাটকা মাছ, আপনার একটুও অপকার করবে না।'

'তুমি কি ক্ষেপেছ শুভেন্দু !' নীলাদ্রি বললো, 'অপকার না করলেও পাকস্থলীর তো একটা পরিমাণ আছে ! আমার আর কিচ্ছুটি লাগবে না। এর পরেও দেখছি—চাটনি, দই আর মিষ্টি রয়েছে। ওর মধ্যে শুধু দইটাই খাবো, আর কিছু নয়।'

শুভেন্দু অনেক ক'রে ব'লেও নীলাদ্রিকে আর কিছুই খাওয়াতে পারলো না। একসময় আসন ছেড়ে উঠে পড়লো নীলাদ্রি।

দুপুরে যে কেউ কেউ এসে তার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে অটোগ্রাফ নিতে না চাইল, এমন নয়, কিন্তু কাউকেই খুব একটা কাছে ঘেঁষতে দিল না শুভেন্দু, বললো, 'এখানে উনি তোমাদের অতিথি,

তোমরা যদি ওকে সামান্য একটু বিশ্রামও না দাও, তবে তোমাদের সম্বন্ধে উনি কি মনে ক'রে যাবেন, বলো তো ?'

শুনে অটোগ্রাফের শূন্য পৃষ্ঠার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একে একে স'রে পড়লো সকলে।

এমনি ক'রেই সারা দুপুরটা একসময় কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেল।

সভামণ্ডপে তখন লোক গমগম করছে, মাইকের শব্দ ভেসে আসছে কানে। নকুল বিশ্বাস, প্রাণকৃষ্ণ বরাট আর মহেন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী এতক্ষণে তবে কোনো ব্যবস্থাই বাকী রাখে নি। মনে মনে একবার খুশী হলো শুভেন্দু, তারপর বললো, 'এবারে আমাদের উঠতে হয় স্যার, ওদিকে এতক্ষণে লোকজন প্রায় সবাই এসে গেছে।'

নীলাদ্রি বললো, 'আজকাল বক্তৃতা কি কেউ শোনে ? সবার ঝোঁক তো কেবল গান-বাজনার দিকে। তার ব্যবস্থা ক'রেছ তো ?'

শুভেন্দু বললো, 'ব্যবস্থা যে না আছে, তা নয়; তবে এ অঞ্চলটা এখনও খাস ক'লকাতা হ'য়ে ওঠে নি; তাই দয়া ক'রে যাঁরা আসেন, তাঁদের কথা শোনবার জন্যে এখানকার লোকেরা এখনও ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে।'

ইতিমধ্যে আর একবার নির্মলার দেখা পাওয়া গেল। চা আর মিষ্টি এনে নীলাদ্রির সামনে নামিয়ে রেখে নীরবেই আবার চ'লে যাচ্ছিল। এবারে এই প্রথমবার তার সঙ্গে উদ্যোগী হ'য়ে কথা বললো নীলাদ্রি। বললো, 'এসে অবধি তোমার সঙ্গে কিন্তু একটা কথাও হলো না; অথচ তোমার দাদার মুখে তোমার কথা আমি এত শুনেছি যে, এসে কেবলই তোমাদের সবাইকে পুরনো পরিচয়ের মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে। শুনলাম—তুমি খুব সুস্থ নও, তাই ডাকি নি, নইলে সারা দুপুর তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটিয়ে দিতাম।'

নীলাদ্রির মুখে তার শরীর খারাপের কথা শুনে সারা মুখখানি

এবারে হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল নির্মলার। তা হ'লে তার সম্পর্কে দাদার কোনোকিছু জানাতেই বাকী নেই, দাদা নিজে জেনে ইতিমধ্যে অপরকেও জানিয়েছে! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এরপরেও সে কোন্ মুখে এমনি ক'রে তাঁদের সামনে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে আছে! অস্ফুট কণ্ঠে শুধু একবার সে উচ্চারণ করলো: 'সে সৌভাগ্য আমার আর হলো কোথায়! আপনি চা খান, আমি আসচি।' ব'লে এক ছুটে কোথায় গিয়ে যে লুকোলো নির্মলা, কেউ দেখলো না।...

সভামণ্ডপে গিয়ে পৌঁছাতে দেরি হ'য়ে যাচ্ছে দেখে শুভেন্দু বললো, 'এবার চলুন স্যার, এগোই; নির্মলার জন্যে বসতে গেলে মিটিংয়ের লোক আপনার বক্তৃতা থেকে বঞ্চিত হবে।'

অগত্যা চায়ের কাপ শেষ ক'রে এবারে উঠে পড়তে হলো নীলাদ্রিকে। ভাবলো—স্কুল আর লাইব্রেরির যখন ফাংশন, তখন 'শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' সম্পর্কে বক্তৃতা সূত্রে কিছু আলোচনা করবে সে। উত্তর-স্বাধীনতা যুগে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভাবে অবনতি দেখা দিয়েছে, তাতে গোটা একটা স্বাধীন জাতি বড় হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার উপর গ্রন্থাগারের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু এখানে আজ যারা তার শ্রোতা, তারা সত্যিই কি এত ভারী কথা উপলব্ধি করতে পারবে?

ততক্ষণে শঙ্খধ্বনিতে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সভামণ্ডপে নিয়ে যাবার জন্যে কয়েকটি কিশোর-কিশোরী এগিয়ে এসেছে। নীলাদ্রি তার আসনে গিয়ে বসতেই মাইকে জাতীয় সংগীত ভেসে উঠলো। তারপর কার্যবিবরণী পাঠ করে সভার কাজ শুরু করলো মহেন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী। স্কুলে বাংলা পড়ায়। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে বাংলায় দু-চার কথা দু'দশ মিনিট ধরে গুছিয়ে বলতে একমাত্র সে-ই পারে। তা ছাড়া এসব কাজে তার উৎসাহও প্রচুর। শুনে শ্রোতারা অবাক। মনে হলো—বক্তৃতার প্রতি তাদের আগ্রহ জন্মেছে। নীলাদ্রির

পক্ষে এইটাই লাভ। কিন্তু কার্যসূচীতে তার নাম সকলের শেষে। তার আগে যাদের গানের ব্যবস্থা আছে, তারা একে একে ডায়াসে এসে কেউ সুরে, কেউ বা বেসুরে গান গেয়ে শ্রোতাদের বিস্মিত, রোমাঞ্চিত, চমকিত, অভিভূত এবং স্তব্ধ ক'রে দিল।

নীলাদ্রি যখন তার বক্তৃতা শেষ ক'রে বসলো, ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত আটটার বেল বেজে গেছে। 'কিছুক্ষণ বাদেই কলকাতায় যাবার একটা ট্রেন আছে, সেটা ফেল করলে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হবে।' শুভেন্দুকে কাছে পেয়ে কথাটা তাই একবার স্মরণ করিয়ে দিল নীলাদ্রি।

শুভেন্দু বললো, 'আপনার বক্তৃতা শুনতে শুনতে এখানকার প্রবীণদের মধ্যে অনেকে কানাকানি করছিলেন—এমন চমৎকার বক্তৃতা নাকি এর আগে তাঁরা কোনোদিন শোনেন নি। আসুন, আপনাকে এবারে আমাদের লাইব্রেরিটা ঘুরিয়ে দেখাই।'

আসন ছেড়ে উঠে আসতে আসতে নীলাদ্রি বললো, 'ওদিকে গাড়িটা ফেল করলে আমাকে কিন্তু অসুবিধেয় পড়তে হবে। আর যা করো, সময় বুঝে আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ো।'

শুভেন্দু বললো, 'গাড়ির অভাব কি স্যার এখান থেকে? দশ মিনিট পনেরো মিনিট পর পর অনবরত গাড়ি যাচ্ছে। যাবার আগে না খেয়ে তো সত্যিই আর আপনি যেতে পারছেন না! নির্মলার বৌদি এতক্ষণে নিশ্চয়ই তৈরী ক'রে অপেক্ষা করছে?'

বিব্রত কণ্ঠে নীলাদ্রি বললো, 'না, না, এবেলা আর নয়, এই তো দুপুরে যোড়শোপচারে তাঁর হাতে খেলাম। আবার যখন আসবো, খেয়ে যাবো। ওদিকে কলকাতায় আর একটি প্রাণী আমার জন্যে না খেয়ে ব'সে থাকবে, খেয়ে গেলে তার উপর অবিচার করা হবে। তুমি তোমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলো, কিছু মনে করবেন না তিনি।'

শুভেন্দু এবারে আর দ্বিরুক্তি না করে নীলাদ্রিকে লাইব্রেরিটা

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে একসময় ছোট্ট ক'রে বললো, 'আপনি যেমন আপনার বইয়ের নায়ক-নায়িকার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান, আমি তেমনি আমাকে খুঁজে পাই এঘরের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।'

র‍্যাকের বইগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে শুভেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি বললো, 'তোমার সৃষ্টির মধ্যেই যে তুমি অমর হ'য়ে রইলে শুভেন্দু, তোমার সব চাইতে বড় জয় যে এখানেই। তারপর থেমে বললো, 'চলো এবারে আমাকে গাড়িতে তুলে দেবে।'

মনে কুণ্ঠা রেখেও তবু এবারে শুভেন্দুকে বলতে হলো : 'চলুন।'

নকুল বিশ্বাস আর প্রাণকৃষ্ণ বরাট সঙ্গে আসতে চাইল। বাধা দিয়ে শুভেন্দু বললো, 'দরকার নেই, তোমরা বরং এদিককার বাকী কাজগুলো সামলাও।'

নীলাদ্রিকে নিয়ে এবারে একটা সাইকেল-রিকশায় চেপে বসলো শুভেন্দু।

পথে এসে নীলাদ্রি বললো, 'তোমার বোনের ব্যাপারে আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছি। এ ব্যাপারে তারা যা করবার ঠিকই ক'রবে। তুমি তোমার নিজের কাজ ক'রে যাও শুভেন্দু। আমি জানি, একদিন সমস্ত কাঁটা তোমার ফুল হ'য়ে ফুটে উঠবে ; সে ফুলে সেদিন আর একটাও কাঁটা থাকবে না, থাকবে শুধু পাপড়ির রং। সেই রঙে তোমার নতুন দিগন্ত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।'

বিনয়নম্র কণ্ঠে শুভেন্দু বললো, 'আপনার শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদই যে আমার জীবনের একমাত্র পাথেয় স্যার ! সব কাজের পিছনেই বোধ করি কিছু না কিছু সার্থকতা লুকিয়ে থাকে। আমার এই ডাকপিয়নের কাজটাও তাই। একাজে না এলে বুঝি এমন ক'রে আপনাকে পেতাম না ! এ যে আমার কত বড় পাওয়া, তা বলবার নয়।'

শুভেন্দুর ঘাড়ের উপর দিয়ে একখানি হাত প্রসারিত ক'রে দিয়ে নীলাদ্রি বললো, 'তোমাকে পাওয়াই কি আমার কম পাওয়া শুভেন্দু! প্রতিদিনই আমরা লোক থেকে লোকান্তরে যাত্রা করে অজানাকে আপন ক'রে পাই। তা যদি না পেতাম, তবে বোধ করি আমরা আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতুম না! আমরা সবাই তাই আনন্দলোকের যাত্রী। আনন্দ পেতেই আমাদের যাত্রা, আনন্দই আমাদের শেষ লক্ষ্য।'

'আর আমি সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে দিনরাত ফাঁসির দড়ির মতো ঝুলছি।' থেমে শুভেন্দু বললো, 'একটা অনুরোধ করবো স্যার!'

'কি বলো?'

শুভেন্দু বললো, 'সারা জীবন ধ'রে আপনি তো কত গল্প-উপন্যাসই লিখলেন! নানা ঘরে, নানা গ্রামে আর শহরে ছড়িয়ে আছে আপনার সব নায়ক-নায়িকা। এবারে আমাকে নিয়ে আপনি লিখুন; উপন্যাসের নায়ক হিসেবে আমি বোধ করি খুব একটা অনুপযুক্ত হব না। আমাকে নিয়ে ছোট গল্প হয় জানি। কিন্তু আমি যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে হয়তো মস্ত একটা উপন্যাস লুকিয়ে আছে। তাকে রূপ দিতে পারেন একমাত্র আপনি। বলুন, আমাকে নিয়ে লিখবেন স্যার?'

সঙ্গে সঙ্গেই নীলাদ্রি এ কথার জবাব দিতে পারলো না। বললো, 'কাহিনীকে ছবির মধ্যে দেখে মানুষ খুশী হয়, সেই জন্যেই মানুষ আবিষ্কার করেছে সিনেমাট্রোগ্রাফ। তুমিও বোধ করি তেমনি খুশী হ'তে চাও নিজেকে বইয়ের মধ্যে দেখে; তোমার আবিষ্কার তাই বইয়ের লেখককে। কিন্তু জীবন যে একটা বইয়ের চাইতেও বড়! বইয়ের পাতায় তাকে ধরানো যায় না। তাই পৃথিবীতে আজ অবধি সত্যিকারের উপন্যাস হয় নি। যদি হ'য়ে থাকে, তা শুধু রামায়ণ-মহাভারত, আর কিছু নয়।'

ট্রেনটা তখন প্লাটফর্ম ছেড়ে যাবার জন্যে স্টেশনে দম নিচ্ছিল।

দ্রুত এগিয়ে এসে এবারে টিকিট কেটে একটা সেকেণ্ড ক্লাস বগিতে তুলে দিল শুভেন্দু নীলাদ্রিকে, তারপর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে জানালায় হাত রেখে আর একবার অনুরোধ জানালো শুভেন্দু : 'তবু আপনি লিখুন, একটা বইয়ের মধ্যে নিজেকে দেখে কিছুটাও অন্তত আমি সান্ত্বনা পাই।'

হঠাৎ গার্ডের মুখে গাড়ি ছাড়বার হুইসেল বেজে উঠতেই মুখ বাড়িয়ে নীলাদ্রি বললো, 'লিখবো, আমার পরবর্তী উপন্যাস আমি তোমাকে নিয়েই লিখবো শুভেন্দু, আর সে-উপন্যাসের নাম দেবো— যে ফুলে কাঁটা নেই। জীবনে চলবার ইতিহাসটাই যেমন, আসল ইতিহাস নয়, চলতে চলতে জীবনকে ফলবান ক'রে তোলাটাই ইতিহাস, তেমনি যে-কাঁটায় তুমি প্রতিনিয়ত ক্ষত হ'য়ে চলেছ, সেইটেই সব নয় ; সেই কাঁটাকে অতিক্রম ক'রে একদিন তুমি ফুল হ'য়ে ফুটে উঠবে, তোমার জীবনের সেইটেই সবচেয়ে বড় ইতিহাস শুভেন্দু। উপন্যাসে তোমার সেই ইতিহাসকেই আমি রূপ দেবো।'

প্লাটফর্মের যেটুকু আলো এসে শুভেন্দুর মুখে পড়েছিল, তাতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো—কথাটা শুনে সে যেন তার জীবনের কোন্ গভীরে এক অনাবিষ্কৃত শান্তির স্পর্শ খুঁজে পেয়েছে।

সেই মুহূর্তেই গাড়িটা দ্রুত গতিতে প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েও নীলাদ্রি আর শুভেন্দুকে ঠাহর করতে পারলো না।

যখন বাড়ি ফিরলো শুভেন্দু, রাত তখন অনেক। দেখলো— ঘুমন্ত টুটুলকে নিয়ে সারা বাড়িতে একা বিব্রত হ'য়ে উঠেছে বীণা। সন্ধ্যা থেকে নির্মলাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এতদিনে সে হয়তো তার মুক্তির পথ বেছে নিয়েছে।

মন-মহুয়া

দক্ষিণারঞ্জন বসু

বন্যার সে কি মত্ততা !

কোনো বিচার নেই, কোনো বিবেচনা নেই, নদীর ছু'কূল ছাপিয়ে সব কিছু সে ভাসিয়ে নিয়ে চলে আপন খেয়ালে। আতংক-আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সবাই। কান্নার রোল ওঠে। বাঁচবার চেষ্টা করেও সবাই বাঁচতে পারে না। আত্মবিসর্জনে বাধ্য হয় অনেকে সেই প্লাবনের মহাক্ষুধা মেটাতে।

মানুষের মন-গঙ্গায়ও তেমনি বান ডাকে মাঝে মাঝে।

সেই মন-গাঙের বানেও কি কম মানুষ ভেসে যায় ?

শিয়ালদা সাউথ স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে পোর্ট ক্যানিং। সেখান থেকে শৈবালদের নিয়ে মোটরবোট যখন গোসাবাঘাটে যেয়ে পৌঁছল সূর্যাস্তরাগে পশ্চিম দিগন্ত তখন রক্তাভ।

অঞ্জনার মুখখানিও কেমন যেন লাল লাল।

ও কী, তোমায় এ রকম দেখাচ্ছে কেন ?

দেখাবে না, তুমি শুধু শুধু আমায় জোর করে গান গাওয়ালে! এত করে বললেম যে, গলাটা আমার আজ ভাল নেই, তবু শুনলে না। অমরেশবাবু কী ভাবলেন বল তো।—খুব আস্তে আস্তে শৈবালের প্রশ্নের উত্তর দেয় অঞ্জনা।

তার জন্যেই বুঝি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছ এমনি! দেখো আবার সূর্যদেবের দেখাদেখি অস্তাচলে ডুব দিয়ে চোখের আড়াল হয়ে যেও না যেন।

আহা মরি আর কি! আমি চোখের আড়াল হলে তুমি একেবারে ধরাতল কেঁদে ভাসাবে বিরহী যক্ষের মতো!—কথায় অঞ্জনাও বড় কম যায় না।

অমরেশবাবু অঞ্জনার ছোট্ট মেয়ে শিখাকে নিয়ে অনেকখানি

আগে আগে চলেছেন বলেই অতটা রসালাপ জমে উঠতে পেরেছে শৈবাল আর অঞ্জনার মধ্যে।

কিন্তু তবু কোথায় যেন বাধো বাধো ঠেকে। অমরেশ মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েন বলেই হয়তো। শৈবাল তাই আর কথা বাড়ায় না।

নতুন হলেও কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের একজন কর্তা-ব্যক্তি বলেই শৈবালকে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন অমরেশবাবু। কাজেই তাঁর কাছে কোনো রকমেই যে ছোট হওয়া চলে না সে খেয়াল পুরো মাত্রায়ই আছে শৈবালের।

মাতলা আর বিছা নদী পেরিয়ে আসতে আসতে নদীর নীল জলে ধোওয়া দুকূলব্যাপী সবুজ বনাঞ্চল দেখে মুগ্ধ হয়েছে অঞ্জনা। বিস্মিত হয়েছে এক একটি ছোট ছোট জেলেডিঙিকে নির্ভয়ে তরঙ্গ-উন্মাদ বিশাল নদী পারাবার হতে দেখে। ক্যানিং পেরিয়ে আসবার পরেই লঞ্চ থেকে তীরবর্তী এক একটি গ্রাম দেখে মন নেচে উঠেছে অঞ্জনার। তার খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে। পুব বাঙলার গাঁয়ের মেয়ে সে। ছোটবেলাটা তার নদীনালার দেশ পুব বাঙলার গাঁয়েই কেটেছে। কলকাতার জীবনে গঙ্গা ছাড়া অন্য নদী দেখবার সুযোগ এর আগে আর সে কোনো দিনই পায় নি। তা ছাড়া কলকাতার গঙ্গা আবার নদী! পদ্মা-তীরের মেয়ে অঞ্জনার এমনি মনে হত। আজই সে প্রথম দেখলে পশ্চিম বাঙলায়ও বড় নদী আছে।

মাতলা আর বিছা যেখানে মিলেছে লঞ্চে সে জায়গাটা পার হবার সময় অঞ্জনার মনে পড়ে গিয়েছে পদ্মা-মেঘনার মিলনস্থানের কথা। অনেকদিন আগে পিসীমার কাছে চাঁদপুর যাবার পথে স্টিমার থেকে পদ্মা-মেঘনার মিলিত রূপ দেখে আর প্রচণ্ড ঢেউ-এর মধ্যে পড়ে গিয়ে কী ভীষণ ভয়ই না সে পেয়েছিল সেবার! ঠিক ততটা না হলেও মাতলা-বিছার সঙ্গম থেকে সুদূর-বিস্তারী জলরাশি ও তরঙ্গমালা দেখে তার গা ছমছম করে উঠেছিল। তার মনে

হয়েছিল স্টিমার লঞ্চ নৌকো সব জলযানেরই নদীর পার ঘেঁষে চলাই ভাল। তাতে ভয় লাগে না। তীর ও তরঙ্গের খেলা দেখে চোখ জুড়োয়।

তেমনিভাবেই অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে ওদের লঞ্চ। সবুজে আচ্ছাদিত এক একটি গ্রামের স্মৃতি অঞ্জনার চোখে যেন অঞ্জন লাগিয়ে রেখেছে সেই থেকে।

মোটরলঞ্চ থেকে নেমেও দীর্ঘ পথ ধরে সবুজ গাছের মিছিল। মধ্য গাঙের ভয় কাটিয়ে একটা পরম মুক্তির নিশ্চিন্ত আস্বাদ পায় যেন অঞ্জনা। নীল আর সবুজের দেখা কতটুকুই বা মেলে কলকাতায় বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়? গোসাবার পথ চলতে চলতে তাই আনন্দে প্রাণ-মন ভরে ওঠে অঞ্জনার।

শান্ত স্তব্ধ গ্রাম-পরিবেশ। কিন্তু অদূরেই কিসের একটা গোলমাল বলে মনে হচ্ছে না?

হ্যাঁ, তাই। তবে কোনো শহরের হট্টগোল নয়। হাট বসেছে শনিবারে, এ তারই কোলাহল।—শৈবালের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন অমরেশবাবু।

পিছিয়ে পড়তে পড়তে ততক্ষণে একেবারে শৈবালদেরই সঙ্গী হয়ে পড়েছেন পরিচালক অমরেশচন্দ্র। শিখাকে একটু কাবু মনে হওয়ায় তাকে কোলে নিয়েই তিনি চলেছেন। এবং এরই মধ্যে শিখা বেশ গভীর ভাবও জমিয়ে নিয়েছে তাঁর সঙ্গে। মুখে যেন তার খৈ ফুটছে। এমনি একের পর এক প্রশ্ন সে করে চলেছে। সেই সব আজগুবি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এমনিতেও একটু হয়রান হবারই কথা।

অমরেশবাবুর পিছিয়ে পড়ার আসল কারণও তাই।

তবে ওর বাবাকে কথা বলতে শুনে *শিখা কিন্তু থেমে যায়। আর* কোনো নতুন প্রশ্ন করে না। পথের দু পাশের মাঠে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট ছোট সরু সরু যে গাছগুলো বাতাসে কেবলই দুলছে,

এক একবার একবারে শুয়ে শুয়ে পড়ছে আবার উঠছে, সেগুলোই যে ধান গাছ এবং তাদের খাবারের ভাতের চাল যে এই ধান থেকেই পাওয়া যায়, তার শেষ প্রশ্নের এ উত্তর পাওয়ার পর থেকে এক নজরে শিখা সেদিকেই শুধু তাকিয়ে আছে।

কিন্তু সুন্দরবনে হাট! বাস্তবিকই চমক লাগে হঠাৎ শুনলে। অঞ্জনা যে তা শুনে বিস্মিত হয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। তার ধারণা ছিল, গোসাবায় যে সামান্য কিছু লোকজন থাকে তাদের কেনাকাটা সবই চলে কলকাতায়। অমরেশবাবু সব কথা বুঝিয়ে বলায় তার সেই ভুল ভাঙে।

সত্যি কথা আজ অবশ্য গোসাবা অঞ্চলে লোকসংখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে হাজার পনেরো। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে স্কটল্যাণ্ডবাসী স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন যখন এ অঞ্চলে আসেন লোকবসতি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে, তখন এই অতি আশাবাদী মানুষটি এবং তাঁর আর কয়েকজন সহযোগী ছাড়া অন্য কেউ ভাবতেই পারেন নি, এ এলাকায় কোনোকালে এমনিভাবে হাট বসবে, মানুষের মিছিল দেখা যাবে, কোলাহলমুখর হয়ে উঠবে গোসাবা পল্লী।

অসংখ্য খালে নালায় ছিন্নবিছিন্ন বনজঙলাময় এ অঞ্চলটি তখন সমুদ্রের লোনা জলে প্লাবিত হত অহরহ। কাঠুরে আর শিকারী ছাড়া সে সময় মানুষের মুখ বড় একটা দেখা যেত না কখনো।

সুন্দরবনের আশপাশের পল্লীগুলোতে তখন মহাজন ও জমিদারের অবর্ণনীয় জুলুম আর শোষণ চলেছে চাষী গৃহস্থদের ওপর। এদিকে *ব্রিটিশ সরকারের চরম নির্যাতনে* বিক্ষুব্ধ এদেশের সাধারণ মানুষ।

জমিদার মহাজনের কবলমুক্ত একটি সুখী সমাজ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন স্যার ড্যানিয়েল। একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি দেখাতে চাইলেন, সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়—নিজের সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষা করে সাধারণভাবে খেয়ে পরে থাকতে পারলেই এ দেশের লোক খুশি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাঁর পরিকল্পনা

রূপায়নে এগিয়ে চললেন তিনি দেশের সরকার ও সর্বসাধারণের বিস্ময় সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের মানুষের জন্যে একজন বিদেশীর এই প্রয়াসের কথা শুনে অঞ্জনাও বড় কম অবাক হচ্ছিল না। বড় বড় চোখ করে অঞ্জনা সে কথাই জিজ্ঞেস করছিল শৈবালকে। অল্প কথায় শৈবাল তাকে জানিয়ে দিলে যে, এর আগেও ভারতের কল্যাণের কথা অনেক বিদেশী ভেবেছেন এবং অনেক মহান বিদেশী অনেক কিছু করেছেনও। তবে স্যার ড্যানিয়েল নতুন দিক থেকে চিন্তা করেছেন এবং নতুন ধরনের একটা কাজে হাত দিয়েছিলেন বলেই এদিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

শৈবাল তার কথা শেষ করতেই বৃদ্ধ অমরেশবাবু আবার বলে চলেন কী করে ধীরে ধীরে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গড়ে উঠছে এই পরিচ্ছন্ন পল্লী গোসাবা।

অজস্র খালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে বাঁধের পর বাঁধ নির্মাণ করে পল্লীর বিস্তার যেমন চলতে থাকল একদিকে, তেমনি বাইরে থেকে নতুন নতুন লোক আমদানির সঙ্গে সঙ্গে চাষ-আবাদের কাজও চলতে থাকে। পানীয় জলের ব্যবস্থা হল জলাশয় খনন করে, প্রতিষ্ঠিত হল দাতব্য চিকিৎসালয় আর একটি গ্রাম্য বিদ্যায়তন। নিজের খরচে একটি ছোট ডাকঘরেরও পত্তন করলেন স্যার ড্যানিয়েল। বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হল বিচ্ছিন্ন গোসাবার এই ডাকঘরের মাধ্যমে। সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর কতদূর উন্নতি সাধন যে সম্ভব স্যার ড্যানিয়েল তা প্রমাণ করে গেছেন। আজকের গোসাবাই তার সাক্ষ্য।

বলতে বলতে অমরেশবাবু যেন একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, কেমন একটা জড়তা এসে তাঁর কণ্ঠকে যেন মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ করে দেয়।

তবে পরক্ষণেই আবার তিনি হতাশার সুরে বলতে শুরু করেন—

তবে কি জানেন শৈবালবাবু, স্যার ড্যানিয়েলের মৃত্যুর পর থেকে আমার কেন জানি কেবলই মনে হচ্ছে, এসব কিছুই থাকবে না। যে সহযোগী বন্ধুর ওপর নির্ভর করে স্যার ড্যানিয়েল এত সব করেছেন তিনিও পঙ্গু অথর্ব। তাঁর পরে এই স্টেটের ভার নেবার মতো লোক আর দেখছি না। আদর্শ মানুষ না থাকলে একটা বড় আদর্শকে সাধারণ মানুষের সামনে কে তুলে ধরে রাখবে বলুন।

অমনি করে কেন ভাবছেন অমরেশবাবু? স্টেট বা জমিদারী বলে তো আর কিছু থাকছে না, শিগগিরই সমস্ত জমিদারী লোপ পেয়ে যাচ্ছে—সব সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে। সরকারী ব্যবস্থাপনায়ই এখানকার সব কিছু ঠিক মতো চলবে, সে সম্পর্কে ভাববার কিছু থাকতে পারে বলেই তো আমি মনে করি না।

শৈবালের কথায় অমরেশবাবুর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। তিনি আর ও-বিষয়ে কোনো কথা তোলেন না। শুধু শিখাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলেন, এই যে আমরা এসে পড়েছি, এটুকু তুমি দিদি বেশ হেঁটে যেতে পারবে। ঐ যে দেখছ না শাদা দালান বাড়িটা, ওখানে গেলেই তুমি দেখতে পাবে তোমার জন্যে কত খেলনা কত খাবার! খুব ভাল লাগবে তখন, তাই না?

শিখাও মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, খুব ভাল লাগবে। আর নিজের গালে-মুখে বুলিয়ে বুলিয়ে সে হাতের গোলাপটিকে আদর করে। লঞ্চ থেকে নামতেই হাতে হাতে একটি করে গোলাপ ফুল দিয়ে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। সেই থেকে তার বাবা-মায়ের মতো শিখাও সে ফুলটিকে বেশ সযত্নে হাতে করেই রেখেছে—শিশু-খেয়ালে ফেলে দেয় নি।

মেয়েটিকে খুবই ভাল লেগে গিয়েছে অমরেশবাবুর! তাকে কোল ছাড়া করতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তিনি আর বয়ে নিতে পারছিলেন না শিখাকে। তাঁর বেশ কষ্টই হচ্ছিল।

সেদিকে কিন্তু অঞ্জনার নজর পড়েছিল অনেক আগেই। এরই

মধ্যে দু-দুবার সে ডেকে বলেছে, শিখাকে এবার নামিয়ে দিন অমরেশবাবু। টুক টুক করে ও নিজেই দেখবেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে চলে যাবে। দরকার হলে আমরা কেউ না হয় কোলে নেবো'খন।

অমরেশবাবু অঞ্জনার কথা গ্রাহ্য করেন নি। যতদূর পর্যন্ত পেরেছেন শিখাকে তিনি কোলে বয়েই নিয়ে এসেছেন। আর এখন তো একরকম কাছারি বাড়ির অতিথিশালার প্রায় গোড়ায়। তাই একটু রাগের সুরেই শিখাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে অঞ্জনা, হতচ্ছাড়া মেয়ে কোথাকার—পুরো পথটাই একেবারে তিনি কোলে চড়ে চলে এলেন! আবদারের বলিহারি যাই!

ও কি, শিশুকে কি অমনধারা মুখ করতে আছে মা!—এই বলে মৃদু তিরস্কার করেন অমরেশবাবু। পথেরও শেষ ঘটে।

পৃথিবীর রঙবদল চলেছে তখন। আকাশে সন্ধ্যা নামছে।

মানুষ মরে গিয়েও কী ভাবে তার আপন কাজের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে এখানে এসে সত্যি তা অনুভব করা যায়।—কাছারি বাড়িতে ঢুকতেই সামনে স্যার ড্যানিয়েলের মর্মর মূর্তি দেখে শৈবালের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই কথা। প্রীতিবাদের প্রতীক এই প্রতিমূর্তি। পারস্পরিক প্রীতিবাদেই সমবায়ের সার্থকতা। শৈবালও যে সমবায়ী। সমবায়ের সফল রূপায়নের নানা দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে তাই সে এত মুগ্ধ।

স্যার ড্যানিয়েলের নানা কল্যাণ প্রয়াস ও তার সাফল্য দেখে এক সময় রবীন্দ্রনাথও যে কত প্রশংসা করেছিলেন কাথায় কথায় অমরেশবাবু সে-সবেরও উল্লেখ করেন শৈবাল ও অঞ্জনার কাছে। রবীন্দ্রনাথ গোসাবায় এসে যে কুটীরে কয়েকদিন কাটিয়ে গেছেন দর্শকদের জন্যে তা সংরক্ষিত আছে, সে কথাও তিনি জানালেন।

কিন্তু এখন আর কথা নয়। অমরেশবাবু অতিথিদের তাগিদ

দিলেন বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে, হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলযোগ করে নেবার জন্যে।

কাছারি বাড়িতেই অতিথিশালা। পাকা বাংলো বাড়ির এক-তলায় রোজ কাছারি বসে সকালে বিকালে। অনেক রাত অবধি চলে অফিস। স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের কাছে এ কাছারিই কলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিংস'। অফিসটি সাজানোও অনেকটা সেই ধরনেই।

অতিথিনিবাস এ বাড়িরই দোতলায়। সুন্দর ফিটফাট। আধুনিক প্রায় সমস্ত রকম ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মধ্যনদীতে মোটরলঞ্চ থেকে এ বাড়িটিরই শুভ্রশোভা হয়তো চোখে পড়েছিল—অঞ্জনা আন্দাজ করে। শৈবালকে প্রশ্নও করে জানবার জন্যে।

শৈবালের হয়ে অঞ্জনার আন্দাজকে সমর্থন করে উত্তর দেন অমরেশবাবু। বলেন, সত্যি সত্যি অনেক দূর থেকে গোসাবাকে নির্দেশ করে এ বাড়ি। এ বাড়িটাই আমি আপনাদের লঞ্চ থেকে দেখিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এ বাড়িটাই বুঝি দেখিয়েছিলেন! দোতলা হলেও বেশ উঁচু বাড়ি, তাই অত দূর থেকেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।—গলার টাইটা খুলতে খুলতে শৈবাল একবার মুখ খোলে।

এই যে এত লোকের আনাগোনা দেখছেন কাছারিতে, এদের বাপ-ঠাকুর্দাদের অনেকেই ছিল কয়েদী শ্রেণীর মানুষ। সমাজে এরা সবাই ছিল অবাঞ্ছিত। অথচ এরাই গড়ে তুলেছে সুন্দরবনের এই সুন্দর পল্লীটিকে—অমরেশবাবু চায়ের আসরেও নতুন করে আরেকবার প্রসঙ্গ তুলতে ভুল করেন না।

সমবায়ের সুস্থ পথে এই আসামী অসভ্য শ্রেণীর মানুষগুলোর জীবনে যে স্বাভাবিক গতিপথ খুঁজে পেল, পরিবার পরিজনের পরিবেশ

তাদের যে পুনর্বাসন ঘটল সে কি বড় কম আনন্দের কথা। সুন্দরবনের ভেতর গোসাবার মতো অন্যান্য আরো যে সব পল্লী গড়ে উঠেছে তার প্রতিটির ইতিহাসই প্রায় একই ধরনের। সভ্যজগতের স্পর্শ পেয়ে এই বন্য মানুষগুলো সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এ কথা জেনে কার না আনন্দ হবে, বলুন তো! বলতে বলতে অমরেশবাবু নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু সবই তো বুঝলুম, আমাদের প্রোগ্রামটা কি ঠিক করলেন, তাই আগে বলুন দেখি শুনি।—অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করে বসে অঞ্জনা।

এতক্ষণ কিন্তু অমরেশবাবুর মুখে গোসাবা এবং সুন্দরবনের গল্প শোনার চাইতেও অঞ্জনার মন ছিল ছাদের ওপর শিখার নাচানাচি ছুটোছুটির দিকেই বেশি।

শিখা দু পিস মাখনরুটি ও সামান্য মিষ্টি খেয়ে সেই সে বেরিয়ে এসে ছাদে একক খেলায় মেতে রয়েছে, আর ফেরবার নামটিও নেই। ছাদের এক কোণায় সে একটি গণেশমূর্তি আবিষ্কার করে নিয়েছে। বাড়িতে সে তার মাকে দেখে নানা দেবদেবীর ছবিকে ফুল দিয়ে সাজাতে। তার মায়ের লক্ষ্মীর আলনায় একটি গণেশের ফটোও আছে। সেই ফটোও রোজ সাজানো হয়। কিন্তু এখানে গণেশ বেচারা এমনি পড়ে আছে দেখে শিখা ভারি দুঃখ বোধ করে। তার হাতের গোলাপ ফুলটি সে গণেশের পায়ের কাছে রেখে দেয়। কিন্তু একটি ফুলে গণেশকে সাজিয়ে সে খুশি হতে পারে না। আর ফুলের কি অভাব এখানে? ছাদের ওপরেই তো টবের গাছে গাছে ফুল ভর্তি। কী বড় বড় এক একটা গাঁদা ফুল! এদিকওদিক ছুটোছুটি করে তারই কতকগুলো তুলে এনে বেশ সুন্দর করে গণেশঠাকুরকে সাজিয়ে নিয়েছে শিখা। আর তাতেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে খোলা ছাদে অপার আনন্দে সে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে।

রাত হয়ে গিয়েছে। তা হলেও এখানে ভয় পাবার কিছু নেই।

কলকাতার মতোই সুন্দরবনের এই পাড়াগাঁয়ে ইলেকট্রিকের আলো এসেছে। সেই আলোই শিখার মন থেকে সমস্ত ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাই তার নির্ভয় আনন্দ এমনি ছেদহীন! আর মেয়ের সেই আনন্দ-নৃত্যই মা চায়ের আসর থেকে বসে বসে দেখছিলেন একদৃষ্টে।

তা হলেও অঞ্জনা চা খেতে খেতে হঠাৎ এমনিভাবে তাদের প্রোগ্রামের কথাটা পাড়লে, যাতে অমরেশবাবুর গল্প সে শোনে নি কেউ মনে না করতে পারে। শুধু শোনা নয়, একেবারে সে বুঝে নিয়েছে এমন একটা ভঙ্গিতে সে প্রোগ্রামের ব্যবস্থা কতদূর কি হয়েছে তা জেনে নিতে চাইলে।

আরে প্রোগ্রামের জন্যে ভাবনা কি, ও তো পাঁচ মিনিটেই ঠিক করে নেওয়া যাবে। কাল সকাল বেলাই আপনাদের সব জানিয়ে দেব।

তাই তো, ঠিকই বলেছেন অমরেশবাবু। প্রোগ্রামের জন্যে তোমারই বা এতটা উতলা হবার কি কারণ ঘটল হঠাৎ ?—শৈবালের পাল্টা প্রশ্নে বেশ একটু বিব্রতই বোধ করে অঞ্জনা।

তবু সে বলে, না তেমন কিছু যে উতলা হয়েছি তা নয়। তবে মাত্র তো দু রাতের জন্যে আসা, সোমবারেই আবার ফিরতে হবে। হাতে মাত্র একটি দিন সময়—কাল রবিবার। তাই ভাবছিলাম একবার যখন এসেছি সব কিছু দেখে যাব। তা না হলে আপসোস থেকে যাবে না! প্রোগ্রামের কথাটা সে জন্যেই তুলেছিলাম।

এরই মধ্যে সব দেখিয়ে দেব, কিছুই বাকি থাকবে না। আর যদি নেহাতই দরকার হয় একটা দিন না হয় বেশিই থেকে যাবেন। শৈবালবাবু একজন কর্তা মানুষ—বড় অফিসার, তাঁর তো আর চাকরির ভয় নেই।

এখানেই একটা মস্ত ভুল করে বসলেন অমরেশবাবু। বড় অফিসারদেরই বেশি করে দায়িত্ববোধ থাকা দরকার। দুর্ভাগ্যের

কথা আমাদের মধ্যে সেই দায়িত্ববোধের অভাবের জন্যেই দেশের শাসনকার্যে এত বেশি ত্রুটি-বিচ্যুতি, এত গলতি। যেমন করেই হোক সোমবার আমাকে অফিস করতেই হবে এবং সকাল বেলা এখান থেকে রওনা হতেই হবে।

শুনলেন তো ওর কথা। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ-ভালুক আর হরিণই যদি না দেখা হল তা হলে কী দেখতে এলুম এখানে বলুন তো! কেন শুধু শুধু আমাদের কলকাতা থেকে নিয়ে আসা!—অমরেশবাবুকে লক্ষ্য করে বলা হলেও স্বামীর বিরুদ্ধেই তার চাপা অভিমান ও অভিযোগ প্রকাশ পেয়ে যায় অঞ্জনার এই কথা কটিতে। রাগে ক্ষোভে সে আরো বলে ফেলে, কেবল অফিস অফিস অফিস আর বাড়িতে গাদা গাদা ফাইল—আমাদের সঙ্গে ওর আর কতটুকু সম্পর্ক!

প্রবীণ ও প্রখরবুদ্ধি মানুষ অমরেশবাবু। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি সহজেই শান্ত করলেন অঞ্জনাকে।

আরে বাঘ-ভালুক সে সব তো নিশ্চয়ই দেখবেন। কিন্তু তার আগে বাঘ-ভালুকের দেশ সুন্দরবনে যে সব মানুষরা এসে ঘর বেঁধেছে, হিংস্র পশুদের প্রতিবেশী হিসেবে এখানে বংশপরম্পরায় বছরের পর বছর ধরে বাস করছে তারাও কি দেখবার মতো নয়? তাদের কথাও কি শোনার মতো ও জানার মতো নয়।

অমরেশবাবুর এ প্রশ্নের পর সারা হলঘরটি স্তব্ধ হয়ে থাকে মুহূর্তের জন্যে। অঞ্জনা কোনো জবাব খুঁজে পায় না, কি বলবে কিছু বুঝতে পারে না। আবার কি বলতে কি বলে ফেলে অঞ্জনার রাগের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বিপদ ঘটিয়ে বসবে এই ভয়ে শৈবালও এত তাড়াতাড়ি মুখ খুলতে ভরসা পায় না।

অগত্যা সেই নীরবতাকে খান খান করে ভেঙে দিয়ে অমরেশ-বাবু বলেন, কাল সকালেই সুন্দরবনের সরল চাষাভুষোদের একদল প্রতিনিধি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাদের দেখলেই

বুঝবেন কত অত্যাচার কত লাঞ্ছনা তারা দীর্ঘকাল ধরে সহ্য করেছে। তাদের মুখেই তাদের কথা শুনবেন। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি তাদের দেখে তাদের কথা শুনে বাঘ-ভালুক দেখার চেয়ে কম ভাল লাগবে না আপনাদের।

নিশ্চয়ই, তাদেরই তো আগে দেখতে হবে। সত্যি অঞ্জনা, তোমার কিন্তু ভারি অন্যায় হচ্ছে।—মোলায়েম সুরে স্ত্রী-শাসন করে শৈবাল।

বা রে, কী আবার অন্যায় করা হল। বাঘ-ভালুক-কুমীর আরো কত কি দেখার কথা বলেই তো তুমি শিখাকে সঙ্গে আনতে পারলে। তা নইলে সে তার ঠাকুমার আদর ছেড়ে তোমার সঙ্গে আসতই ভারি!

কিন্তু সে তো শিখার কথা। শিখার মাও শিখার মতো বায়না ধরবে এ-ও নিয়ে তা কি প্রশংসনীয় বলতে হবে?

ঠিক আছে শৈবালবাবু, এ কোনো তর্কের ব্যাপার নয়। শিখা এবং তার বাবা-মা সবাইকে খুশি করার মতো ব্যবস্থা বাকি সময়টুকুর মধ্যেই আমরা করতে পারব এ আশ্বাস আমি দিতে পারি।

সে কথা নয় অমরেশবাবু, গভীর অরণ্যের মধ্যে কী ভাবে এমন সুন্দর পল্লী গড়ে উঠেছে এবং সে পল্লী এগিয়ে চলছে তা দেখবার জন্যে আপনি আমাদের আদর-যত্ন করে নিয়ে এলেন। তা না দেখে প্রথমেই সুন্দরবনের বাঘ-ভালুক দেখবার দাবি করাটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না, মিসেস দাসকে এ স্বীকার করতেই হবে।

তা না হয় মানলুম। কিন্তু নিজে যে এত বড় বন্দুকটা ঘাড়ে করে নিয়ে এলে সে কোন্ সাধে? শেষ পর্যন্ত সে সাধ যদি পূরণ না হয় তখন কেমন লাগবে?—আর কোনো পথ না পেয়ে ব্যক্তিগত একটি প্রশ্নের আক্রমণে শৈবালকে কাবু করতে চায় অঞ্জনা।

এদিকে দড়ি টেনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজায় দারোয়ান। ঘণ্টার খুব জোর আওয়াজ। বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায় সেই শব্দ। কাছারি

বাড়ির ছাদের ওপরেই প্রকাণ্ড সেই ঘণ্টা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দারোয়ান এসে তা বাজিয়ে যায়। গোসাবার সাধারণ মানুষ সময় জানতে পায় এভাবে।

ঘণ্টার প্রচণ্ড শব্দ শুনে শিখা তার খেলা ফেলে দৌড়ে ছুটে আসে তার মায়ের সামনে। অবাক হয়ে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাত তখন আটটা।

উরে বাপস্, গল্পে গল্পে একেবারে আটটাই বেজে গেল। আমি এবার যাই তা হলে, একবার গিয়ে অন্তত দেখে আসা যাক আপনাদের রাত্রির আহারের কতদূর কি বিধিব্যবস্থা হয়েছে।

তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার কি আছে অমরেশবাবু? কলকাতা থেকে একটানা কেবল তো খেতে খেতেই এসেছি। তার পর এখানে এসে জলখাবারের যে বিরাট পর্ব শেষ করা গেল, তার পরে এত তাড়াতাড়ি আরেক দফা আহারের কথা ভাবতেই পারছি না। অন্তত আরো ঘণ্টা দুই আপনি আমাদের খাওয়ার ভাবনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকতে পারেন।

তবু একটু দেখে আসি।—এই বলে অমরেশবাবু উঠে পড়েন। কিন্তু পা বাড়াতেই বাধা।

শৈবালও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, কিন্তু দেখবেন যেন দেরি না হয়। ঘুমের আগে রোজ রাত্রিতে অনেকগুলো আবৃত্তি করে শিখা। অন্যকে আবৃত্তি শোনাতে ওর খুব আনন্দ। আপনিও খুব খুশি হবেন ওর আবৃত্তি শুনে।

তাই নাকি, সে তো ভারি মজার কথা!—বলতে বলতে অমরেশবাবু সিঁড়ি বেয়ে গট্‌গট্ করে নিচে যান। নামতে নামতেই শুনতে পান অঞ্জনা বলছে শৈবালকে লক্ষ্য করে, তবু ভাল মেয়ের আবৃত্তির কথা বলেছ—আমাকে আবার গান গাইতে বল নি!

এর পরেই অঞ্জনাও বাইরে বেরিয়ে ছাদের উঠোন থেকে শিখাকে ঘরে টেনে নিয়ে আসে।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ, শীত না পড়লেও রাত্রির খোলা হাওয়ায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে বাচ্চা মেয়ের অসুখবিসুখও হয়ে যেতে পারে, এই ভয়।

অমরেশবাবু ফিরে আসতে বেশি দেরি করেন না। মিনিট দশেকের মধ্যেই রসুইঘরের তদারকি শেষ করে তিনি শিখার আবৃত্তি শোনার জন্যে ছুটে আসেন। তবে এবার একা আসেন না, সঙ্গে নিয়ে আসেন অরিজিৎবাবুকে।

অরিজিৎ মুন্সী গোসাবা স্টেটের পুরানো আমিন। তবে আজকাল তিনি সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন এ স্টেটের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে। হালে প্রায়ই তাঁকে বিরক্তির সুরে বলতে শোনা যায়, 'লোকের তুমি যতই ভাল কর না কেন, এই মানুষ জাত এমনই নচ্ছার যে আইন-আদালতের ঝামেলা থেকে তোমাকে সে কিছুতেই রেহাই দেবে না।'

মুন্সীবাবু নামেই তিনি গোসাবার সর্বত্র পরিচিত। কালো মিশমিশে সেই মধ্যবয়সী লোকটি ঘরে ঢুকেই আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কিছুটা খুশির আতিশয্য প্রকাশ করলেও শৈবাল তাঁকে চট করে চিনে উঠতে পারে না। সে একটু লজ্জাও পায় তার জন্যে। চুপচাপ বসে দু-এক সেকেণ্ড চিন্তা করে।

মনে হচ্ছে আপনি আমায় চিনতে পারছেন না। আমি আপনার মামাতো বোন কমলার খুড়শ্বশুর। এই তো মাত্র মাসখানেক আগে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সত্যেন আর কমলা এখানে বেড়িয়ে গেল।

ও হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। ঠিক মনে পড়েছে। কমলার বিয়ের সময়েই আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তবে সেও তো দেখতে দেখতে প্রায় চার বছর কেটে গেল। তাই মনে করতে পারছিলাম না, অপরাধ নেবেন না।—বলেই গুরুজনের প্রাপ্য প্রণামটা মিটিয়ে দেয় শৈবাল এবং তার দেখাদেখি অঞ্জনাও।

না-না, অপরাধ আবার কিসের? সেই বিয়ের পর তো দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। হঠাৎ মনে না পড়বারই কথা। সে যাই হোক, মামলার হাঙ্গামা সেরে ব্যারাকপুর থেকে ফিরতে আজ রাত হয়ে গেল। তাই এখন আর বিরক্ত করতে চাই নে। তবে আত্মীয়-বাড়িতে একবার তো যেতেই হবে, কাল বিকেলে চা-এর আসরটা আমার ওখানেই বসবে, কি বলেন অমরেশবাবু?

সে হবে'খন। ও নিয়ে আবার ভাবনার কি থাকতে পারে। এদিকে আমাদের শিখাদির না জানি ঘুম পেয়ে গেল! আগে ওর আবৃত্তিটা শুনে নি। এস দিদি, এদিকে এস দেখি। সুন্দর সুন্দর ক'খানা পদ্য শুনিয়ে দাও আমাদের।—এই বলে অমরেশবাবু কাছে টেনে নেন শিখাকে। পরক্ষণেই আবার বলেন, কিন্তু ওর খাওয়াটা তো আগেই শেষ করে নেওয়া উচিত। তা নইলে দিদিমণি তো ঘুমিয়ে পড়বে।

না-না, এইমাত্র ওকে হরলিক্স আর সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছি। ও আর কিছু মুখেও নেবে না।—অঞ্জনা জানিয়ে দেয়।

ও তাই বুঝি! বেশ, তা হলে বসে আবৃত্তিই শোনা যাক্। নাও, এবার তবে আরম্ভ করে দাও।—অমরেশবাবু তাকে আদর করে পিঠ চাপড়ে এ আদেশ করতেই শিখা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে টালুমালু করে তাকায় একবাব তাব বাবার দিকে, একবার মায়ের দিকে। সেই তাকানোর মধ্যে একটা গর্বের ছায়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটি দিয়ে আবৃত্তি শুরু করতে বলে অঞ্জনা।

মায়ের অভয়বাণী পেয়ে শিখা আরো হাসিখুশি! সে সম্পূর্ণ নির্ভয়। নিঃসঙ্কোচ। উচ্চারণের অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তার অপূর্ব ভঙ্গিতে বলার মিষ্টতায় অমরেশবাবু ও মুন্সীবাবু মুগ্ধ হয়ে শিখার কণ্ঠে শোনেন:

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে

সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানী ॥
... ...
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ পানে চেয়ে,
আমার বীণার মতোই যেন অমনি এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে
নিবত যদি আলো, হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে 'হারিয়ে গেছি আমি'।

আর প্রথম আবৃত্তি শেষ করে শিখা হেসে ফেলতেই 'অপূর্ব অপূর্ব' বলে চিৎকার করে ওঠেন ওরা, অমরেশবাবু কোলে টেনে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে অস্থির করে তোলেন ওকে।

এই একরত্তি মেয়ে এত বড় একটা কবিতা অনর্গল বলে গেল, আশ্চর্য!—গভীর বিস্ময় প্রকাশ করলেন মুন্সীবাবু।

কিন্তু তবু ছাড়াছাড়ি নেই। শিখাকে পর পর আরো তিনখানা আবৃত্তি শোনাতে হল। রবীন্দ্রনাথের 'খেলনার মুক্তি'—এক আছে মণিদিদি, আর আছে তার ঘরে জাপানী পুতুল—নাম হানাসান।... কাল হবে অধিবাস, পরশু হবে বিয়ে।...ইত্যাদি।

এর পর সত্যেন দত্ত ও নজরুল ইসলামের একখানি করে আবৃত্তি শুনিয়ে তবে শিখার নিষ্কৃতি।

ঘুমও পেয়ে গেছে মেয়ের। ছুটে গিয়ে শিখা পাশের ঘরে শুয়ে পড়ে। অঞ্জনা বললে, নটার মধ্যেই ওর ঘুমোনোর অভ্যেস। আজ তো হৈ-হল্লায় মেতে গিয়ে তবু দশটা পর্যন্ত জেগে রয়েছে।

অমরেশবাবু তাঁর বুকপকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলেন, সত্যিসত্যি তখন রাত দশটা বেজে পাঁচ।

তার পর রাতের খাওয়া সারতে সারতে আরো প্রায় এক ঘণ্টা। খাবারের মেন্নুর যেন আর শেষ নেই। একটু একটু করে মুখে দিতে দিতেও শৈবাল হাঁফিয়ে ওঠে। অঞ্জনারও একই অবস্থা। শেষ পর্যায়ে এসে আর কোনো কিছুতেই ওদের হাত দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

কিন্তু কী সুন্দর চেঁচেমুছে খেয়ে চলেছেন ওরা দুজন—মুন্সীবাবু এবং অমরেশবাবু! এবং ওঁদের পীড়াপীড়িতেই একটু একটু করে অতিভোজনে অস্বস্তি বোধ করতে হচ্ছে শৈবাল এবং অঞ্জনাকে।

বা রে ওই জিনিসটাই সরিয়ে রাখছেন? কিছুই তো খেলেন না, কিন্তু সুন্দরবনের যা আসল বৈশিষ্ট্য তাকে এমনিভাবে উপেক্ষা করা তো চলতে পারে না।

সত্যি কথা, একেবারে খাঁটি কথা বলেন মুন্সীবাবু। এখানে আমরা সুন্দরবনের খাঁটি মধু খাইয়েই অতিথিদের ভোজনপর্বের সমাধা করে থাকি।

অনুরোধে ঢেকিও গিলতে হয়। এবং শৈবাল অঞ্জনাকেও তাই করতে হল। ছোট্ট শ্বেতপাথরের বাটি থেকে দু জনকেই একটু করে খাঁটি মধু চাখতে হল। স্বাদ চমৎকার, কিন্তু সঙ্গী দু জনের মতো সে মধু নিঃশেষে শেষ করা ওদের দু জনের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

বিদায় নিয়ে অমরেশবাবু ও মুন্সীবাবুর বেরিয়ে যেতে রাত এগারোটা পেরিয়ে যায়।

তাঁদের বিদায় দিতে শৈবালও এসে ছাদে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায়। বাইরে চতুর্দিক নিঝুম নিস্তব্ধ। ওরা চলে যাবার পর শৈবালের গাটা কেমন যেন ছম ছম করে উঠল। ভাগ্যি অঞ্জনা তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে নি। তা হলে নিশ্চয়ই সে ভয়ে হয়তো চিৎকার করে উঠত। তবু তো এখন শুক্লপক্ষের রাত চলছে। তা

নইলে কৃষ্ণপক্ষের রাতে বাইরের ঘোর অন্ধকারের দিকে একবার চোখ পড়লে আর রক্ষা থাকত না, সারা রাত অঞ্জনা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় কুঁকড়ে পড়ে থাকত—খাওয়া-দাওয়ার কথা কানে পর্যন্ত তুলত না। সে সব ভাবতে ভাবতেই চটপট ঘরে ঢুকে গিয়ে খিল আটকে দেয় শৈবাল।

দু ঘরে দুটো হ্যাজাক লাইট জ্বলছে সেই সাড়ে আটটা থেকে। নটায় ইলেকট্রিকের আলো বন্ধ হয়ে যায় বলে অতিথিশালার জন্যে এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অঞ্জনার কোনো ভয়-ডর লাগে নি। তা ছাড়া অমরেশবাবু এবং মন্সীবাবু ছিলেন, রাত এগারোটা পর্যন্ত বেশ হৈ-চৈ করেই কেটে গেছে।

এবার বেশ ঘুম পেয়ে গেছে অঞ্জনার। শৈবালের। কিন্তু আলো নেভানো চলবে না। অঞ্জনারই নিষেধ। অজানা-অচেনা জায়গা। রাত্তিরে কখন কার উঠতে হবে, তাই।

ওরা ঘুমিয়ে পড়ে শিখাকে মাঝখানে রেখে।

অজানা অচেনা রাজ্যে দুটি হ্যাজাক লাইটের আলো ওদের পাহারাদার।

॥ ২ ॥

পরদিন বেশ সকাল সকাল ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে শৈবালদের দেরি হয়ে যায়। নানা জাতের পাখির কল-কাকলি, কাকের কা-কা রবে বেলা অবধি ঘুমোনোর উপায় আছে সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চলে? নেহাত ক্লান্তি এবং আলস্যের জন্যেই এতক্ষণ শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে নি শৈবাল এবং অঞ্জনা।

অমরেশবাবু অনেকক্ষণ আগেই একবার লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছেন অতিথিরা উঠেছেন কিনা, তাঁদের চা পাঠানো হবে কিনা।

সে লোক গিয়ে খবর দিয়েছে, ঘরে তখনো আলো জ্বলছে—

সবাই ঘুমুচ্ছেন। দ্বিতীয়বার আধঘণ্টা বাদে খবর নিতে গিয়ে দোরে ছোট্ট করে টোকা দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসে শৈবাল।

আরে এই ওঠো, অমরেশবাবু বোধ হয় খোঁজ করছেন।—এই বলে অঞ্জনাকেও ঠেলে তোলে। আর এই হল্লায় শিখারও ঘুম ভেঙে যায়। সেও গায়ের চাদর সরিয়ে উঠে বসে চোখ রগড়াতে থাকে।

বাবু, আপনাদের চা নিয়ে আসব?

হ্যাঁ নিয়ে এস।—বাইরের হাঁকের এই উত্তর দিয়ে নিচে নেমে এসে তাড়াতাড়ি হ্যাজাক লাইট দুটো নিভিয়ে দেয় শৈবাল। তার পর দোর খুলে দেখে বাইরে কত বেলা—রীতিমতো চারিদিক ছেয়ে গেছে রোদে! লজ্জায় সে জিভ কাটে।

যারা কাজের মানুষ এমন সময় বেড-টি খেলে তাদের চলে? কোনো কাজ মাথায় নিয়ে এখানে আসা হয় নি রক্ষে! মনে মনে কিছুটা আত্ম-তিবস্কারেব পর কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পায় শৈবাল এই ভেবে।

এদিকে চাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়েই স্বয়ং অমরেশবাবু হাজির।

কী, ভাল ঘুমটুম হয়েছিল তো রাতে? কোনোরকম অসুবিধে হয় নি?

না না, কিছু না। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। তাব পর কখন রাত ভোর হয়েছে তাও ভাল করে টেব পাই নি। এক আধবার কাকের ডাক পাখির কিচিরমিচির কানে গিয়েছিল মাত্র। দেখছেন না কত দেরি হল উঠতে। আমরা সত্যি বিঘোরে ঘুমিয়েছি।

তা তো হবারই কথা। সাবাদিন ধরে দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি তো বড় কম হয় নি। তা হলেও আমি কিন্তু অনেকক্ষণ আগেই জেগেছি। তবে এসব হাঁটাহাঁটি খাটাখাটিতে আমরা অভ্যস্ত। এ ধরনের ছুটোছুটিতে আপনাদের মতো লোকের ক্লান্ত হয়ে পড়ারই কথা। ঐ যে মুন্সীবাবুও এসে পড়েছেন গাঁয়ের চাষী প্রতিনিধিদের

নিয়ে। নিন ধীরে-সুস্থে আপনারা চা-টা খেতে থাকুন। ওরা আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসছে। ওদের সঙ্গে কথাবার্তার পর ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা হবে।—এই বলে অমরেশবাবু নিজেও এক কাপ চা তুলে নিলেন এবং বয়কে আরেক পট চা আনবার অর্ডার দিলেন।

স্লিপিং স্যুটের ওপরেই একটা চাদর জড়িয়ে নিয়ে শৈবাল চায়ের কাপে চুমুক দিতে শুরু করে দিয়েছে অমরেশবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে। শিখাকে নিয়ে অঞ্জনার এসে আসরে বসতে বসতে মুন্সীবাবু সদলবলে ওপরে উঠে এসেছেন।

ঐ দলের মধ্যে নানা জাতের লোক। সাঁওতালী আছে, দাগী দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোক এবং নিরীহ অধিবাসী চাষীও আছে। তারা সকলেই প্রায় গড় হয়ে প্রণাম করে অতিথিদের। সুন্দর তাদের স্বাস্থ্য, তারা হাসিখুশি, কিন্তু বেশবাসে দারিদ্র্যের নির্মম স্বাক্ষর। স্যার ড্যানিয়েল এদের অন্যবিধ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করলেও অভাবের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন নি, এদের দেখে মনে এই ধারণাই করে শৈবাল।

বল হে, কী তোমাদের বলবার আছে বল সাহেবকে। নোনা-জলে তোমাদের চাষ-আবাদ যাতে নষ্ট হয়ে না যায় এই হুজুরই তার ব্যবস্থা করতে পারেন। সব কথা খুলে বল হুজুরকে।—আসল সমস্যাটা অমরেশবাবু ওদেব ধরিয়ে দেন এইভাবে।

দুখন এগিয়ে আসে হাত জোড় করে। ভয়ে ভয়েই দুখন সর্দার সবিনয়ে তাদের দুঃখের কথা জানায়। এই সন্দেশখালি এলাকায়ই প্রথম আমলে জঙ্গল সাফ করতে এসে ওর বাপ কি করে বাঘের থাবায় প্রাণ হারিয়েছে সেই কাহিনী বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে দুখন। ষাট বছর আগে সেই অঘটন যখন ঘটেছিল তখন দুখনের বয়স ছিল আট বছর। সেই থেকে আজও অবধি সে কেবল লড়াই-ই করে চলেছে, কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আর হল না,

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার জন্যে আপসোস করে ছুখন। তার পর তৃপ্তির সঙ্গে একটা প্রশ্ন তোলে—আচ্ছা হুজুর, জমিদারিগুলির নাকি উচ্ছেদ লাগব? ঠিক লাগব তো কর্তাবাবু? তাইলে যদি আমাগো মতন লাখ লাখ লোকের দুঃখু মিটে। এই কথা কটি বলতে বলতে এক ঝলক হাসির রশ্মি মিলিয়ে যায় ওর চোখে মুখে। আসল কথাটাই ছুখনের ভুল হয়ে যায় বলতে। দণ্ডবৎ হয়ে সে পিছিয়ে যায়।

এবার এগিয়ে আসে গোসাবারই স্কুলে-পড়া ছেলে মদন মাঝি। একমাত্র তারই গায়ে একটা হাতাকাটা ফতুয়া। চাষী শরৎ মাঝির ছেলে হলেও বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে সে।

সুন্দরবনের জমিদারদের নিষ্ঠুরতার নানা কাহিনীই তার জানা আছে। এক এক করে তার অনেকগুলিই সে অতিথিদের শুনিয়ে দেয়। ছুখন সর্দারের বাপ নিজের জীবন দিয়ে যে জমিদারকে তার দলবলের সাহায্যে জঙ্গল সাফ করে প্রায় সাত শ বিঘে জমির মালিক করে দিয়েছিল, সেই জমিদার ছুখন সর্দারের মাকে তার স্বামীর জীবনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মাত্র দশটি টাকা হাতে তুলে দিয়েছিলেন, মদনের মুখে একথা শুনে শৈবাল শিউরে ওঠে, অঞ্জনার চোখে আর পলক পড়ে না।

কাঁচা বাঁধ ভেঙে বছর বছর বন্যার লোনাজল সুন্দরবনের প্রজাদের যে সর্বনাশ করে শেষ পর্যন্ত তার একটি করুণ চিত্রে উপস্থিত করে মদন মাঝি। গত বছরের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে সুন্দরবনের কত সর্বহারা যে বাঁচবার আশায় কলকাতায় গিয়ে অনাহারে ফুটপাতে প্রাণ হারিয়েছে তারও কথা সে উল্লেখ করে অতিথিদের সামনে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশের সরকার তাদের দুঃখ- দুর্দশা নিরসনের দিকে নিশ্চয়ই এবার দৃষ্টি দেবে, লোনাজলে বছর বছর যাতে তাদের সোনার ফসল নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করবে, শৈবালের মুখ থেকে এ আশ্বাস পেয়ে মদন মাঝি বিদায় নেয়।

আমি হুজুর দাকোপের চাষী। দেশ ভাগ হইলে এই গোসাবায় আশ্রয় নিছি।—এক পাশ থেকে লম্বা-চওড়া চেহারার বদন মণ্ডল পেন্নাম দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে তার নিজের কথা। বলতে বলতেই দেশ ভাগের আগে বাংলাদেশে তেভাগার দাবিতে কৃষক আন্দোলন কিরূপ দানা বেঁধে উঠেছিল এবং মানুষের মতো হয়ে বাঁচবার আশা তখন তাদের কেমন পেয়ে বসেছিল তারই সুন্দর বিবরণ সে তুলে ধরে। কিন্তু বাংলাদেশের, বাঙালী চাষীর এবং সাধারণ মানুষের অদৃষ্টই খারাপ, ঠিক তখনই স্বাধীনতার নামে দেশটাকে দু টুকরো করে ফেলা হল। আর তাদের তেভাগা আন্দোলনও খান খান হয়ে গেল।

বলতে বলতে কান্নার জোয়ার নেমে আসে বদন মণ্ডলের চোখে। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতেই সে বললে, কোন শয়তান আচমকা কল ঘুরিয়ে দিলে হুজুর—আমাদের নিজেদের মধ্যেই হুজুর লড়াই বাধিয়ে দিলে। রব উঠল দাকোপ মুসলমানের রাজ্যি, গোটা খুলনা জেলাই মুসলমানের। জীবনপণ কইরে বাপ-পিতামর যে জমি-জমা এতকাল আঁকড়ে ছিলাম হুজুর, তা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমরা সব দলে দলে পালিয়ে এলাম। আশা ভরসা সব বানচাল হইয়ে গেল, এখানে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কোনরকমে বেঁচে আছি কর্তা—এই বলে আবার বদন চোখ রগড়াতে থাকে।

বদনের বলা তখনো শেষ হয় নি। দাকোপ ছেড়ে এলেও দাকোপের ইতিহাস তার মনের রাজ্য অধিকার করে আছে। রক্তাক্ত সে ইতিহাস। সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগেও এখানে কোনো মানুষের বাস ছিল না। ভয়ঙ্কর কুমীর আর মারাত্মক সাপের ছিল ছড়াছড়ি, আর খাঁটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অবাধ বিচরণে সুন্দর-বনের এদিকটা ছিল সত্যি সত্যি মানুষের পক্ষে অগম্য। কিন্তু জীবিকার অন্বেষণে মানুষ চিরকালই সব রকম বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এসেছে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জমির অভাব দূর করার

জন্যে পশ্চিম খুলনার প্রথম অভিযানকারী কৃষক দলের সঙ্গে বদনের পূর্বপুরুষরাও দক্ষিণ খুলনার অন্তর্ভুক্ত থানা এলাকা পত্তনে অগ্রণী হয়েছিল।

দিনের বেলায় বাদা কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে সেই কৃষকের দল। দায়ের কোপের তালে তালে তারা এগিয়েছে আর চিৎকার তুলেছে। ভয় পেয়ে দূরে দূরে সরে গিয়েছে হিংস্র পশুরা। তবু অনেককে সাপ কেটেছে, অনেকে আবার সকলের অজান্তে বাঘের মুখে কুমীরের কবলে প্রাণ হারিয়েছে। জঙ্গল সাফ করতে করতে যেই নজরে পড়েছে সূর্য ডুবু ডুবু হতে চলেছে, অমনি সবাই হাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে গাছের ওপর উঠে টোঙায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রাতের পর রাত কাটিয়েছে তারা ঐসব টোঙায়। কাপড়ের আঁচলে বাঁধা চিঁড়েগুড় সম্বল। সুন্দরবনের ফলফলাদিও জুটেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু অনেকের পক্ষে এমনও অনেকদিন গেছে যখন গাছের ওপরের টোঙা থেকে তারা নেমে আসবারই সুযোগ পায় নি। কী করে নামবে, রক্তলোভী বাঘ যে নিচে ওত পেতে বসে আছে শিকারের আশায়। এমনিভাবেই নিজ নিজ প্রাণ হাতে নিয়ে দলে দলে যে সমস্ত কৃষক দায়ের কোপে কোপে এখানকার শতাধিক বর্গমাইল জমি উদ্ধার করেছে, তাদেরই দুঃসাহসিক অভিযানের সাক্ষ্য বহন করছে এই থানা এলাকার দাকোপ নাম। কিন্তু তা হলে কি হবে, নামমাত্র খাজনায় সে সব জমি সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে জমা নিয়ে জমিদারেরা সেই সব কৃষক পরিবার ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের ওপর বছরের পর বছর যে সব অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে এসেছেন, পর পর তার বিবরণ দিতে যেয়ে বদন মণ্ডল বাধা পায় অমরেশ-বাবুর কাছে।

বদন তখন আর কথা না বাড়িয়ে শুধু মন্তব্য করে যে, সুন্দরবনের যেখানে যত বসতি গড়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটির ইতিহাসই ঐ দাকোপের মতো কৃষকের অশ্রুর লেখা।

আমারগো দুঃখের দিনের শেষ কি আর হবে নি হুজুর?—এই প্রশ্ন রেখে বদন শেষ করে তার বক্তব্য।

নিশ্চয় হবে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, ধীরে ধীরে সবারই দুঃখ দূর হবে।— আশ্বাস দেয় শৈবাল।

মুন্সীবাবু এবার দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করেন, আর কারো কিছু বলার নেই তো তোদের? হুজুরকে নিয়ে আমরা একটু বেড়াতে যাব কিনা তাই আর না বলাই ভাল।

মাধু সাঁওতাল কাঁচুমাচু হয়ে এগিয়ে এসে বলে, সুন্দরবনের দশ-বারো হাজার সাঁওতালের দুঃখের কথা আমি আর কইব না কর্তাবাবু। আমার ঘরে উছব হইছে। তুই যাবি হুজুর আমার বেটির বিয়ে দেখতে?

বাঃ ভারি মজার ব্যাপার তো! নিশ্চয় যাব। কখন বিয়ে, কখন?—শৈবাল উৎফুল্ল হয়ে উঠে প্রশ্ন করে। বিয়ে দেখবার ব্যাপারে অঞ্জনা এবং শিখারও প্রবল উৎসাহ। তাই মাধু যখন বিকেল বেলা তাদের সকলকে তার বাড়িতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল তখন ওদের কী আনন্দ!

চাষীরা সবাই খুব খুশি। ওদের প্রত্যেকের কথাই শৈবাল খুব মন দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছে, এজন্যেই ওদের আনন্দ। তা ছাড়া ওদের সকলের দুঃখই ধীরে ধীরে দূর হবে সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা করবেন, এ আশ্বাসও কি এই সব সর্বহারাদের কাছে বড় কম আশার কথা!

হাসিখুশি হয়ে গাঁয়ের প্রতিনিধিরা বিদায় নিয়ে যাবার পরেই খুব চটপট করে ব্রেকফাস্টের পর্বটা মিটিয়ে নেন অমরেশবাবু।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে অনেক কিছুই কিন্তু দেখতে হবে শৈবাল-বাবু, তাই একটু তাড়া দিচ্ছি, মনে কিছু করবেন না।—এই সাবধানবাণী দিয়েই অমরেশবাবু আরম্ভ করেছেন। তাই প্রাতরাশ সেরে সাজপোষাক করে বেরিয়ে পড়তে আর খুব বেশি দেরি হয় না।

সকালবেলা কৃষকদের এনে ভিড় জমানোর খুব একটা ইচ্ছা ছিল না অমরেশবাবুর। কিন্তু শৈবালের ইচ্ছাতেই তাঁকে এ ব্যবস্থা করতেই হল। তা না হলে অনেক আগেই বেরিয়ে পড়া যেত। ধীরে-সুস্থে সব কিছুই ভাল করে দেখা হত।

যাই হোক এক এক করে তবু কমই বা কি দেখা হল!

কো-অপারেটিভ রাইস মিল, কো-অপারেটিভ স্টোর, সমবায় কৃষিসংস্থা, কুটির শিল্পাশ্রম, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও হোস্টেল এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখা শেষ করে শৈবালরা যখন ফিরতি মুখে তখন এমন এক ঘটনা ঘটে বসল যার কথা ওদের মধ্যে কেউ বিন্দুবিসর্গও ভাবতে পারে নি।

সকালবেলা বেরুবার সময় একটু শীতের আমেজ বোধ হলেও ক্রমে ক্রমে রোদ বেশ কড়া হয়েই উঠেছে। রোববার দিন স্কুল বসেছে। সস্ত্রীক শৈবালবাবুর পরিদর্শনের জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। রোববারের বদলে সোমবার ছুটি থাকবে।

স্কুল অবধি শিখাকে নিয়ে কোনো বেগ পেতে হয় নি। বরং নিচের ক্লাসগুলো দেখাতে নিয়ে গেলে সে সব ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে শিখার ভারি আনন্দ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাতজোড় করে যখন এক এক ক্লাসে তার বাবা-মাকে অভিবাদন জানিয়েছে তখন তা অদ্ভুত ভাল লেগেছে তার।

আমিও মা স্কুলে পড়ব। আমায় ভর্তি করিয়ে দাও না মা!—শেষ ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেই আবদার ধরেছে শিখা।

মায়ের আশ্বাস পেয়ে তখনকার মতো শান্ত হলেও একটুখানি যেতে না যেতেই শিখা বসে বসে পড়ছে। আসলে তার আর হেঁটে চলার ক্ষমতা নেই। স্কুলের পর হোস্টেল এবং তার পরে দাতব্য চিকিৎসালয় পর্যন্ত অঞ্জনা নিজেই কোনো রকমে মেয়েকে চালিয়ে

নিয়ে এলেও তার পরে আর এক পা-ও শিখা পায়ে হেঁটে চলতে নারাজ।

অগত্যা সেই থেকে এ-কোল সে-কোল চড়ে চড়েই শিখার বেড়ানো হচ্ছে ফিরতি পথে।

একটু আগেই বাবার কোল ছেড়ে শিখা গিয়ে তার মায়ের কোলে পাড়ি জমিয়েছে। দলের সবার পেছনে পেছনে চলছে তারা মা-মেয়ে। আর তাদের ঠিক আগে আগেই চলেছে শৈবাল।

আর বেশি হাঁটতে হবে না। ঐ তো সামনের বাঁকটা পেরিয়ে গেলেই কাছারিবাড়ি চোখে পড়বে। বড় জোর আর আধমাইলটাক পথ। তার বেশি কিছুতেই নয়।—জোরে জোরে চেঁচিয়ে বললেও অমরেশবাবুর এ আশ্বাসে খুব খুশি হতে পারছে না অঞ্জনা। পা যে আর তারও চলছে না। এত দীর্ঘ পথ সে কি আর জীবনে কোনোদিন হেঁটেছে? তার ওপর আবার এমন এক ঢেঙা মেয়েকে কোলে নিয়ে! শিখার ওপর মনে মনে খুব চটে গিয়েছে অঞ্জনা। সে বিরক্তি আর খুব বেশিক্ষণ সে চেপেও রাখতে পারে না। কোল থেকে ওকে নামাতে গিয়ে বাধা পেয়ে ক্ষেপে ওঠে অঞ্জনা, নচ্ছার মেয়ে কোথাকার। এমন জানলে তোকে ঠাকুমার কাছেই রেখে আসতাম, সেই ভাল হত।

কথাগুলো শুনতে পেয়ে শৈবাল থমকে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, মুন্সীবাবুর কানে যাওয়ায় তিনি ছুটে এসে, 'আহা অমন কচি শিশুকে কি এমনি করে বকতে হয় মা' বলে নিজের কোলে তুলে নেন শিখাকে।

এতক্ষণে অঞ্জনা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

নিশ্চিন্ত মনে কয়েক পা এগুতেই হঠাৎ রাস্তার একপাশের একটা বাংলো মতো বাড়ি থেকে একই সঙ্গে বেরিয়ে এলেন জন চার লোক। হৈ-হৈ করতে করতেই তাঁরা এসে রাস্তায় নামলেন এবং শৈবালদের পিছু নিলেন।

একবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল অঞ্জনার। ইচ্ছে নয়, আপনা থেকে নিজের অজান্তেই কখন সে একবার তাকিয়ে নিয়েছে পিছন দিকে। দেখে নিয়েছে, একেবারে গায়ে গায়ে নয়— বেশ একটু দূরেই রয়েছে পিছনের দলটি। তবে সে দূরত্বটুকু তাদের কথাবার্তা শোনার পথে মোটেই কোনো বাধা নয়। আর তাদের নিয়ে ওরা যে কোনো আলোচনা করছেন না সেটুকু জেনেই অঞ্জনা খুশি।

কিন্তু পিছনের দলটিকে সামনের ছু জনের মধ্যে একজনের চেহারা ঠিক মাস্টার মশাইয়ের মতো মনে হচ্ছে না!—আয়েকবার মুখ ঘুরিয়ে নজর করতেই কেমন যেন খটকা লাগে অঞ্জনার মনে। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্মে আবার সে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু ভরসা পায় না থামতে। কি জানি যদি ঠিক না হয়! তা হলে লজ্জায় যে মরে যেতে হবে তাকে। সেই ভয়েই সে নীরবে এগিয়ে চলতে থাকে।

কিন্তু এরই মধ্যে আরেক দিকেও যে সন্দেহের দোলা লেগেছে!

অঞ্জনাকে চেনা চেনা বলেই মনে হয় পিছনের চারজনের মধ্যে একজনের। তবু একেবারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত না হয়ে কথা বলার জন্মে এগিয়ে যেতে সাহসে কুলোয় না। এ অবস্থায় কান পেতে রেখে সঙ্গীদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলা ছাড়া আর কীই বা করা যায়!

বাঃ, সূর্যমুখী ফুলের কী ছড়াছড়ি এখানটায়! আর কত বড় বড় এক একটা ফুল দেখেছ?—রাস্তার ধারেরই একটি বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির পাশে স্নুন্দর একটি ফুল বাগান চোখে পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ে অঞ্জনা, শৈবালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অপূর্ব সূর্যমুখী ফুলের দিকে। তার মনকেও সে সূর্যমুখীর মতো করে রাখতে পারবে তো চিরকাল? বিদ্যুৎ চমকের মতো এমনি একটি প্রশ্নের চিন্তা ঝিলিক দিয়ে যায় অঞ্জনার মনে। আর ঠিক তার আগেই মুহূর্তে শৈবালকে শুনিয়ে শুনিয়ে যে কথা সে বলে, সে কথা ততক্ষণে অল্প দূরে অগ্রসরমান আরেক জনের কানে গিয়েও পৌঁছয়, তাঁর মনকে গিয়ে আলগোছে নাড়া দেয়। তিনি চমকে ওঠেন।

খুবই পরিচিত কণ্ঠস্বর। না, আর ভয় পাবার কিছু নেই, লজ্জারও কোনো কারণ নেই। এ স্বর অঞ্জনার না হয়ে যায় না।—একরূপ স্থিরনিশ্চয় হয়েই কয়েক পা একটু দ্রুত এগিয়ে আসেন পশ্চাতের ঐ চারজনের একজন। এগিয়ে এসে একেবারে প্রায় অঞ্জনার গা ঘেঁষেই দাঁড়ান।

অঞ্জনা যে! তুমি হঠাৎ কোত্থেকে এখানে? কবে এলে?

আপনি মাস্টারমশাই! এখানেই থাকেন নাকি আজকাল? এই বলে ঢিপ করে একটা প্রণাম দেয় অঞ্জনা। পিঠের দিক থেকে আঁচলটা টেনে নিয়ে ঘোমটার মতো করে একটু মাথায় টেনে দেয়। দেবেই তো। মাস্টারমশাই যে! প্রায় পাঁচ বছর ধরে অঞ্জনা যে একটানা গান শিখেছে তার সবকটিই এই মাস্টারমশাইয়ের শেখানো। বিয়ের পর সাত-আট বছর বাদে এই প্রথম দেখা। বিশেষ করে বিয়ের পরে এই প্রথম দেখা বলেই অঞ্জনার এই সলজ্জভাব। নিজের অজান্তেই সে তাই কখন যে তার মাথায় ঘোমটা টিনে দিয়েছে তা তার নিজেরও খেয়াল নেই।

হঠাৎ আবার অঞ্জনা কার সঙ্গে কথা বলছে? এই অচেনা অজানা জায়গায়ও কী করে আবার সে পরিচিত লোকের সন্ধান পেয়ে গেল শৈবাল বিস্মিত হয়ে তাই ভাবছে।

সূর্যমুখীর বাহার দেখে অঞ্জনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় শৈবাল একটু দূরেই চলে গিয়েছিল সেই অবসরে। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

অঞ্জনাই তাড়াতাড়ি করে খুবই হাসিখুশি মনে তার মাস্টার মশাইকে নিয়ে এগিয়ে আসে। শৈবালের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এঁকে তোমার মনে নেই বোধ হয়। ইনিই আমার গানের মাস্টার বিনায়কবাবু। —অঞ্জনা এই বলে থামতেই শৈবাল দু হাত তুলে মাস্টারমশাইকে নমস্কার জানিয়ে চিন্তার ঘড়িতে একবার দম

দেয়, কিন্তু কাঁটা নড়ে না। অনেক হাতড়েও সে তার স্মরণের প্রান্তরে খুঁজে পায় না বিনায়কবাবুর মতো কোনো লোককে। সেই বিয়ের সময় বিনায়কবাবুর সঙ্গে তার একবার দেখা হয়েছিল। কিন্তু তারপরে এই আট বছরের মধ্যে আর কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয় নি এবং এমন কি কোনোদিন কোনো অবসরকালীন আলোচনাতেও তাঁর প্রসঙ্গ কখনো ওঠে নি। কাজেই অঞ্জনার সেই মাস্টারমশাইয়ের কথা শৈবালের মনে থাকবে, এমন আশা করাও ঠিক নয়।

ভবানীপুর অঞ্চলের বিখ্যাত সংগীত বিদ্যালয় সুরতীর্থ। তাই প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীবিনায়ক দস্তিদার। অঞ্জনার বাবা মেয়েকে গানের স্কুলে না দিয়ে স্কুলের মাস্টারকেই বাড়িতে টিউটার করে রেখেছিলেন পাকাপাকিভাবে। স্কুলে পুরুষ-শিক্ষকদের কাছে শিক্ষালাভে বিপদের একটা ঝুঁকিও নিতে হয়, আশঙ্কাতেই তিনি মেয়েকে গান শেখানোর জন্যে এমনি ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন। বাস্তবিকই অঞ্জনার বাবাকে বেশ মোটা রকমের টাকাই খরচ করতে হয়েছে এজন্যে। তবে সেই ব্যয়ের জন্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই তাঁর। তার কারণ বিনায়কও সে টাকার মর্যাদা রেখেছেন তাঁর যথাসাধ্য প্রতিদান দিয়ে। আর সত্যি কথা বলতে কি, শৈবাল যে অঞ্জনাকে তার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছে তার আসল কারণই তার গানের কৃতিত্ব।

সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। শৈবাল-অঞ্জনার বিয়ে সত্যি সে এক অভিনব কাহিনী।

সেবার অঞ্জনাদের কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে সভাপতিত্ব করছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইংরাজীর অধ্যাপক মহিমারঞ্জন রায়। একটি ছাত্রীর কণ্ঠে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মনে মনে একটি সিদ্ধান্তও পাকা করে ফেললেন।

দেখতে শুনতে মেয়েটি তো বেশ, আর সবদিকে যদি মিলে যায়

তা হলে আমার শৈবালের জন্যে একেই আমি নিয়ে যাব আমার ঘরের লক্ষ্মী করে।—অনুষ্ঠান-শেষে মনের এই কথাটিই তিনি অসঙ্কোচে কলেজ-অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে খুলে বললেন এবং তাঁর কাছ থেকেই মেয়েটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নানারকম খোঁজখবর নিলেন। প্রত্যেকটি খবরই তাঁর মনের মতো।

আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়েই বাড়ি ফিরলেন অধ্যাপক। ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে ডাকলেন, ওগো শুনছ, শুনে যাও একটা মজার খবর আছে।

কী আবার এমন মজার খবর?—গিন্নী আলনা গোছানো বন্ধ রেখে ছুটে আসেন কর্তার কাছে।

জান, তোমার ছেলের বৌ ঠিক করে এলাম। তুমি যে বল, আর সভাসমিতি করার দরকার নেই—এবার ওসব ছাড়ো; যদি সত্যি সত্যি সভা-সমিতিতে যাওয়া একদম বন্ধ করে দিতাম তা হলে কি আর এমন সুন্দর একটি লক্ষ্মী মেয়ের খোঁজ পেতাম কখনো?

কোথায় সে লক্ষ্মী মেয়ে, কোথায় খুঁজে পেলে তাকে? কেমন দেখতে?—গিন্নী অস্থির হয়ে ওঠেন জানবার জন্যে।

একটু সবুর কর না। সে কথা বলার জন্যেই তো তোমায় ডাকলাম। আগে বসতে দাও।—এই বলে প্রথমে চাদরটা, তার পরে গা থেকে জামাটা খুলে রেখে ইজি-চেয়ারটায় আরাম করে বসলেন মহিমারঞ্জন এবং গৃহিণীকে ধীরে সুস্থে মেয়েটি সম্বন্ধে যাবতীয় বর্ণনা শোনালেন। আনন্দের আতিশয্যে সে সব বর্ণনাতেও কিছু কিছু অতিশয়োক্তি হয়তো করে ফেলেছেন তিনি, তা হলেও সেই মেয়েটিকেই তিনি শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এসেছেন এবং তাতে তাঁরা সকলেই পরম সুখী।

চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বিয়ের আগের দিন অবধি অঞ্জনাকে গান শিখিয়েছেন আচার্য বিনায়ক। সারা অন্তর দিয়েই শিখিয়েছেন। কিন্তু কলেজে পড়ুয়া মেয়েদের মন পুরোপুরি গান-বাজনার দিকে

টেনে রাখা যে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয় তা তিনি বিশেষভাবে টের পেয়েছিলেন শেষ তুই বছরে। মা-বাবার সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও মেয়ে যেন বার বার সে পাহারার বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছে। বার বারই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে অঞ্জনার মনের সেই চাঞ্চল্য। এক এক বার কঠোর সংযমে তাঁকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। পুরো তুটো বছর চলেছে তাঁর এইভাবে। সেই অঞ্জনা!

কত বছর পর আবার সেই অঞ্জনার সঙ্গে দেখা বিনায়কের। আই-এ-এস স্বামী পেয়েছে তাঁর ছাত্রী। তিনিও কি কম সুখী হয়েছিলেন সেদিন! কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনে ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগ করা হয়ে ওঠে নি এবং প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না। আর এতকাল পরে যে এই সুন্দরবনে এমনিভাবে উভয়ের দেখা হয়ে যাবে এও বাস্তবিকই অভাবনীয়।

আপনি এখানে কী মনে করে মাস্টারমশাই?—পথ চলতে চলতেই আরেকবার জিজ্ঞেস করে অঞ্জনা।

এই যে এই ভদ্রলোক নিয়ে এলেন এঁদের এখানে বেড়াতে। ইনি এখানকার একজন ডাক্তার। আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

নমস্কার!—বিনায়কবাবুর মুখের কথা শেষ হবার আগেই অঞ্জনা তার মাস্টারমশাইয়ের বন্ধুকে করজোড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি-নমস্কার আসে ডাক্তারের দিক থেকে। বাকি কথাটুকু তখন বলার সুযোগ নেন আচার্য বিনায়ক।

জান অঞ্জনা, ডাঃ দাস কলকাতা গিয়েছিলেন ক'দিন আগে। আমায় একেবারে জোর করে নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। বললেন, গিয়ে দেখবেন গোসাবা ছেড়ে আর কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে যাবে না। সত্যি তাই। চারদিন ধরে ডাঃ দাসের বাড়িতে আছি। দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি। ফিরে যাবার কথা মনেই আসছে না। অথচ কাল যেতেই হবে, না গিয়ে উপায় নেই।

বা রে, আমরাও তো বেড়াতেই এসেছি। সুন্দরবন দেখার সখ আমাদের দু জনেরই অনেকদিনের। হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। কয়েকমাস আগে উনি বদলি হয়ে এলেন সমবায় দপ্তরে। ঐ যে আগে আগে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, অমরেশবাবু, তাঁর সঙ্গে সেই সূত্রেই ওঁর আলাপ-পরিচয় হয়ে যায়। এবং তিনিই মহাসমাদরে আমাদের গোসাবা দেখাতে নিয়ে এসেছেন। সত্যি সত্যি ভারি চমৎকার লোক এই অমরেশবাবু।

আরে গোসাবার সব কিছুই তো এখন অমরেশবাবুর হাতে। আর ঐ যে দেখছেন মুন্সীবাবু তিনি তাঁর দক্ষিণহস্ত। ওঁদের অতিথি হয়ে যখন এসেছেন তখন কোনো অসুবিধেই তো আপনাদের হবার কথা নয়, কোনো আশাই অপূর্ণ থাকবে না। আরও দু-একটা দিন বেশিই থেকে যান না তা হলে!—ডাক্তারবাবু অনুরোধ জানান।

না, ইচ্ছে থাকলেও তা সম্ভব নয়। ওঁর আবার অফিস রয়েছে তো!

ইচ্ছে পূরণের চাইতে দায়িত্ব পালনটাই বড় কথা, এ আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন ডাক্তারবাবু।—একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আঙুলের টোকায় টোকায় সিগ্রেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে গুরুগম্ভীর স্বরে শৈবালের এই বাণী উচ্চারণের পর স্বাভাবিকভাবেই চুপ করে যেতে হয় ডাক্তারকে।

সবাই তখন চুপচাপ।

কিন্তু অঞ্জনা তো আর চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। সে নীরবতাকে ভেঙে-চুরে একাকার করে দেয়।

আচ্ছা মাস্টারমশাই, আমরাও যখন কালই ফিরব, চলুন না আমাদের সঙ্গে কাছারিবাড়িতে। বাকি সময়টুকু একত্রেই কাটানো যাবে!—বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অঞ্জনা।

এদিকে মনে মনে খুবই বিরক্তি বোধ করে শৈবাল।

অমরেশবাবুর অতিথি তারা। তাঁকে না জানিয়ে তাঁর মতামত

না জেনে কী অধিকার থাকতে পারে তাদের অন্য কাউকে কাছারি-বাড়িতে আমন্ত্রণ করার? আর এমনই বিপদ, আকারে ইঙ্গিতেও যে অঞ্জনাকে বারণ করা যাবে তারও কোনো উপায় নেই।

তবু রক্ষা, নিজে থেকেই মাস্টার আপত্তি জানালেন। এতে কিছুটা যেন স্বস্তির কারণ ঘটে শৈবালের পক্ষে।

তা আর কী করে হতে পারে অঞ্জনা? ডাঃ দাসের অতিথি আমি। তাঁর এবং তাঁর গৃহিণীর মত ছাড়া আমার কি আর অন্য কোথাও গিয়ে থাকা সম্ভব?—আচার্য বিনায়ক আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন এই যুক্ত দেখিয়ে। কিন্তু সব সময় কি আর যুক্তির জোর খাটে?

বেশ তো, আমিই না হয় ডাঃ দাসের অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি।

বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে অঞ্জনা। সিগ্রেটের অর্ধেকটা শেষ না হতেই হঠাৎ মুখ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় শৈবাল। চোখমুখ লাল হয়ে গেছে তার। কিছু বলতেও পারছে না, সইতেও পারছে না। রাগে টগবগ করছে তার ভেতরটা। কিন্তু সে সব তো আর চোখে পড়ছে না অঞ্জনার। তার কথা সে বলেই চলে।

শুনুন ডাঃ দাস, কতকাল পরে আজ হঠাৎ মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। ঠিক এমনিভাবে হঠাৎ যে তার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যেতে পারে তা কল্পনাও করতে পারি নি। আপনার বন্ধু তিনি, এখানে আপনার অতিথিও তিনি। আপনি যদি অমত না করেন তো মাস্টারমশাই কাছারিবাড়িতে বাকি সময়টা কাটাতে পারেন।

বেশ কথা, তাতে আমার আপত্তি করার কী থাকতে পারে? কাছারিবাড়িও গোসাবা স্টেটের, আমার বাড়িও। সেই হিসেবে কাছারিবাড়ির অতিথিও যা আমার অতিথিও তাই। আমি যে কাছারির ডাক্তারখানারই ডাক্তার।—এমনিভাবেই ডাঃ দাসের অনুমতি আদায় করে নেয় অঞ্জনা।

স্যাইসেন্স !—রাগে গজগজ করতে হঠাৎ বলে ফেলে শৈবাল।

ভাগ্যি শৈবালের এই বেফাঁস কথাটা শুনতে পান নি মাস্টার। অঞ্জনাও সেদিকে কান দেয় নি। দেবার অবকাশও ছিল না। কারণ আচার্য বিনায়কের সঙ্গে কথাবার্তায়ই সে তখন মশগুল।

ঠিক সেই সময়ই কোল থেকে শিখাকে নামিয়ে দিয়েছে অঞ্জনা। শিখা মায়ের হাত ধরে ধরেই এগিয়ে চলেছে এবং মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার মায়ের গানের শিক্ষককে।

এটি তোমারই খুকী বুঝি !—শিখার চিবুকে হাত দিয়ে মেয়েটিকে একটু আদর করেন আচার্য বিনায়ক।

হ্যাঁ মাস্টারমশাই, এ আমারই মেয়ে শিখা। সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তির আমেজে স্নিগ্ধ এই ছোট্ট উত্তরটি আসে।

বাঃ, বেশ খাসা নামটি তো ! শিখার মতোই দীপ্তিময়ী হয়ে উঠুক তোমার মেয়ে।—আচার্যের এই আশীর্বাদ পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে অঞ্জনা। শৈবালের রাগও যেন অনেকখানি পড়ে এসেছে। তার কন্যার উদ্দেশে বর্ষিত বিনায়কের আশীর্বাণী কানে যেতেই পিছন ফিরে একবার তাকায় শৈবাল।

শিখা ততক্ষণে আচার্যের কোলে স্থান করে নিয়েছে। তা দেখে শৈবালের আরো আনন্দ।

আর এদিকে পথেরও শেষ।

কাছারিবাড়িতে ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় দুপুর। ক্রমাগত প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে একটানা হাঁটা। তিন-চারটে জায়গায় দু-চার মিনিটের বিশ্রাম, সে কিছুই নয়। অঞ্জনার অনভ্যস্ত পা দুখানা আর চলছিলই না। কাছারিবাড়ির সিঁড়িতে পা রেখে সে যেন তার প্রাণ ফিরে পেল। অন্তত তার গভীর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে সে ঘোষণাই যেন ধ্বনিত।

আচার্য বিনায়ককেও কাছারি দেখাতেই নিয়ে এসেছেন ডাঃ দাস। গোসাবায় এই বাড়ি যে অন্যতম প্রধান দর্শনীয় তা কে

অস্বীকার করবে? সুন্দরবনের এই সুন্দর গ্রামটিকে প্রায় শহরের মর্যাদা দিয়েছে এই কাছারি। তা কি আর বন্ধুকে ভাল করে ঘুরে ফিরে না দেখিয়ে পারেন ডাক্তার? আগে অফিসের কাজকর্ম, সাধারণ বিরোধ মীমাংসায় এখানকার বিচারপদ্ধতি ইত্যাদি দেখাবার পর বিনায়ককেও পরে নিয়ে যাওয়া হবে অতিথিশালা দেখাতে যেখানে শৈবালরা রয়েছে।

এখানে রবিবারেও কাছারি বসে। কর্তাব্যক্তিরা পুরোদমে সবাই অফিস করেন। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এর মতো গোসাবার কাছারিবাড়ি মৃতের মতো রবিবার দিন অসাড় হয়ে পড়ে থাকে না। অন্য আর সব দিনের মতোই রবিবারও গোসাবার কাছারি সরগরম।

এ দৃশ্য কলকাতার মানুষ আচার্য বিনায়ককে স্বভাবতই একটু বিস্মিত করে। শৈবাল তো এ দেখে আরো বেশি অবাক।

'বেশি সুখের জন্যে বেশি কাজে আমরা অভ্যস্ত করে তুলেছি এখানকার লোকদের।'—অমরেশবাবুর এ কথাটা সত্যি সত্যি ঠিক তা হলে! অতিথিশালায় যেতে যেতে শৈবালের মনের জানালায় সেই উক্তিটিই যেন উঁকি দিতে থাকে।

ওপরে উঠেই শৈবাল কিন্তু বেশ মিঠেকড়া দু-চারটে কথা শুনিয়ে দেয় অঞ্জনাকে।

এতদিনেও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হল না, আশ্চর্য!—গায়ের কোটটা রাগের মাথায় ঝটাপট খুলতে খুলতে যাকে উদ্দেশ করে শৈবালের এই মন্তব্য সে বেচারা তো এই শুনে একেবারে হতভম্ব!

বাস্তবিকই এমন আকস্মিক আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না অঞ্জনা। এতক্ষণ ধরে এতখানি পথ হাঁটার ক্লান্তিও শৈবালের কথার উত্তর দিতে বাধা দেয় তাকে। তা ছাড়া এতটা উত্তেজনার কারণও সে ঠিক ঠিক ধরে উঠতে পারছিল না।

কী চুপ করে রইলে যে বড় !—তার মূল্যবান কথাটার উত্তর না পেয়ে যেন আর চলছে না শৈবালের। পোষাক-পরিচ্ছদ হালকা করে নিয়ে খুব গুরুগম্ভীরভাবে এবারে সে পায়ের মোজা খোলবার উদ্যোগ করে।

কেন, কী এমন অন্যায় হয়েছে আমার, তা তো বুঝতে পারছি না —খুব ধীরে ধীরে সবিনয়েই উত্তর দেয় অঞ্জনা। কাছে এগিয়ে গিয়ে স্বামীর পায়ের মোজা খুলে দেয়।

তা বুঝতে পারবে কেন? তোমার বাড়িতে তোমার কোনো অতিথি যদি বাইরে থেকে অন্য অপরিচিত লোককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে তুমি কী ভাববে তখন? তেমন অবস্থায় কখনো পড়লে তা কি তুমি খুশি মনে মেনে নিতে পারবে, বল! তোমার মাস্টার-মশাই তোমার কাছে, অমরেশবাবু তাঁকে জানেন না শোনেন না, তাঁর কাছে তাঁর কী মূল্য? কানাকড়িও না। অমরেশবাবুকে না জানিয়ে তোমার মাস্টারমশাইকে আমাদের সঙ্গে এই অতিথি-শালায় থাকবার জন্যে তুমি নেমন্তন্ন করতে গেলে কোন্ বুদ্ধিতে আমি তো তা ভেবেই পাচ্ছি না।—বলতে বলতে শৈবালের চড়া সুরটা ক্রমশই যেন একটু নরম হয়ে আসে।

ও সেই কথা! তাই বল। আমি ভেবেছিলাম কি জানি কি মহাঅপরাধ আবার করে বসেছি।

অপরাধ বৈ কি! একে আমি অপরাধ বলেই মনে করি।

কাল যে অমরেশবাবু বলেছিলেন তা শোন নি তুমি বুঝি? না, শুনেও ভুলে গেছ তাই এভাবে তুমি কথা বলছ?

কী বলেছিলেন অমরেশবাবু? —শৈবাল ভালো করে জেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়।

আমাদের সঙ্গে আরো দুজনের আসার কথা ছিল, তোমার ভাই আর আমার ভাই। তারা আসে নি বলে অমরেশবাবু খুবই দুঃখ করেছিলেন। তাদের জন্যে সমস্ত ব্যবস্থাই করে রাখা হয়েছে

ওদিকের ঘরটাতে। আমি তো কাল এক ফাঁকে দেখেও এসেছি। তাই মনে হয়েছে, মাস্টারমশাই এলে আমাদের কোনো অসুবিধেই হবে না এখানে এবং অমরেশবাবু নিশ্চয়ই খুশি হবেন।—এখানেই চুপ করে যেতে চায় অঞ্জনা। পরবর্তী পর্বের জন্যে এবার তৈরী হতে হবে তো! কিন্তু সে চুপ করতেই বাইরে থেকে হাঁকতে হাঁকতে ঘরে ঢুকে পড়েন অমরেশবাবু। সঙ্গে তাঁর মুন্সীবাবু।

কী নিয়ে আবার কথা কাটাকাটি হচ্ছে আপনাদের?—জিজ্ঞেস করেন অমরেশচন্দ্র।

না, না, ও কিছু নয়। আমাদের প্রোগ্রামের ব্যাপার নিয়েই কথা হচ্ছিল।—এই বলে প্রসঙ্গটা কোনো রকমে চাপা দিয়ে দেয় শৈবাল।

খাবারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তা হলে। আমার শিখাদিদির তো খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

খেয়ে উঠেই তো আবার একটু বাদে রওনা হতে হবে সাঁওতাল পাড়ার দিকে। মাধু সাঁওতালের নেমন্তন্ন রয়েছে না, তার মেয়ের বিয়ে দেখতে যেতে হবে। ফেরার পথে আবার আমার বাড়িতে চায়ের আসরে দু দণ্ড সময় দিতে হবে। শত হলেও আত্মীয়-বাড়িতে একবার না গেলে কি চলে, কি বলেন শৈবালবাবু?—অমরেশবাবুর কথা শেষ হতেই মুন্সীবাবু গোটা কর্মসূচীটাই একবার স্মরণ করিয়ে দেয় অতিথিদের।

নিশ্চয়ই, যেতে হবে বৈ কি! আপনাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই একবার যাব।—মুন্সীবাবুর কথায় সায় দেয় শৈবাল।

হ্যাঁ, সব কিছু সেরে এসে আমরা আবার সন্ধ্যায় এখানে গানের আসর জমিয়ে বসব।

হ্যাঁ, আমরা ফিরে এসেই দেখতে পাব এই ছাদের ওপরেই গানের আসরের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে আছে। আপনারা চটপট তৈরী হয়ে নিন। এখনই খাবার আসবে।—মুন্সীবাবুর কথার পিঠে

অমরেশবাবু এ কথাটুকু জুড়ে দিয়ে দুজনেই দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসেন। মুন্সীবাবু চলে যান তাঁর নিজের বাড়িতে। বেশি দূরে নয়, কাছেই।

ওঁরা বেরিয়ে যেতেই অঞ্জনা জিভ কাটে। ছিঃ ছিঃ, ওরা কী ভাবলেন বল তো!

ভাবাভাবির আর কী আছে? যা হবার তাই হয়েছে, তাই হবে। তবে পুরুষদের এটা ভুলে যাওয়া কখনোই উচিত নয় যে মেয়েদের নিয়ে আর যাই চলুক তাদের সঙ্গে কোনো কিছু নিয়েই তর্ক করা চলে না।

বেশ ভালো মানুষ তো দেখছি! তর্কটা আরম্ভ করলে তুমি, আর দোষ হয়ে গেল মেয়েমানুষদের? খুব চমৎকার যুক্তিই বটে!— অঞ্জনা চুপ করে থাকতে চাইলেও এর একটা জবাব না দিয়ে আর পারে না। পরনের ভালো শাড়িখানা ছেড়ে রেখে একখানি আট-পৌরে শাড়ি পরতে পরতে বেশ একটু খোঁচা দিয়েই সে তাই এই কথা বলে।

সত্যিই তো, সমস্ত মেয়েকে এভাবে ছোট করে দেখবে কেন শৈবাল? এ যুগে কোন্ বিষয়ে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে পিছিয়ে আছে?—উত্তর দেবার আগে এই প্রশ্নগুলো অঞ্জনার মনকে উত্তেজিত করেছে।

ইনজেকশনে কিছু কাজ হয়েছে। শৈবাল এবার ক্ষমাপ্রার্থী।

ব্যস, আমারই ঘাট হয়েছে। আমি তো স্বীকার করছি তোমার সঙ্গে তর্কে নামা আমার মোটেই ঠিক হয় নি, অন্তত তা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি নিশ্চয়ই।—কিন্তু এই ক্ষমা-প্রার্থনার মধ্যেও যে কিঞ্চিৎ ঝাঁজ মেশানো রয়েছে তা বেশ সহজেই বুঝে নেয় অঞ্জনা। এ তার ভালো লাগে না। সে তাই চিবুকে চেপে ধরে শাড়ির আঁচলে বুক ঢেকে নিয়ে ব্লাউজের টিপ বোতাম পটাপট ছাড়তে ছাড়তে বলে—থাক, এ নিয়ে রাগারাগি মাতামাতির কিছুই

দরকার নেই। আমি সবিনয়ে আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেব আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে। তাতে আমার একটুও লজ্জা পাবার কারণ নেই। তবু তুমি অন্য জায়গায় এসে এমনি অশান্তি করো না।—হাত জোড় করে মিনতি জানিয়ে গোলমালটা মিটিয়ে নিতে চায় অঞ্জনা। শাড়ির আঁচলটা দাঁতে কামড়ে ধরে ব্লাউজটা খুলে আলনায় রাখে।

এর পর শৈবাল আর কথা বাড়ায় না। হঠাৎ তার চোখে যেন দপ করে হিংস্রতার আগুন জ্বলে ওঠে। অঞ্জনা তার দাঁতে কামড়ে ধরা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নেবার আগেই সেটাকে চোখের নিমেষে একটানে সরিয়ে ফেলে বাথরুমে ঢুকে পড়ে সে।

আরে এস না, চট করে চলে এস। স্নান করতে করতেই না হয় আমাদের ঝগড়াটা বেশ সুন্দর করে মিটিয়ে নেওয়া যাবে।—বাথরুম থেকেই আঁচল ধরে টানতে থাকে শৈবাল।

ছিঃ ছিঃ কী যে বল, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েছ দেখছি। শেষটায় স্থান-কালের জ্ঞানটাও হারালে? এখনই যদি কেউ এসে পড়ে কি বিশ্রী ব্যাপার হবে বল দেখি। ছাড়ো, ছেড়ে দাও।

না, তুমি এস। কেউ আসবে না এখন আমি বলছি।

শৈবালের সকরুণ প্রার্থনায় মুহূর্তের জন্যে এগিয়ে যেতে হয় অঞ্জনাকে। অনেক অনুনয় বিনয় ও পীড়াপীড়ি করে ছাড়া পেতে হয় তাকে। ভয় আতঙ্কে বুক তার দুরু দুরু। কখন কে এসে পড়ে, কখন কে এসে পড়ে, এই ভয়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে অঞ্জনা নিশ্চিন্ত।

ততক্ষণে লাল টকটকে একটা বড় আপেলকে কামড়ে কামড়ে প্রায় শেষ করে এনেছে শিখা। এ কাজে কিঞ্চিৎ শ্রান্তি বোধ হলেও ধৈর্যের বাঁধ তার এখনো ভাঙে নি। আপেলটিকে একেবারে নিঃশেষ না করে সে যে সরে পড়বে তেমন কোন লক্ষণই নেই।

অমরেশবাবুর দেওয়া একটা রসগোল্লাও আগেই খেয়ে নিয়েছে

শিখা। সত্যি সত্যিই তার বড্ডই খিদে পেয়েছে যে। রসগোল্লার রসে এবং আপেলের কষে শিখার গায়ের ফ্রকটা যাচ্ছেতাই হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। ভাগ্যিস বেরিয়ে এসে ঘরে ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের গা থেকে ওপরের ভালো জামাটা খুলে নিয়েছিল অঞ্জনা, তা না হলে সে জামাটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যেত।

নে, আর খেতে হবে না। খাওয়া রেখে আয় এবার। স্নানের আর দরকার নেই, তেল মাখিয়ে গরম জলে গা-টা মুছিয়ে দি।—নিজের গায়ে পায়ে সরষের তেল মাখতে মাখতে মেয়েকে ডাকে অঞ্জনা।

মা, ছোট্ট একটা ছড়া বলব ?—আপেল খেতে খেতে খুব খুশির সঙ্গে জিজ্ঞেস করে শিখা।

বেশ বল।

মায়ের অনুমতি পেয়ে শিখা আরো খুশি। সে তার বাপের শেখানো একটি ছড়াই এবার আবৃত্তি করে ঃ

আপেলের মত মুখখানি,
চোখ যেন তারা আসমানী ;
হাসছে খুকু খিল খিল,
দুঃখু নেই তার এক তিল।

আপেল খাওয়া শেষ করে ফেলে খিলখিল করে হাসতে হাসতেই আবৃত্তির পর ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে শিখা।

ততক্ষণে শৈবালও স্নান সেরে এসেছে। এবার শিখা এবং অঞ্জনার পালা। সে পালা খুবই তাড়াহুড়ো করে সারতে হয় অঞ্জনাকে।

অনেকটা সময় অনর্থক নষ্ট হয়েছে বাজে তর্কবিতর্কে। মনে মনে সে জন্যে আপসোস বোধ হয় অঞ্জনার। কিন্তু কী হবে আর সে সব ভেবে। মেয়েকে তো পরিপাটি করে সাজাতেই হবে। তা নইলে তার আবার মন ওঠে না। যতক্ষণ না ওর মনে হবে যে নিখুঁত-ভাবে ওকে সাজানো হয়েছে ততক্ষণ ওর মায়ের অব্যাহতি নেই।

তাতেই অনেকটা সময় কেটে যায়। নিজের জন্যে মোটেই আর তেমন সময় থাকে না।

তবু বাথরুমে ভালো শাওয়ারের ব্যবস্থা ছিল বলে দু-চার মিনিটেই কোনো রকমে স্নানটা সেরে নেয় অঞ্জনা। তার পর অতি সাধারণভাবে সাজগোছ করে হলঘরে এসেই সে চমকে ওঠে ডাইনিং টেবিলে খাওয়ার আয়োজন দেখে।

একেই বলে বিরাট পর্ব, কি বল। পারবে তো জাস্টিস করতে?—শিখাকে নিয়ে তারই জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষমান শৈবাল প্রশ্ন করে অঞ্জনা আসবার সঙ্গে সঙ্গে।

রাখো তোমার রঙ্গরস। সব সমারোহই তো তোমাকে খুশি করার জন্যে। এখন তুমি জাস্টিস করতে পারলেই ওদের তৃপ্তি। আমাদের জন্যে যেটুকু দৌড়ঝাঁপ সেও তোমারই দিকে লক্ষ্য রেখে।—অঞ্জনার এই উত্তরের পর শৈবালের আর কীই বা বলার থাকতে পারে। ওরা যে যার আসনে বসে পড়ে।

কিন্তু অমরেশবাবু কোথায়?

তিনি আজ খাচ্ছেন না আমাদের সঙ্গে। তাঁর নাকি আজ উপোসের দিন—মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী না কি যেন বলেছিলেন একটা।—অঞ্জনাকে জানায় শৈবাল।

তাই নাকি? উপোস থেকে সারাদিন ধরে আমাদের জন্যে এইরকম দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করতে হচ্ছে ভদ্রলোককে, এ তো ভারি দুঃখের কথা!—অঞ্জনার মুখের কথা শেষ হতেই ঐ দৃশ্যমঞ্চে অমরেশবাবু এসে হাজির। সঙ্গে তাঁর আচার্য বিনায়ক দস্তিদার।

এই যে আপনাদের আরেকজন সঙ্গী বিনায়কবাবু। আমাদের আরেকজন অতিথি। পাঁচজনের আয়োজন করে রেখেছি, সাড়ে তিন জনকে পেতে দেড় দিন কেটে গেল। কাছারি দেখা শেষ হয়ে গেলে বিনায়কবাবুকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম ডাঃ দাসের হেফাজত

থেকে। বাকি সময়টুকু উনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ওঁর জিনিসপত্তর ডাক্তারবাবু বিকেলে এখানে নিয়ে আসবেন।

আসুন, আসুন মাস্টারমশাই, এদিকে আসুন।—শৈবাল নিজে দাঁড়িয়ে উঠে একখানা চেয়ার এগিয়ে দেয় এই বলে।

অঞ্জনা যে মোটেই বাজে কথা বলে নি, অমরেশবাবু যে বাস্তবিকই খুব আনন্দের সঙ্গে বিনায়কবাবুকে এখানে নিয়ে এসেছেন তা বুঝতে পেরে সত্যি সত্যি একটু লজ্জা বোধ করে শৈবাল। তাই মাস্টারমশাইকে সে এতটা সাদর অভ্যর্থনা জানায়। এ যেন অনেকটা তার পূর্ব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

সমস্ত ব্যাপারটাই অঞ্জনার কাছে স্পষ্ট। তাই মুচকি হাসির একটা প্রলেপ পড়ে তার মুখে। কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা না বলে অমরেশবাবুকেই একটি প্রশ্ন করে অঞ্জনা—আজ বুঝি আপনি কিছুই খাবেন না? সারাদিন উপোসে কষ্ট হবে না আপনার?

না মা, উপোসে আমার কোনোই কষ্ট হয় না। এখন বয়স হয়েছে, নিয়মপত্র মেনে চললেই বরং আজকাল যেন একটু ভালো থাকি। একাদশী, পূর্ণিমা অমাবস্যি সবই আমি মেনে চলি। আর এ তো বছরে একটা দিন—মাকে একটু বিশেষভাবে স্মরণ করার দিন।

এর ওপর আর কী বলবে অঞ্জনা! নির্বাকই থাকে সে। শৈবাল তখন অনুরোধ করছে বিনায়কবাবুকে খাওয়া শুরু করার জন্যে।

নিন, এবার আরম্ভ করুন মাস্টারমশাই।

না, না, আমার ওপর অবিচার করবেন না শৈবালবাবু। একটি দানাও আর মুখে দেবার মতো ক্ষমতা নেই আমার।

এ কি বলছেন? একেবারে দেশের নাম ডোবালেন দেখছি!—এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়েছে শৈবাল। কিন্তু শিল্পীকে সে তার কথার প্যাঁচে কাবু করতে পারে না।

সত্যি বলছি, এক ঘণ্টাও হয় নি ডাঃ দাসের বাড়ি থেকে পেট

পুরে খেয়ে বেরিয়েছি। কথা ছিল কাছারিবাড়ি ঘুরে-ফিরে দেখার পর ডাক্তারের সঙ্গেই তাঁর ডিস্‌পেন্সারীতে গিয়ে ঘণ্টা দুই কাটাব, তার পর দুজনে বিকেল বেলা বেড়াতে বেরোব। কিন্তু পথে দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত অমরেশবাবুর হাতে পড়ে গেলাম।

বেশ তো, ভালই হয়েছে। এক সঙ্গে অনেক বেড়ানো যাবে। খেয়ে উঠেই তো সাঁওতাল বাড়ির বিয়ে দেখতে যাব। হয়তো অনেক হাঁটতে হবে। কাজেই আমার মনে হয় সামান্য কিছু খেয়ে নিলে ভালই করতেন।

না, রক্ষা করুন। নেহাত বললেন বলেই কাছে এসে বসেছি—এই বিপুল আয়োজন দেখেই আমি ভয় পেয়ে গেছি। দয়া করে আর খাওয়ার কথাটি বলবেন না।—একেবারে দুই হাত মিলিয়ে অতি সকরুণভাবে অক্ষমতা জানান আচার্য বিনায়ক।

থাক, থাক, মাস্টারমশাইকে ছেড়ে দাও। উনি বলছেন যখন ওঁর পক্ষে আর খাওয়া সম্ভব নয় তখন আর বার বার ওঁকে বলা কেন?—অঞ্জনা যুক্তির কথা তুলে শিখাকে খাওয়ানো শুরু করে। শৈবালও চুপচাপ খেতে আরম্ভ করে।

ঠিক আছে। এখন আর পীড়াপীড়ি করা হচ্ছে না আপনাকে খাওয়ার জন্যে। তবে কলকাতা যাবার আগে আমাদের দল থেকে আর ছাড়া পাচ্ছেন না আপনি, এ যেন মনে থাকে।—বিনায়ক-বাবুকে লক্ষ্য করেই বললেন অমরেশবাবু।

আমার ছাড়া পাওয়া না পাওয়া এখন তো আপনাদেরই হাত। আমার বন্ধু ডাঃ দাস এবং আপনি যা বলবেন তাই আমাকে করতে হবে। আমি এখন খাঁচার পাখি।

না, না, তা কেন হবেন? অঞ্জনা দেবীর আপনি গানের মাস্টার, ছাত্রীর গান শুনেই বুঝেছি মাস্টারের গান কী চমৎকার হবে। আজ সন্ধ্যায়ই এখানে গানের বৈঠক বসবে। আর ছাড়াছাড়ি

নেই। শিক্ষক আর ছাত্রী দুজনেরই গান এক আসরে শুনব। এই কথা রইল।

ঠিক আছে। এ তো খুবই আনন্দের কথা।—সানন্দে সম্মতি দেন শিল্পী বিনায়ক।

আচ্ছা, এবার তা হলে এই ফাঁকে আমি নিজের কাজটুকু সেরে আসি। আপনারা যেন কোনো রকম লজ্জা করবেন না শৈবালবাবু।

না, না, আমি রয়েছি। নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। আমিই এঁদের দেখেশুনে খাওয়াব। কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না।

খুবই ভালো কথা।—এই মন্তব্য করে অমরেশবাবু চলে যান তাঁর নিজের ঘরে, কিন্তু তার মাস্টারমশাইয়ের কথায় কিছুতেই আর হাসি চেপে রাখতে পারে না অঞ্জনা।

ছাদের ওপরেই ঠিক উল্টো দিকের দুখানা ঘরের মধ্যে একখানা ঘর অমরেশবাবুর জন্যে রিজার্ভ করা। গোসাবায় তিনি থাকুন আর না-ই থাকুন, ও-ঘর তাঁর হাতছাড়া হয় না কখনো। তবে ইদানীং সপ্তাহে দু-তিন দিন করে গোসাবাতেই কাটাতে হয়। আসলে কলকাতার সঙ্গে তিনিই এখন এই হ্যামিল্টন স্টেটের মূল যোগসূত্র।

উপবাসে থাকলেও স্নানান্তে সন্ধ্যে-পুজোয় অনেকটা সময় কাটান অমরেশবাবু। আজ বিশেষ করে মায়ের মৃত্যুতিথি। আরো বেশি সময় লেগে যায় তার জন্যে।

ওদেব খাওয়া-দাওয়ার দায় মিটেছে অনেকক্ষণ আগেই। শোবার ঘরে যেয়ে শিখাকে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে নিজেও একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছে অঞ্জনা। আর হলঘরেই দুই ইজি-চেয়ারে দুজন গা এলিয়ে দিয়ে একই সঙ্গে বিশ্রামসুখ ও গল্পসুখ উপভোগ করছে শৈবাল আর আচার্য বিনায়ক।

শিল্পীর জীবন সংগ্রামের কাহিনী শুনে গভীর সহানুভূতিতে ভরে

ওঠে শৈবালের মন। সংগীতাচার্য বিনায়ক দস্তিদারের নাম কে না জানে! সরকারী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও শৈবালের কাছেও এ নাম অনেক দিন ধরেই পরিচিত। কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে যে এত দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণ করতে হয়েছে তার বিন্দু-বিসর্গও সে জানত না। অঞ্জনাও গত ছ-সাত বছরের মধ্যে কোনো দিন তাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলে নি। কিন্তু সে যাই হোক, এত বিপর্যয় সত্ত্বেও এতখানি নাম-য্শ অর্জন করা তো কম কথা নয়। বিনায়কবাবু সত্যি সত্যি কৃতী মানুষ, একজন সত্যিকারে গুণী লোক।

শৈবাল এমনি ধাবায় কিছুক্ষণ ধরে ভেবে চলেছিল এবং সিগ্রেট টানছিল। কি একটা কথা বলার জন্যে বাঁদিকে চোখ ফিরিয়েই সে দেখে মাস্টারমশাইয়ের দু-চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। সে আর কিছু বলে না।

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়ি থেকে একটা হাঁক ওঠে, কি সবাই তৈরী তো?

এ হাঁক মুন্সীবাবুব হাঁক। সে হাঁক শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবারই চমক ভাঙে। আচার্য বিনায়কের ঘুম ভেঙে যায়। অঞ্জনা চটপট উঠে পড়ে সাজতে শুরু করে। মেয়েটা আবেকটু ঘুমোক ভেবে, সে আগে থেকেই আর তাকে জাগায় না। শৈবালও হাতের সিগ্রেটের টুকরোটা বাঁ পায়ের তলায় পিষে ফেলে তৈরি হবার উদ্যোগ করে। টুক টুক করে ওপরে উঠে আসেন মুন্সীবাবু।

কিন্তু অমরেশবাবু বেরোন নি এখনো? দুটো বেজে গেছে কিন্তু। আড়াইটার মধ্যে রওনা হতেই হবে।

এই যে আমিও উঠে পড়েছি। এক্ষুনি আসছি আমি।—শৈবালকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন মুন্সীবাবু, তার উত্তর আসে অমরেশবাবুর ঘর থেকে। তিনি দোর বন্ধ করেই স্নানান্তে নিত্য-পুজোয় বসেন। অতিথি-অভ্যাগত এলেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

বাস্তবিকই তিন-চার মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে দোর খুলে বেরিয়ে আসেন অমরেশবাবু। শৈবাল এবং মাস্টারমশাইও তৈরী।

অঞ্জনার দেরি কেন?—কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে শৈবাল একবার দেখতে যায় কি হল, দেরি কেন।

শিখা সেজেগুজে আয়নায় মুখ দেখছে আর কোথাও কোনো খুঁত রয়ে গেল কিনা তার পরখ করে চলেছে।

একবার সাজগোছ শেষ করে কেন আবার শাড়ি পাল্টাচ্ছে কে জানে! মেয়েদের ব্যাপার বুঝে ওঠা দুরূহ। আর সে সব দুরূহ ব্যাপার নিয়ে কোনো দিনই মাথা ঘামায় নি শৈবাল। তাই যে মুহূর্তে অঞ্জনা বললে, তুমি যাও আমি এক্ষুনি আসছি, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সে সরে আসে।

অঞ্জনা অবশ্য আর মোটেই দেরি করে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে শিখাকে নিয়ে দলের মধ্যে হাজির।

শাড়ি পাল্টাতে না হলে অঞ্জনাকে আর খোঁজ করতে হত না। আচার্য বিনায়ক তাকে আকাশ রং-এর পোষাক পরতে দেখলে খুব তারিফ করতেন, হঠাৎ সে কথা মনে পড়ে যায় অঞ্জনার। আর তাই এই শাড়ি পাল্টানো। কী বা এমন দেরি হয়েছে তাতে! মনে মনে একবার ভাবে অঞ্জনা।

চলুন, চলুন এবার। গেটে গাড়ি তৈরী।—সবাইকে একত্র পেয়ে অরিজিৎ মুন্সী তাড়া দেয় এবার।

কিন্তু ডাক্তারের যে আসবার কথা ছিল, তিনি কোথায়?—বিনায়কবাবু বন্ধুর জন্যে একটু অস্থিরতা প্রকাশ করেন।

এই যে, এই যে, বলতে বলতেই এসে পড়েছেন ডাঃ দাস!—অমরেশবাবুর চোখে পড়তেই হেঁকে ওঠেন। তাঁর দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণেও তাঁর ভুল হয় না।

আচ্ছা আপনারা এগোন। বিনায়কের স্যুটকেশটা আমি ওপরে রেখে আসছি।—এই বলে ঝড়ের বেগে অতিথিশালায়

উঠে গিয়ে ডাক্তার যথাস্থানে তাঁর বন্ধুর ছোট্ট স্যুটকেশটি রেখে আসেন।

গাড়ি মানে গোরুর গাড়ি। অঞ্জনা আর শিখার পক্ষে হাঁটা আর সম্ভব নয় বুঝেই মুন্সীবাবু এবার গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। দুখানা গাড়ি। একখানা অতিথিদের জন্যে, অন্যখানা ওঁদের নিজেদের জন্যে।

একখানায় শৈবালদের উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ দাস নিচে নেমে এসে দেখেন তাঁরই জন্যে আর তিনজন অপেক্ষমান। চারজন তাঁরা এক গাড়িতেই উঠে বসেন। তাঁদেব গাড়িই আগে আগে চলে। শৈবালদের গাড়ি চলে পিছে পিছে।

গোরুর গাড়ি হেলে দুলে চলে। অঞ্জনার ভয় ভয় লাগে। এক একবার চমকে চমকে ওঠে। মনে হয় গাড়ি উল্টে যাবে বুঝি। গোরুর গাড়িতে চড়ার এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রথম বলেই এত ভয়। কিন্তু আসলে ভয়ের কিছুই নেই। গাড়োয়ান খুবই সতর্ক। গোরু একটু বেতালা চললেই শপাং শপাং চাবুক পড়ে পিঠে। আর মুখে একটা কী বিকট ধ্বনেরই না শব্দ করে গাড়োয়ান। ঐ শাসানিতেই গোরু দুটো আবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঠিকমতো চলে।

গাড়োয়ান ঠিকই তাব গোরুকে শাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু অঞ্জনা তাব নিজের মনকে শাসনে রাখতে পারছে না কেন? শৈবাল শিখাকে কোলে নিয়ে বসেছে গাড়ির ঠিক মুখের দিকে। মেয়েকে সে এটা ওটা দেখাচ্ছে আর বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। শতরঞ্জের নিচে খড়ের গাদা কেবলি মচমচ করছে। শিখার খুবই আমোদ লাগছে তাতে।

এ গাড়ি কিন্তু বেশ বাবা, বেশ আস্তে আস্তে চলে, কেমন সুন্দর মচমচ শব্দ করে।—শিখা ওর বাবাকে বলে।

বাপ-মেয়ের এসব আলোচনায় তখন লক্ষ্য নেই অঞ্জনার। তার মনে তখন খচমচ করছে অন্য চিন্তা। এ গাড়িতেই তো মাস্টার মশাই আসতে পারতেন। তাঁর তৃপ্তির জন্যেই আকাশ রং-এর এই শাড়ি পরা। ব্লাউজও তার সঙ্গে ম্যাচ করেই পরা হয়েছে। আর

তাঁকে উঠিয়ে দেওয়া হল আগের গাড়িতে। অঞ্জনা এজন্যে মনে মনে চটে যায় মুন্সীবাবুর ওপর।

অঞ্জনার মনের এই ক্ষোভের ঢেউ-ই বুঝি সামনের গাড়িকে হঠাৎ বেশি রকম ছুলিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, গোরু ছুটো যেন আর টানতে পারছে না গাড়িটাকে। চার-চারজন গোটা জোয়ান মানুষের ওজন তো বড় কম নয়! গোরু ছুটোকে মিছিমিছি অমন করে পিটলে আর কী হবে?

বিনায়কবাবুও তো আমাদের অতিথি। ওঁকে পিছনের গাড়িতে তুললেই ভাল হত।—অমরেশবাবু জোরে জোরেই এই মন্তব্যটুকু করেন আর তার রেশ অঞ্জনার কানেও যে যায় না তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যে ভাবনা বিনায়কের মনকেও আন্দোলিত করছিল, অমরেশবাবুও ঠিক তাই বলে ফেললেন।

গাড়ি আর চলছে না দেখে মুন্সীবাবু তখন বললেন, তা হলে তাই হোক, কলকাতার মানুষদেব সব এক গাড়িতে যাওয়াই ভাল। আসুন বিনায়কবাবু, আপনি পিছনের গাড়িতেই এসে উঠুন।

যথানির্দেশ স্থানবদল করলেন আচার্য বিনায়ক। মনের ঝড় শান্ত হল। একটি মনের নয়, ছুটি মনেব।

শৈবাল তাব পাশে জায়গা কবে দেয় মাস্টারমশাইকে। ভুরভুরে এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে অঞ্জনা শিখাকে টেনে নেয় তার কোলের কাছে। ছোঁয়া লাগতেই মাস্টাব শিউরে ওঠেন।

ছুখানা গাড়িই এবার সুন্দর চলেছে। স্বাভাবিক গতি। নিরুদ্বেগে পথ অতিক্রম। কতটুকু পথই বা আর বাকি ছিল! দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পড়ে সাঁওতাল পাড়ায়।

সাঁওতাল পাড়ার মুখেই মাধু সাঁওতালের ঘর। মাধব মুণ্ডারই আজ মেয়ের বিয়ে। তার বাড়ির উঠোনে তাই এত ভিড়, এত জটলা। মাধব মুণ্ডাকেই গোসাবার লোকেরা বলে মাধু সাঁওতাল। এই নামেই সে ছেলেবুড়ো সবার কাছে পরিচিত।

॥ ৩ ॥

মাদলের তালে তালে নাচ চলেছে তখন। মাধুর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষেই এই-নৃত্য উৎসব। সঙ্গীদের সহ সস্ত্রীক শৈবালকে নিয়ে নাচের আসরে বিশেষ সম্মানের আসনেই বসানো হল।

বর আসবার সময় যতই এগিয়ে আসছে নাচের ধুম ততই বেড়ে চলেছে। শিখা অবাক হয়ে চেয়ে আছে সেই নাচের দিকে। অঞ্জনারও এমন সাঁওতালি নাচ দেখবার সুযোগ কোনোদিন তো এর আগে আর হয় নি, এ নাচের অভিনবত্ব তাই ওদের এতটা মুগ্ধ করেছে। শৈবালও যে কম উপভোগ করছে তা নয়। মাদলের বাজনা ও নাচের তাল তার ওপর এমন মোহ বিস্তার করেছে যে সেই থেকে সেও নির্বাক। আর আচার্য বিনায়কের কথা তো কিছু বলারই নেই—গানের জগতের মানুষ তিনি, এই নৃত্যোৎসবে তাই আত্মহারা!

হঠাৎ একটা রব উঠল 'ঐ বর আসছে' 'ঐ বর আসছে' বলে। নাচের ধুমও চড়ে উঠল চরমে। ছেলে-ছোকরাদের এক দল আর মেয়েরা অনেকেই ছুটে গেল সেদিকে। নাচ চলতেই থাকল।

বরের শোভাযাত্রা সেই নাচের আসরেই এসে ঢুকল। কাচের চুড়ি, রুপোর গয়না ও ফুলের গয়নায় সুসজ্জিতা কনে। তার দু পাশে মঙ্গলঘট মাথায় দুটি মেয়ে। মিলন মাঙ্গলিকের এই হল প্রধান চিহ্ন। বরণডালার অনুষ্ঠান আগেই হয়ে গিয়েছে। কনেকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এতক্ষণ ধরে বরের অপেক্ষায়। বর তার নিজের বাড়িতে সব রকমের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সেরে সগৌরবে বিয়ে করতে এসেছে শোভাযাত্রা করে। সেই শোভাযাত্রারই পুরোভাগে বীরবেশী বর উল্টোদিক থেকে আসরে ঢুকতেই একেবারে কনের সঙ্গে

মুখোমুখি। আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে আনন্দোল্লাস। নাচের আসর এবার সত্যিকারের বিয়ের আসরে রূপান্তরিত।

বর আর কনে। দু জনের হাতেই একটি করে আম্রপল্লবের ডাল। অঞ্জনা দেখছে আর ভাবছে, আমাদের প্রথার সঙ্গে সাঁওতালদের বিয়ের রীতিনীতিরও দেখছি অনেক মিল। বিস্ময় তার আরো বেড়ে যায় বর-কনেকে আসরের মাঝখানে এসে পাঁচ পাক ঘুরতে দেখে। তারা ঘুরছে আর পরস্পর পরস্পরকে আম্রপল্লবের মৃদু আঘাত হানছে। পড়শীরা জল ছিটোচ্ছে।

তার জীবনেও এমনি একটি বিশেষ দিন এসেছিল। অঞ্জনার মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা এবং তখনকার নানা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মাদলের বাজনা থেমেছে। নাচও থেমে আছে কিছুক্ষণ ধরে। সেই অবকাশেই কিছু কিছু গল্পসল্প চলেছে উপস্থিত সকলের মধ্যে।

কী হে, কেমন লাগছে মাস্টার? একেবারেই নিষ্পলক নিস্তব্ধ হয়ে আছে!—ডাক্তার-বন্ধুই প্রথমে মুখ খুলে জিজ্ঞেস করেন আচার্য বিনায়ককে তারপরে সেই সূত্র ধরেই অতিথিশালার দলটির মধ্যে আলোচনা বেশ জমে ওঠে।

এদিকে কিছুক্ষণ কাটতেই হঠাৎ আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা আসর।

হঠাৎ কী হল? কিসের এত উল্লাস?—জানতে চায় শৈবাল। গল্পে গল্পে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে।

বা রে দেখলে না বুঝি, কনের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিল যে বর। তার জন্যেই এত হাততালি, এত আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাজনারও শুরু।—কর্তার প্রশ্নের উত্তর দেয় অঞ্জনা।

আর ঠিক তক্ষুনি এক পাশ থেকে মাধু সাঁওতাল ছুটে এসে একেবারে শৈবালের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নবদম্পতির জন্যে। শৈবালকে ভাল করে

বুঝিয়ে বলে, জানলি হুজুর, এতেক আমার ছাওয়াল যুধিষ্ঠিরের বৌ হইলো।

বলতে বলতে চোখ জোড়া ছলছল করে ওঠে মাধু সাঁওতালের। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে আরেক দিকে চলে যায়। বাজনার সঙ্গে আবার নাচ আরম্ভ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

আমাদের কিন্তু আর বেশিক্ষণ দেরি করা ঠিক হবে না।

হ্যাঁ, কাছারিবাড়িতে হয়তো অনেকেই ধীরে ধীরে এসে জড়ো হয়ে যাবেন আমাদের পৌঁছনোর আগেই। দেখি, মাধুকে বলে বিদায় নেবার উদ্যোগ করা যাক তা হলে।—অরিজিৎ মুন্সীর তাগিদে এই বলে আসন ছেড়ে উঠে পড়েন অমরেশবাবু।

তাঁকে উঠতে দেখে অঞ্জনা যেন আপত্তি করে। বলে, সে কি এখুনি উঠছেন যে! আরো কত কি হয়তো মজার মজার জিনিস দেখার আছে।

তা ঠিকই আছে। তবে তার অনেকগুলোই আমাদের স্ত্রী-আচারের মতো। একটু বাদেই বর-কনেকে পুকুরে নিয়ে যাওয়া হবে। কনেকে না দেখিয়ে একটি মঙ্গলকলস জলে ডুবিয়ে রাখবে বর আর কনেকে তা খুঁজে বার করতে হবে। আবার কনেও তা পুকুরের কোথাও লুকিয়ে রাখবে আর সেই লুকানো কলস বর খুঁজে খুঁজে উদ্ধার করে আনবে। এমনি সব ব্যাপার চলবে অনেকক্ষণ ধরে। সে সব আর কী দেখবেন মা?—অমরেশবাবুর এ কথার ওপর আর কিছু বলতে ভরসা পায় না অঞ্জনা। তবে তার চোখে মুখে একটা বেজার ভাব সহজেই নজরে পড়ে।

সেই বেজার ভাব লক্ষ্য করেই অমরেশবাবু আবার বলেন, আপনার গান শোনার জন্যে যারা এসে কাছারিবাড়িতে জড়ো হবেন, আপনাকে না পেয়ে তাঁদের যদি ফিরে যেতে হয় তা হলে সেটা কত দুঃখের হবে, বলুন তো মা! তা ছাড়া আবার মাস্টারমশাইয়ের

গান শোনারও একটা সুযোগ পেয়ে গেছি। সে সুযোগ কি ছাড়তে পারি মা?

সাত-আট বছর পর আবার মাস্টারমশাই-এর গান শুনব সে কি আমার কাছেও কম আনন্দের বিষয় অমরেশবাবু!—অঞ্জনার চোখের তারা যেন খুশিতে ঝিকমিক করে ওঠে এ উত্তর দিতে গিয়ে। একটু থেমে নিয়ে আবার সে বলে, বেশ, ফেরবার ব্যবস্থাই এবার করুন তা হলে।

মাধু দূর থেকে দেখতে পেয়েছে, অমরেশবাবু উঠে পড়েছেন। তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরাও উঠব উঠব করছেন। ছুটে এসে গলবস্ত্র হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে।

কোনো আমন্ত্রিত লোক অভুক্ত অবস্থায় বিয়ে-বাড়ি থেকে চলে যাবে এ হতেই পারে না। অমরেশবাবু এবং অরিজিৎবাবুর কোনো যুক্তিই কাবু করতে পারে না মাধবকে। এই সব ভদ্র-লোকরা তার বাড়ি থেকে একেবারে কিছু মুখে না দিয়ে চলে গেলে সাঁওতালদের আতিথেয়তার দুর্নাম হবে না, আর তার জন্যে তো সবাই তাকেই দায়ী করবে—সোজা সরল মানুষ হলেও এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি মাধু সাঁওতালের আছে। সে তাই পায়ে পড়ে পড়ে সকলকে রাজী করায় একটু কিছু খেয়ে যাবার জন্য। একটি ছোট্ট চালাঘরে ওঁদের নিয়ে যায়। শৈবালদের জন্য খাবারদাবারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই ঘরে।

মাধু এক একটি কথা বলে আর ভুরভুর তাড়ির গন্ধ ভেসে আসে। তবু কিন্তু মোটেই মাতাল হয়নি মাধু। সব দিকেই তার লক্ষ্য ঠিক আছে। বিয়ের কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেদিকে যেমনি, আবার অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়নের দিকেও তার প্রখর দৃষ্টি। এতে অবাক লেগেছে শৈবালের। বিয়ের আসরেও অনেককেই সে দেখেছে, চোখ তাদের ঢুলুঢুলু - জোড়া জোড়া সব রক্ত-গোলাপ। শিখা এবং অঞ্জনাকে নিয়ে সে এসেছে সাঁওতাল

বাড়ির বিয়ে দেখতে, কিন্তু এই মাতাল আবহাওয়ায় হঠাৎ যদি একটা গণ্ডগোল বোধে যায় তা হলেই মুশকিল। এই রকম একটা ভয়ই বার বার উঁকি দিচ্ছিল শৈবালের মনে। তবে অমরেশবাবুরা সবাই রয়েছেন, এ ভরসাও ছিল। যাই হোক ভালয় ভালয় সময়টা কেটে গেল, এবার নিশ্চিন্ত।

ভদ্রলোক অতিথিদের জন্যে খাওয়ার বিচিত্র আয়োজন করেছে সাঁওতাল। প্রত্যেকের সামনে এক পাতা করে ফল আর মিঠাই এবং এক গ্লাস করে দুধ। খুবই পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। আর মাধুর এমনি অনুরোধের জোর যে সবাইকে কিছু না কিছু খেতে হল।

বিদায় নেবার আগে অঞ্জনাকে কানে কানে গিয়ে কী যেন বলল শৈবাল।

অঞ্জনা গাড়িতে ওঠবার আগে মাধুর হাতে দশটা টাকার একটি নোট গুঁজে দিলে। তাকে বুঝিয়ে বললে তার মেয়ের জন্য এ তার আশীর্বাদ, এ টাকা দিয়ে সে যেন তার মেয়েকে পছন্দমতো একখানা শাড়ি কিনে দেয়।

নোটটা হাতে পড়তেই খুশিতে যেন গ'লে যায় মাধু সাঁওতাল। গড় হয়ে অঞ্জনাকে পেন্নাম করে। এবং তার পরে এক এক বাবুদেরও।

আবার তোরা আসবি হুজুর। আবার তোরা আসবি কিন্তু।— গাড়ি ছেড়ে দিতেই হাত তুলে জোর গলায় হেঁকে হেঁকে বলে মাধু সাঁওতাল। গাড়ি দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলে তবেই সে ঘরে ফিরে আসে।

এবার গাড়িতে কিছুটা অদলবদল করা হয়েছে যাত্রীদের। শৈবালের প্রস্তাব মতোই তা করা হয়েছে। শৈবালের জায়গায় অমরেশবাবু এসেছেন, মুন্সীবাবুদের গাড়িতে গিয়েছে শৈবাল।

এ ব্যবস্থায় ভালই হয়েছে। সাঁওতালদের সম্বন্ধে, গোসাবার অন্যান্য নানা বিষয়ে নানা তথ্য অমরেশবাবু বুঝিয়ে চলেছেন

অঞ্জনাকে, বিনায়কবাবুকে এবং সময় সময় শিখারও হঠাৎ দু-একটা প্রশ্নের জবাব তাঁকে দিতে হচ্ছে। আর অন্য গাড়িতে রয়েছেন পাকা ওস্তাদ মুন্সীবাবু—শৈবালের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁর একেবারে ঠোঁটের ওপর।

ওঁকে বলেছিলাম সম্ভব হলে আরেকটা দিন বেশি থেকে যেতে। তা হলে বিয়ের উৎসবটা পুরো দেখে আসা যেত। সত্যি সত্যি ভারি ভাল লাগছিল।

কিন্তু শৈবালবাবু কিছুতেই রাজী হলেন না, তাই তো?—গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জনার আপসোসকে আরেকটু তাতিয়ে দেন অমরেশবাবু।

না, কিছুতেই তাঁর মত আদায় করা গেল না। যাক গে, কী আর করা যাবে? তবে কতকগুলো ব্যাপার আমার খুব জানতে ইচ্ছে।

কী কী বলুন?

সাঁওতালদের বিয়ের কথাই ধরুন। ওদের সব বিয়েই কি এমনিভাবেই হয়ে থাকে নাকি?

ঠিক তা বলা চলে না। তবে মোটামুটি ধরনটা বোধ হয় সব জায়গার সাঁওতালদের মধ্যেই একরকম। তা হলেও এই একটি কথা জেনে রাখবেন মা, যুগের হাওয়া ওদের গায়েও গিয়ে লেগেছে। এপারের ঢেউ ওপারের মাটি ধসে ফেলছে।

তাই তো দেখছি। ছোটবেলা বইপত্রে সাঁওতালদের সম্বন্ধে যেসব কথা পড়েছি তার সঙ্গে অনেক কিছুরই যেন মিল পেলাম না এখানে। সভ্য জগতের মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে ওরা বোধ হয় অনেকটা পাল্টে গেছে।

শুধু কি তাই মা, ওই যে কী যেন লভ ম্যারেজ বলে একটা কথা খুব আজকাল চালু হয়েছে, এই সাঁওতালদের মধ্যেও হালে দেখছি সে রকম বিয়ে খুব জোর চলেছে।—অমরেশবাবুর এ কথায়

অঞ্জনা বোধ হয় লজ্জায়ই একটু মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তবে সেই সুযোগে মুখ খোলেন আচার্য বিনায়ক।

কেমন, কেমন ?—খুব আগ্রেহের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন মাস্টার মশাই।

তা হলে শুনুন, এই অল্প কিছুদিন আগেরই একটি ঘটনার কথা বলছি। ঐ আমাদের মহাদেব মাঝির ছেলে সহদেবের বিয়ে নিয়েই বেশ একটা সোরগোল পড়ে দিয়েছিল সাঁওতাল পাড়ায়।

তাই বুঝি ? ভেরি ইন্টারেস্টিং।—ঔৎসুক্য বেড়ে ওঠে বিনায়ক-বাবুর সে কাহিনী শোনবার জন্যে। আর চুপ করে থাকলেও অঞ্জনাও তার দু কান খাড়া করে রাখে সেই দিকেই।

অমরেশবাবু বলে চলেছেন, মহাদেবেরই প্রতিবেশী ভীম সাঁওতালের মেয়ে সোনা। লুকিয়ে লুকিয়ে এই মেয়েটার সঙ্গে সহদেব ছোঁড়াটা ভাব জমিয়ে চলেছিল অনেকদিন ধরে। সোনাকে নিয়ে পালিয়ে যাবারই সে মতলব এঁটেছিল। অনেকবারই মেয়েটার কাছে সে ঐ প্রস্তাব পেড়েছিল। সোনা ভয় পেয়েছে, রাজী হয় নি। তখন আর কী করবে সহদেব ? আর সহ্য করতে না পেরে এর একটা ফয়সলা করে ফেলার জন্য সহদেব একদিন সরাসরি একেবারে ভীমের বাড়িতে গিয়ে হাজির। তখন বাড়িতেই ছিল ভীম দাস, তার স্ত্রী আর সোনা মেয়েটাও। ভীম আর তার স্ত্রীর সামনেই সোনাকে কাছে টেনে নিয়ে ছোঁড়াটা সোজাসুজি বলে দিলে যে তাদের মেয়েকে ও বিয়ে করবে।

উরে বাপস্, কী দুঃসাহস ছেলেটার ?—মন্তব্য করেন বিনায়কবাবু।

ঠিকই বলেছেন, কিন্তু কাপুরুষরা কি আর বাঞ্ছিতাকে লাভ করতে পারে মাস্টারমশাই, তবে এক্ষেত্রে এ দুঃসাহসের একটা অবশ্য কারণও আছে। তাকে আর সবাই একটু মান্যগণ্য করে, ভয়ডরও পায়। তারই সুযোগ নিয়েছে ছোকরা। কিন্তু তাহলেও

ছাড়াছাড়ি নেই, বেআইনীভাবে কোন মেয়ের গায়ে হাত দিলেই সাজা পেতে হয় ওদের মধ্যে। মেয়েটা ছুটে পালিয়ে যেতেই ওর বাপ রেগে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই যেয়ে নালিশ করে দিয়ে এল ওদের পঞ্চায়েতের কাছে। সহদেব আর সোনা দুজনকেই পঞ্চায়েতের কাছে হাজির করা হল। প্রথমেই সহদেব স্বীকার পেল সোনার গায়ে সে হাত দিয়েছে। এই জন্যে এক জোড়া চাষের বলদ তাকে দিতে হবে, এই তার শাস্তি হল। তার পর বিয়ের প্রশ্ন নিয়ে বিচার আরম্ভ হল। কিন্তু জেরার পর জেরা করে যখন জানা গেল যে সোনাও সহদেবকেই বিয়ে করতে চায় তখন পঞ্চায়েত আর কী করবে! তবে গোপনে গোপনে এ বিয়ের ব্যবস্থা করায় ছেলেটাকে আরেক দফা জরিমানা দিতে হবে সাব্যস্ত হল। আর ঐ পঁচাত্তর টাকা জরিমানা মহাদেবের হাতে গুনে গুনে দিয়েই সোনাকে বৌ করে নিয়ে নতুন সংসার পেতে বসে সহদেব।

অমরেশবাবুর মুখে এই কাহিনী শুনে অঞ্জনা এবং আচার্য বিনায়ক উভয়েরই বুকের ভেতরটায় খচমচ করে ওঠে। পুরোনো দিনের কতকগুলো স্মৃতি হুড়মুড় করে চলে যায় তাদের চোখের সামনে দিয়ে।

কিছুক্ষণ ধরে অমরেশবাবুদের গাড়িতে সবাই চুপচাপ।

হঠাৎ মায়ের কোল থেকে লাফিয়ে উঠে শিখা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, বড় বড় ঐ পাখিগুলো কি পাখি মা—মাঠের মধ্যে ওগুলো ওখানে কি করছে বল না?

মেয়ের আবদারে মা গলে যায়। কিন্তু কোথায় কী দেখাচ্ছে শিখা? অঞ্জনার কিছু চোখেই পড়ে না। সে সোজাসুজি রাস্তা বরাবর দেখছিল, তাই চোখে পড়ে নি।

এই যে ডান দিকে ছ্যাখো না, ঐ তো মাঠের মধ্যে কী যেন *খাচ্ছে!—এবার* থুতনি ধরে টেনে ঠিক দিকে মায়ের মুখ ঘুরিয়ে দেয় শিখা।

ওগুলো শকুন। গোরু কি মোষ মরেছে, তাই খাচ্ছে। ওরা অমনি করেই দল বেঁধে মরা গোরু-ভেড়া এসব খায়। থাক, ওদিকে আর তাকাতে নেই মা। বড্ড ঘেন্না!—রুমালে নাক ঢেকে এ কটি কথা বলে মেয়েকে আবার কোলে টেনে বসিয়ে নেয় অঞ্জনা।

শিখারও খুব ঘেন্না লাগে। এ্যা মা, কি বিশ্রী পাখি ওগুলো—মরা খায়! এই বলে শিখা ওর ফ্রক তুলে ঘেন্নায় নাক ঢাকে। চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে।

অমরেশবাবুর গল্প শেষ হবার পর আর একটি কথাও বলেন নি আচার্য বিনায়ক। সহদেবের কাহিনীই তাঁর মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। বাঞ্ছিতাকে পেতে হলে দুঃসাহসী হওয়া দরকার, পৌরুষের প্রয়োজন—অমরেশবাবুর এ যুক্তি তাঁর মনে কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সে সময় আরেকখানা গোরুর গাড়িরও কথার তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতেই অমরেশবাবুদের অনুসরণ করে চলছিল। কথায় মুন্সীবাবুর জুড়ি গোসাবায় নেই। কাজেই তাঁর সঙ্গী হওয়া একদিক থেকে শৈবালের পক্ষে ভালই হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে একটু আধটু বাড়িয়ে চড়িয়ে বললেও তাতে এমন কিছু এসে যায় না। কিছুটা ছাঁটকাট করে নিলেও তথ্যের যোগফলটা মোটামুটি বেশ একটা বড় অঙ্কেরই রূপ নেবে। নানা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জেনে যাওয়াটাই যে শৈবালের লক্ষ্য।

ডাঃ দাসের কাছ থেকেও গোসাবার লোকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, তাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং স্থানীয় জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ নেয় শৈবাল। তবে মুন্সীবাবুর একারই বলার কথা এত বেশি যে অন্য কারো কথা বলার তেমন ফুরসুতই হয় না।

ফিরতি পথে গাড়িতেও প্রথম সাঁওতালদের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। ওদের সহজ সরল আনন্দময় জীবনের

পিছনে যে দুঃখ-বেদনার ইতিহাস চাপা পড়ে আছে সেই কথাটাই শৈবাল তুলেছিল।

টুক করে তার সেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুন্সীবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলতে লেগে গেলেন সাঁওতালদের দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাসের কথা।

ঠিকই বলেছেন আপনি, শৈবালবাবু, সুন্দরবনের সাঁওতালদের দুঃখের অন্ত নেই। সুন্দরবনের এখানে ওখানে যত সাঁওতাল ছড়ানো রয়েছে, বিশেষ করে কালিন্দী নদী বরাবর এলাকার লক্ষাধিক আদিবাসী সাঁওতাল আজ যেমন ভূমিহারা সর্বহারা ভিখারী-জীবন যাপন করছে, আগে তাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। জমিদার শ্রেণী এবং তাদের নায়েব-গোমস্তাদের চক্রান্ত ও কৌশলের ফল এসব। নিরীহ সাঁওতাল ও আর সব দরিদ্র মানুষকে নানাভাবে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করেই তো তারা জমিদারীর পর জমিদারী বাড়িয়ে এবং বাড়ির পর বাড়ি করে চলেছে।

শৈবাল কোনোরকম সাড়া-শব্দ না করে একমনে শুনে চলেছে। মুন্সীবাবু অনর্গল বলে চলেছেন।

আপনি নিশ্চয় বোধহয় জানেন শৈবালবাবু, জানেন বলছি এজন্যে যে এতদিনে নিশ্চয়ই আপনি আপনার দপ্তরের নথিপত্র দেখে থাকবেন। খুবই হালের ঘটনা কিনা তাই রেকর্ডের মধ্যে আপনার তা চোখে পড়ার কথা।

অত ভূমিকা না করে ব্যাপারটা কি তাই বলুন না!—এবার আর কিছু না বলে থাকতে পারে না শৈবাল। এবং একটু কড়া সুরেই বলে।

হ্যাঁ, গত বছরের সেই ঘটনার কথাই বলছি। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের একজন আর আমাদের সমবায় দপ্তরের একজন এই দুই অফিসার এসেছিলেন সেবার সুন্দরবন সফরে। প্রায় আট-দশ দিন তাঁরা কাটিয়ে গেছেন সুন্দরবনের নানা অঞ্চল ঘুরে ঘুরে।

সব শেষে তাঁরা এসেছিলেন গোসাবায়। এখানেই তাঁরা কথায় কথায় বলছিলেন, আদিবাসী সমাজ সর্বত্রই পিছিয়ে আছে সত্যি কথা, কিন্তু সুন্দরবনের সাঁওতালদের দুঃখের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার আর কোনো জায়গার আদিবাসীদের দুর্দশার তুলনা করা চলে না।

তাই না কি, এরকম কথা বলেছিলেন ওরা?—শৈবাল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আমি নিজে শুনেছি তাঁদের সে কথা বলতে। এবং সে রকম রিপোর্টও নাকি তাঁরা সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। আর সাঁওতালদের সংখ্যা তো বড় কম নয় সুন্দরবনে। আমাদের এই সন্দেশখালি থানারই একটা ইউনিয়নের প্রায় পনেরো হাজার লোকের মধ্যে প্রায় এগারো হাজারই সাঁওতাল। আর এসব সাঁওতালের কী দুর্দশা সে আর কী বলব শৈবালবাবু! টাকার লোভ দেখিয়ে জমির লোভ দেখিয়ে উত্তর বাংলা থেকে, সাঁওতাল-পরগণা থেকে, বিহার-উড়িষ্যার নানা জায়গা থেকে এদেরই বাপ-ঠাকুর্দাদের দলে দলে নিয়ে এসে যারা জঙ্গল সাফ করিয়ে আজ এক-এক জমিদার তাদের এতটুকু দুঃখু নেই এই নিরীহ মানুষগুলোর জন্যে। বরং এই দুঃখী মানুষগুলোর ওপর যখন-তখন মারধর নির্যাতন চালাতেই যেন জমিদারের লোকজনরা এখনো আনন্দ পায়।

হুঁ, তবে মাত্রার উনিশ-বিশ থাকলেও এখানে এই গোসাবাতেও যে গরীবের ওপর কোনো পীড়ন-নির্যাতন চলে না তেমন কথা তো নিশ্চয়ই বলা চলে না।—শৈবালের এই মন্তব্য শুনেই হকচকিয়ে ওঠেন মুন্সীবাবু।

না-না, গোসাবার অবস্থা অন্যরকম। সুন্দরবনের অন্য সব এলাকার তুলনায় এখানকার সাঁওতালরা অনেক সুখে অনেক বেশি আনন্দে আছে সে তো আপনি দেখেই এলেন।

থাক, থাক, এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। আপনার বাড়ি আর কদ্দূর তাই বলুন। সন্ধ্যে তো হয়ে এল প্রায়।

ঐ তো, আরেকটু এগুলেই আমার বাড়ি।

আরে গোসাবায় ট্রাক্টরও এসে গেছে দেখছি!—রাস্তার পাশেই একটা ট্রাক্টর চলতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে শৈবাল।

কিন্তু এতে এতটা অবাক হবার কী আছে শৈবালবাবু! সুন্দরবনে সভ্যতার উপকরণের যত কিছু আমদানি তার সবই তো এই গোসাবা থেকেই শুরু। ট্রাক্টরের চাষও এখানেই প্রথম আরম্ভ হয়েছে, ধীরে ধীরে সারা সুন্দরবনেই তা চালু হয়ে যাবে। সরকার যদি সুন্দরবনের দিকে একটু তাড়াতাড়ি নজর দেন সুন্দরবনের অফুরন্ত সম্পদের পরিচয় পেতে খুব বেশি দেরি হবে না।—এই বলে খুব একটা উজ্জ্বল আশার চিত্র মুন্সীবাবু তুলে ধরেন শৈবালবাবুর সামনে। গাড়ি দুটোও সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

আরে আরে, আমরা যে এসে গিয়েছি! কথায় কথায় আমার খেয়ালই ছিল না কিছু। নামুন, নামুন এবার শৈবালবাবু। ডাক্তারবাবুর চোখ লেগে এসেছিল যেন একটু!—বলেই হুড়মুড় করে আগে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন মুন্সীবাবু। তার পরে হাত ধরে নামান ডাক্তারবাবুকে এবং শৈবালবাবুকে।

অঞ্জনাদের নিয়ে অমরেশবাবু আগেই গাড়ি থেকে নেমেছেন। মুন্সীবাবুর বাড়ির মেয়েরা অঞ্জনা এবং শিখাকে এরই মধ্যে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে।

শিখাকে কোলে নেবার জন্যে মুন্সীবাবুব বড় মেয়ে কঙ্কার সে কী চেষ্টা! কিন্তু কিছুতেই তার কোলে যাবে না সে। তার মাকে সে জাপটে ধরে থাকে। তার পর বাপ এসে যেই বলে, চল চল, তখন তার কোলে চেপেই মুন্সীবাবুদের ঘরে গিয়ে সে চুপটি করে বসে পড়ে বাবা ও মায়ের মাঝখানে।

আত্মীয়ের অভ্যর্থনায় বেশি সময় কিন্তু আপনাকে নিতে দেওয়া হবে না অরিজিৎবাবু।—আগে থেকেই সতর্ক করে দেন অমরেশচন্দ্র।

না, মোটেই সময় নেব না, সেদিকে আমার বেশ খেয়াল আছে। চা-ও তৈরী। কাজেই দেরি হবার কোনো কারণও নেই।—মুন্সীবাবুর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর মেয়েরা সব হাতে হাতে পিঠের বাটি আর চা নিয়ে এসে হাজির।

সে কি, এখনো তো পৌষ মাসের অনেক বাকি! কথায়ই বলে পৌষ-পিঠে। কিন্তু আপনারা দেখছি এখনই পিঠের মহোৎসব শুরু করে দিয়েছেন।—ডাক্তারবাবু চমকে ওঠেন বাটি বাটি পিঠে-পায়েস দেখে।

ডাঃ দাস কী যে বলেন, পৌষ না আসলে পিঠে খাওয়া চলবে না, এমন তো কোনো বিধি-নিষেধ নেই। বিশেষ করে আমরা বাঙাল মানুষ, শীতের আমেজ আরম্ভ হতেই আমাদের পিঠে-পায়েসেরও মরসুম শুরু হয়ে যায়। তবে অবশ্যি তার ধুম পড়ে যায় পৌষ সংক্রান্তিতে, সে কথা ঠিক।

ঠিক বলেছেন মুন্সীবাবু, ঐ ঠিক সাঁওতালদের টুসু উৎসবের মতো দাঁড়িয়ে গেল ব্যাপারটা। টুসুর আসল উৎসব হল পৌষ-সংক্রান্তিতে। কিন্তু তার মহড়া আরম্ভ হয়ে গেছে সেই কবে থেকে। একটু কান খাড়া রাখলেই যখন তখন যেখানে সেখানেই আজকাল টুসুর গান শুনতে পাওয়া যায়। এও অনেকটা তারই মতো, কী বলেন মুন্সীবাবু?

কথাটা হয়তো ঠিকই বলছেন আপনি, কিন্তু সাঁওতালদের সঙ্গে বাঙালদের এই তুলনাটায় আমার আপত্তি। —মুন্সীবাবুকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে ডাঃ দাস আগে থেকেই ফোঁড়ন কেটে বসেন।

যাক গে, ওসব কথা থাক এখন। আরম্ভ করুন।—সময় যে আর নষ্ট করা চলে না সে খেয়াল তাঁর আছে বলেই মুন্সীবাবু আর তর্কে নামতে চান না। তা ছাড়া তাঁর বাঙালত্বের গৌরবের জন্যে অমরেশবাবু প্রভৃতির কাছে তাঁকে প্রায়ই এমনি খোঁচা

সহ্য করতে হয়। তাতে এখন আর তেমন ভ্রূক্ষেপও তাঁর নেই।

কিন্তু আপনার এখানে যে আয়োজন দেখছি তাতে আরম্ভের আগেই সমাপ্তি ঘোষণা বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।—শৈবাল এতক্ষণে মুখ খোলে। এই সময়টুকুর মধ্যে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সেরে নিতে হয়েছে কিনা ওদের দুজনকে তাই এদিকের আলোচনায় তেমনভাবে যোগ দিতে পারে নি ওরা।

আত্মীয় হয়ে এমনি অনাত্মীয়ের মতো কথা বলছেন আপনি শৈবালবাবু, এ ভারি দুঃখের বিষয় কিন্তু!—বাস্তবিকই অরিজিৎবাবুর কালো মুখখানা যেন আরো ঘন কালিমায় ছেয়ে যায় শৈবালের ঐ মন্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে। বাড়ির আর সবাইও গম্ভীর হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অবস্থা বুঝতে পেরে শৈবালও সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রম সংশোধন করে নেয়।

সে বলে, আমি যা বলেছি তাতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। আমার বলবার কথা, বিয়ে-বাড়ি থেকে একদফা খেয়ে আসা হল, তার পরে এখানে আবার যদি এত খেতে হয় তা হলে আর গানের আসর বসানো চলবে না। বলুন মাস্টারমশাই, আপনি তো ওস্তাদ মানুষ, এ খাওয়ার পর গান গাইতে রাজী হবেন আপনি?

তা যা হয় হবে'খন। গান গাওয়ার যত অসুবিধেই হোক ইনি যখন আপনাদের জন্যেই এ আয়োজন করেছেন তাঁকে তো খুশি করতেই হবে।

খুবই খাঁটি কথা বলেছেন মাস্টারমশাই। যা হোক একটু কিছু করে সবাই যদি খেয়ে নেন তা হলে মুন্সীবাবুও তৃপ্ত হবেন আর বাড়ির মেয়েদের মেহনতও সার্থক হবে।—আবহাওয়াটা আবার বেশ শান্ত হল মাস্টারমশাই আর অমরেশবাবুর কথায়।

বেশ, চা-টা তো আমি খাবই, তার সঙ্গে একখানা লুচিও খাচ্ছি। দয়া করে তার পরে আর আমায় কোনো অনুরোধ

করবেন না মুন্সীবাবু—শৈবাল এই বলে চুমুক দেয় তার চায়ের কাপে।

এই অবসরে আমার কিন্তু একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে অমরেশবাবু!

কী বলুন তো?—জিজ্ঞেস করেন অমরেশবাবু।

ঐ যে আপনি টুসু গানের কথা বলেছিলেন, ও কিরকম গান তা আমি জানি নে। তার সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাইছিলাম।

বলুন না মুন্সীবাবু, টুসুর ব্যাপারটা অঞ্জনা দেবীকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আর আপনার তো বোধ হয় অনেক টুসু গান মুখস্থই আছে, তারও দু-একটা শুনিয়ে দিন না ওঁদের খাওয়া হতে হতে।

বেশ কথা, টুসুর ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে বলছি। তবে এক-আধটা গানের পদ মনে থাকলেও টুসুব কোনো পুরো গানই আমার মুখস্থ নেই। আমার ছোট মেয়ে লক্ষ্মী না হয় তার একটা শুনিয়ে দেবে। কৈ রে লক্ষ্মী মা, এদিকে আয় দেখি। অঞ্জনা দেবীকে একটা টুসুর গান শুনিয়ে যা।—বাপ লক্ষ্মীর নাম উচ্চারণ করতেই লজ্জায় সে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার দিদিরা তাকে ধরে এনে হাজির কবেছে সভার মাঝখানে।

মুন্সীবাবু বুঝিয়ে বললেন, আদিবাসীদের শ্রেষ্ঠ দেবতা টুসু মা। এই টুসু মাকে কেন্দ্র করে আদিবাসীরা সর্বত্র তাদের পৌষ পরব করে থাকে। সুন্দরবনের সাঁওতালরাও পৌষ আসবার এই উৎসবে মেতে ওঠে। নতুন নতুন কত গান তারা তৈরি করে এই উপলক্ষে। নাচ-গান, তীর-ধনুক খেলা আরো কত হৈ-হল্লার মধ্যে ওরা পৌষ-সংক্রান্তিতে টুসু মায়ের পূজার উৎসব শেষ করে মহাসমারোহে। নিজেদের দুঃখ মোচনের জন্যে দেবতাদের বন্দনা, টুসু মায়ের কাছে ওদের প্রার্থনার অন্ত নেই। এবার লক্ষ্মী মা তুমি এঁদের শুনিয়ে দাও দেখি তোমার ঐ সন্ধ্যাতারার ছোট্ট টুসু গানটা।

লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে লক্ষ্মী। শেষটায় বাপের তাগিদে,

দিদিদের তাড়ায় চোখ নামিয়ে রেখেই তরতর করে কোনো রকমে একবার আউড়ে যায় গানটা :

“সাঁঝ দিলাম শলিতা দিলাম
স্বর্গে দিলাম বাতি গো।
সকল দেবতা সঞ্জা লেও মা
লক্ষ্মী সরস্বতী গো।
সাক্ষী রাখি সঞ্জা তারা
তুমি যদি ঠিক হও মা তারা
ফিরে এস হয়ে ভবের তারা
আদিবাসীদের ঘরে আশীর্বাদ কর গো।”

আবৃত্তির সুরে এটুকু বলেই লক্ষ্মী একেবারে চোখের পলকে কোথায় দে-ছুট! বাবাটা যে কী। মনে মনে ভারি চটে যায় নয়-দশ বছরের মেয়ে লক্ষ্মী। সে আর কাছে না। কে জানে আবার যদি এমনি কিছু একটা হুকুম করে বসে বাবা, সেই ভয়।

এদিকে লুচি খাওয়া, পিঠে খাওয়া, চা পান যাঁর যেমন রুচি, যেমন ইচ্ছে সব শেষ। অমরেশবাবুব তো উপোস, তাঁর কোন ঝামেলাই নেই। তিনিই উঠে দাঁড়ান সবার আগে।

এবার চলুন তা হলে। নতুন গুড়ের পিঠে-পায়েসের গন্ধে আমারও যে তৃপ্তি বড় কম হল তা নয়। উপোস করলেও তাব ফলটা আমার মুন্সীবাবুই বোধ হয় মাটি করে দিলেন। কারণ তাঁর এখানে এসে ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং বাস্তবিকই আমার হয়ে গেছে, এ অস্বীকার করার উপায় নেই।—বলতে বলতে বাইরে নেমে আসেন অমরেশবাবু এবং তাঁর পিছে পিছে আর সবাই। সাজানো পান ভর্তি ডিবে হাতে করে সবার শেষে আসেন মুন্সীবাবু।

গোরুর গাড়িতে আর সাত-আট মিনিটের পথ কাছারিবাড়ি। প্রায় ঠিক সময়মতো গিয়েই পৌঁছনো যাবে। এক আধটুকু দেরি যা হবে তা মোটে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এটুকু আমি মায়ের সঙ্গেই

কথা বলতে বলতে যাই। আপনি এবার পিছনের গাড়িতেই আসুন অমরেশবাবু।—মুন্সীবাবুর ব্যবস্থা মতোই যাত্রী সাজানো হয় গাড়িতে এবং গাড়ি যাত্রা শুরু করে।

কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়ে আসছে অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে। অঞ্জনার ভয় ভয় লাগে। বাতি থাকে না এই গোরুর গাড়িতে? জিজ্ঞেস করে সে।

থাকে বৈ কি! আরে ও রাখহরি, তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দে রে। অঞ্জনা মা যে ভয় পাচ্ছেন!—মুন্সীবাবু ডাকতেই লণ্ঠনের কুপিতে দেশলাই ধরিয়ে দেয় গাড়োয়ান রাখহরি।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে কার হাতের ছোঁয়া যেন লাগছিল অঞ্জনার গায়ে। বোধহয় মাস্টারমশায়েরই। প্রথমটায় সে বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারে নি বলেই কথাটা তুলেছিল অঞ্জনা। মস্টারমশাই যে তার পাশেই বসেছিল সেটাই সে আগে লক্ষ্য করে নি। তার জন্যেই এত গোলমাল। আলোর জন্যে তার হাঁকডাক শুনে মাস্টারমশাই আবার কী ভাবলেন সেও এক ভাবনা অঞ্জনার। শিখাও যে তার মাকে অমনভাবে জড়িয়ে বসেছিল সেও তো ভয়ে ভয়েই। অন্ধকারে কোন ভূত এসে কিংবা কোন দস্যু-ডাকাত এসে তার মাকে না নিয়ে নেয়, তাকে না নিয়ে নেয় সেই ভয়।

লণ্ঠনের বাতি জ্বলতেই শিখা সোজা হয়ে বসে। তার মাও এবার যেন একেবারেই নিশ্চিন্ত।

আচার্য বিনায়ক তখন রহস্য করেই বোধ হয় বললেন, এবার ভয়-ভাবনা সব দূর হয়েছে তো!

না, ভয় আবার কিসের? আমাদের নিজেদের গাড়ি। আমরা এতগুলো লোক চলেছি একসঙ্গে। তা ছাড়া আমাদের গোসাবায় আমরা কাকে ভয় পাব? দেখছেন না আরেকটা গাড়িতে এখনো অবধি লণ্ঠন জ্বালাবার কথা ওদের মনেই আসে নি। -ভয়-ডরের ব্যাপারটাকে এমনিভাবে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেন মুন্সীবাবু। তার

পরে একটু থেমে আবার বলেন, আর এসেই তো গেলুম দেখতে দেখতে। ঐ তো আমাদের কাছারিবাড়ির ছাদের বিজলী আলো দেখা যাচ্ছে।

বলতেই অঞ্জনা, শিখা, বিনায়কবাবু সবাই হুমড়ি খেয়ে মুখ বাড়িয়ে কাছারিবাড়ির সেই আলো দেখার চেষ্টা করে। সে আলো গাড়ির সম্মুখ দিক থেকে সবারই চোখে পড়ে, কিন্তু তা দেখতে গিয়ে মাস্টার আর ছাত্রীর গায়ে গায়ে আবার ছোঁয়াছুঁয়ি ঘটে।

এবার কিন্তু তার জন্যে একটি কথাও বলে না অঞ্জনা। যেন কিছুই ঘটে নি তেমনিভাবেই চুপ করে থাকে। এ কি মাস্টার-মশায়ের হাতের ছোট্ট চাপও এবার আর তার মুখ ফোটাতে পারে না।

বরং বেশ কিছু বাদে অঞ্জনা যে কথা বলে সে অন্য কথা। সে বলে, শুধু কাছারিবাড়ির কেন, এখন তো চারদিকেই আলো দেখছি অরিজিৎবাবু। সবদিকেই আলোর আনন্দ।

আমরা এবার গোসাবা শহরেই এসে পড়েছি যে!—চারদিকের আলোর রহস্যটা এইভাবে বুঝিয়ে দেন মুন্সীবাবু। অন্যদিকে মাস্টারমশাই কিন্তু অঞ্জনার কথার আরো একটা মানে বার করে নিয়ে মনে মনে অত্যন্ত খুশি হয়ে ওঠেন।

কাছারির দুয়ারে এসে গাড়ি থামে। একটার পর আরেকটাও এসে থামে। অমরেশবাবুদের গাড়িতে লণ্ঠন মোটে জ্বালানোই হয় নি। অন্ধকারে বসে বসেই কথায় কথায় ওঁরা আলোর রাজ্যে এসে পড়েছেন।

॥ ৪ ॥

কাছারিবাড়ির ওপরে নিচে তখন অনেক লোকজনের ভিড়। গানের আসর বসবে, কলকাতার গাইয়েদের গান শোনা যাবে, তারই জন্যে ধীরে ধীরে এত লোক এসে জড়ো হয়েছে এখানে।

ছাদে উঠে আসর-ভর্তি লোক দেখে অঞ্জনা তো অবাক। এক বেলার মধ্যে এত বিরাট আয়োজন কিভাবে সম্ভব হল সেই তার প্রশ্ন।

বা রে, সন্ধ্যায় আপনার গান হবে কাছারিবাড়িতে, আজ সকালেই তো ঢোল সহরৎ সারা গোসাবায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিকেলেও আরেকবার ঢোল পেটানোর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন অমরেশবাবু, আপনার গুরু আচার্য বিনায়কও গাইবেন তা জানাবার জন্যে।

ও, তাই এত ভিড়! আমার মাস্টারমশাইয়ের গান শুনলে সত্যি সত্যি সবাই বুঝতে পারবে গান মানুষকে কতটা আনন্দ দিতে পারে।—ডাক্তাব দাসের কথার পিঠে এই মন্তব্য করে নিজেদের শোবার ঘরে চলে যায় অঞ্জনা শিখাকে সঙ্গে নিয়ে। ওদের তৈরি হয়ে আসতে আসতে শৈবাল ততক্ষণ হলঘরের আরামকেদারায় একটু গা মোড়ামুড়ি দিয়ে নেয় বিনায়কবাবু ও ডাক্তার দাসের সঙ্গে গল্প করতে করতে।

অনেক মাতব্বর গোছের লোককেই যেন দেখলাম আসরে!—শৈবালই একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ধূমপানে নিরাসক্ত ডাঃ দাস ও আচার্য বিনায়কের সামনে সিগ্রেটের কৌটা এগিয়ে ধরতে ধরতে প্রথম কথা আরম্ভ করে।

হ্যাঁ, কোনো কর্তা-ব্যক্তিই বোধ হয় বাকি নেই। তবে এখানে রোববারেও তো কাছারি বসে। অফিসাররা প্রায় সবাই একবার

করে কাছারিতে আসেন, ফাইলপত্তর নাড়াচাড়া করেন। কাজ জমে গিয়ে থাকলে কিছু কিছু সেরেও যান। আজও তাই হয়েছে। আজকের কথা অবশ্যি স্বতন্ত্র। কর্তারা আজ হয়তো অফিসের কাজকর্ম তাড়াহুড়ো করে সেরে যে যার বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, আবার সাজ-পোষাক বদলে এক এক করে সবাই ফিরে এসেছেন গান শোনবার জন্যে। ঐ দেখুন, তাঁদেরই সব তদারক করতে লেগে গিয়েছেন অমরেশবাবু আর মুন্সীবাবু।—হলঘরে এসে ছাদের বিধি-ব্যবস্থার দিকে শৈবালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডাঃ দাস।

আপনি বোধ হয় যাকে বলে পুরোপুরি চেন-স্মোকার, তাই না শৈবালবাবু?—হঠাৎ দুম করে এমনি একটা প্রশ্ন করে বসে নিজে থেকেই থমকে যান আচার্য বিনায়ক। তাঁর নিজেরই মনে হয় এরূপ প্রশ্ন তোলা ঠিক হয় নি তাঁর পক্ষে।

হ্যাঁ, চাকরি জীবনে এ একটা মস্ত বদ্‌অভ্যেস করে ফেলেছি মাস্টারমশাই। আর এখন এর হাত থেকে নিস্তার পাবারও কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে আমি একজন পুরোপুরি চেন-স্মোকার?

না, ঠিক জানা বলা চলে না একে, অনুমান করছিলাম।

কি ভাবে?—সিগ্রেটের পোড়া অংশ এ্যাসট্রেতে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে আবার প্রশ্ন করে শৈবাল।

আজকের এই একটি মাত্র দিনের কথা হলেও কোনো সময়ই আপনাকে সিগ্রেটছাড়া অবস্থায় দেখি নি কিনা তাই।

একবারে অবিরাম সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতার মতোই অবিরাম ধূম্রপান প্রতিযোগিতা! কিংবা ঐ রকমের একটা কিছুর মতো, কি বল?—এই বলে বন্ধুর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করে ডাঃ দাস।

তবে আমি কোনো অভ্যেসকেই বদ্‌অভ্যেস বলে মনে করি নে কিন্তু শৈবালবাবু! আমার এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্যে আপনি

কিছু মনে করবেন না যেন।—অনুরোধ জানান মাস্টারমশাই। আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন সাজে এসে শিখাকে নিয়ে তার মা হাজির।

চলুন এবার তা হলে আসরে যাওয়া যাক। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে। সাড়ে পাঁচটা সময় দেওয়া ছিল, এখন ছটা বেজে আট। ঘড়ি দেখে উঠে পড়েন ডাঃ দাস এবং সবাইকে নিয়ে গানের আসরে এসে বসেন।

তার পরে শুধু গান, গান আর গান!

কাল শৈবালের এত অনুরোধেও কোনো গানই যেন মনে আসছিল না অঞ্জনার। গলার স্বর যেন কেবলই আটকে আটকে যাচ্ছিল গাইবার কথা ভাবতে গিয়ে। নেহাত অমরেশবাবু কী মনে করবেন, তাই ভেবেই শেষ অবধি তাকে অবিশ্যি কোনো রকমে একটা গান গাইতে হয়েছে মোটরলঞ্চে বসে সুবিস্তৃত নদী-সঙ্গমের মুক্ত পরিবেশে। কিন্তু অমরেশবাবু তাকে যত বাহবাই দিন না কেন, তার গানের যত প্রশংসাই করুন না কেন, কালকের গানে অঞ্জনা নিজে মোটেই খুশি হতে পারে নি এবং তার জন্যে শৈবালের ওপর সে অমন রেগে গিয়েছিল জোর করে তাকে গান গাওয়ানোয়।

কিন্তু আজ যেন গানের বান ডেকেছে অঞ্জনাব মনের সমুদ্রে। পাঁচ বছর ধরে যত গান সে শিখেছে আচার্য বিনায়কের কাছে তার সবগুলোই যেন একই সঙ্গে সুরাশ্রিত হয়ে প্রবল স্রোতবেগে ভেসে আসতে চায় তার কণ্ঠে।

কিছুক্ষণের জন্যে নিজের মধ্যেই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে অঞ্জনা।

হঠাৎ তার চোখ পড়ে উন্মুখ শ্রোতাদের দিকে। তার গান শোনবার জন্যেই তো এরা সব অধীর হয়ে আছে। তাকে চুপ করে থাকলে চলবে কেন? খেয়াল হতেই আলগোছে হারমোনিয়মটাকে কাছে টেনে নিয়ে সুর বাঁধতে সে লেগে যায় তবলার সঙ্গে। এখানকারই লোক তবলচী। একজন পুরোনো বাজিয়ে, গুণী

লোক। সুর বাঁধতে গিয়েই অঞ্জনা টের পেয়েছে গান খুব ভালই জমবে এর সঙ্গতে। আচার্যের মনও তাতে বেশ উল্লসিত।

'সাধন কর্‌না চাহিয়ে মনয়া ভজন কর্‌না চাই। প্রেম লাগান চাহিয়ে মনয়া প্রীত করনা চাই॥'—মীরার এই ভজন দিয়ে শুরু করে পর পর অনেকগুলো গানই গেয়ে ফেলে অঞ্জনা। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো শ্রান্তি বা কষ্টবোধও যেন নেই তার। এক একটি গানের শেষে প্রচুর হাততালি শেষ হতেই আসর আবার স্তব্ধ নির্বাক। এক একখানা নতুন গান আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি শ্রোতাই যেন একেবারে সমাধিস্থ। ছোট-বড়র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এমনি অবস্থা। বাস্তবিকই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে অঞ্জনার গান শুনে।

আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন আচার্য। এতদিনের ব্যবধানেও বিস্মৃতির বালুচরে যে অঞ্জনার সুরতরঙ্গ একেবারেই চাপা পড়ে যায় নি, সেজন্যেই আরো বেশি আনন্দ তাঁর। অঞ্জনা সারা অন্তর দিয়েই গ্রহণ করেছিল তাঁর শিক্ষাকে এই তার প্রমাণ।

শৈবালেরও খুশির অন্ত নেই। সে ভাবে অঞ্জনার আজকের এ সাফল্যের অনেকখানি কৃতিত্বই তার প্রাপ্য। শিখাকে কোলে বসিয়ে বাপ-মেয়ে দু জনে তারা গান শুনছিল। আনন্দের আতি-শয্যে শৈবাল যে এক একবার তার মেয়েকে আদরে আদরে অস্থির করে তুলছিল সেদিকে চোখ পড়ছিল অঞ্জনার এবং তার হাসিও পাচ্ছিল। ভাবছিল, কাল সে অনেক হাঙ্গামা করে অঞ্জনার লজ্জার বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল বলেই না আজ তার পক্ষে এমনি গলা ছেড়ে গেয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে!

কিন্তু যে যা ভাবে ভাবুক, অন্তর্যামী জানেন আর জানে অঞ্জনা কোন্‌ প্রেরণা রয়েছে তার আজকের সাফল্যের মূলে।

ওস্তাদজী নিজে আর কোনো গান গাইতে চান না অঞ্জনার গানের পর।

আমার গানই তো সার্থক রূপ পেয়েছে অঞ্জনার সুরে। তার পরেও আবার আমায় কেন অনুরোধ করছেন আপনারা ?—আচার্য নিষ্কৃতি পেতে চান এই যুক্তি দেখিয়ে।

কিন্তু নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না তাঁর পক্ষে। অন্তত দুখানা গান গেয়ে তবে তাঁর অব্যাহতি। সবার সমবেত তাগিদ বিশেষ করে শৈবাল আর অমরেশবাবুব পীড়াপীড়িতে ওস্তাদজী যখন গান ধরলেন সভা তখন আবার নীরব নিস্তব্ধ। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে একটি অপূর্ব সুর-ধ্বনি যেন আপনাকে বিছিয়ে চলেছে অতি সন্তর্পণে। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। সভার সব শ্রোতারা নিষ্পলক নিশ্চল মূর্তি যেন এক একটি।

আচার্য বিনায়কেব কণ্ঠে তুলসীদাসের 'মনোয়া ভজনে সীতারাম' গানের পর কখন যে রবীন্দ্রনাথের 'দিন যার ক্লান্ত হল তার লাগি কি এনেছ বর, জানাক তা তব মৃদু স্বর' গানটি আরম্ভ এবং শেষ হয়ে গেল, সেদিকে কোনো খেয়ালই ছিল না শ্রোতাদের। আচার্যেব অপূর্ব সুর-মূর্ছনায় এবং গান দুটির গভীর আবেদনে বাস্তবিকই সবাই যেন আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্যে।

তার পর আসর যখন ভাঙল সারা দিনেব ক্লান্তিতে তখন দলেব প্রায় সবারই ভেঙে পড়ার উপক্রম।

কিন্তু তবুও ছাড়া পাবার উপায় নেই। অতিথিদের জন্যে একটি নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে একবার না গেলে কি চলে! খাওয়াদাওয়া সেরে কোনো রকমে গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে কয়েকটি দৃশ্য দেখে আসতে হবে।

অগত্যা তাই করতে হয় এবং অভিনয় দেখে ঘরে ফিরে এসে শুতে শুতে রাত সাড়ে এগারোটা হয়ে যায়।

নাও আর টু-শব্দটি নয়, চোখ বোজো।—শৈবাল চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফেরে অঞ্জনাকে ঘুমোতে বলে।

বাইরের ঘরের নৈশ-পাহারা হ্যাজাক লাইটটা কালকের মতোই

জ্বলে চলেছে। জ্বলুক। ও তো আর মনের ভেতরটা কিছু দেখতে পাবে না।

চোখ বুজে থাকলেই কি সব সময়ে ঘুম আসে? সবার ক্ষেত্রে সব সময়ে নিশ্চয়ই তা আসে না।

শৈবাল প্রায় সঙ্গে স.ঙ্গই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ঘুমিয়ে পড়া নয়, সে রীতিমত নাক ডাকাতে শুরু করেছে—ঘুমে এমনি সে অচৈতন্য। কিন্তু চেষ্টা করেও অঞ্জনা ঘুমোতে পারছে না। বার বার করে কেবলই তার মনে হচ্ছে আচার্য বিনায়কেব শেষ প্রশ্নটির কথা, যে প্রশ্নের জবাব সে সুযোগ মতো এক সময় দেবে বলে মাস্টারমশাইকে আশ্বাস দিয়েছে।

কিন্তু সে সুযোগ কি সে আর পাবে কোনো দিন? ঘুমোতে গিয়ে উল্টে আরো কঠিন এক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় অঞ্জনাকে। সে প্রশ্নটা আসে তার নিজের মন থে:ক এবং সেই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কথা—অফুরন্ত স্মৃতির মিছিল।

তাঁর দেওয়া হীরের দুলের প্রশংসা করায় অমন করে আমায় অপমান করলেন কেন মাস্টারমশাই?—মনে মনে ভাবে অঞ্জনা। তাঁর উপহারকে ভাল লাগার মানেই তো তাঁকেই ভাল লাগা, কিন্তু আশ্চর্য বিনায়ক ঠিক তার উল্টো অর্থ করে নিলেন, এজন্যে অঞ্জনার সে কী অভিমান! অনেক কষ্টে বুকের কান্নাকে রোধ করে রাখতে হয় তাকে, কিন্তু চোখের জলে তার অজান্তেই বালিশের ওয়াড় ভিজে চলে।

হঠাৎ ঘুমন্ত শিখার সুন্দর মুখখানিকে দেখবার ভারি ইচ্ছে হল অঞ্জনার। বাইরের ঘর থেকে হ্যাজাকের আলোর কিছুটা তারই ওপরে এসে পড়েছে। সেই আলোতেই শিখার স্নিগ্ধ মুখখানি জ্বলজ্বল করে উঠছে অঞ্জনার চোখে।

এই শিখা, এই আমার সোনার শিখা, এ তো শৈবালের মেয়ে না হয়ে ···। না, না, এমন চিন্তাকে আমার কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া

উচিত নয়—অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়।—নিজের ভেতর থেকেই ভীষণ রকমের একটা ধাক্কা খেয়ে বালিশের উপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে অঞ্জনা। তার পরেই ঘুমে একেবারে নিস্তেজ অসাড়।

উল্টো দিকে অমরেশবাবু পাশের ঘরে আচার্য বিনায়কের চোখেও ঘুম নেই। সুযোগ মতো অঞ্জনা তাঁর কথার কী জবাব দেবে বলেছে! কিন্তু কী সে উত্তর হতে পারে তা ভাবতে ভাবতে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে চলেছেন তিনি। তাতে ভারে ভারে আনন্দ-বেদনার অমৃত-গরল উঠছে আর তারই ফলে আচার্য উদ্‌ভ্রান্ত। এমনি অবস্থায় কি আর ঘুমোতে পারে মানুষ?

হঠাৎ এক দিনের একটি বিশেষ ঘটনার স্মৃতি আচ্ছন্ন করে ফেলে আচার্যের মনকে!

একটি গান চমৎকারভাবে শিখেছে অঞ্জনা। সামান্য দোষ-ত্রুটি যা ছিল তা সংশোধন করে শেষবারের মতো সে যখন সেদিন সে গানটি গাইল প্রচুর বাহবা দিলেন তাকে আচার্য বিনায়ক। পিঠ চাপড়ানিতে নুয়ে পড়ে শিক্ষককে প্রণাম নিবেদন করল ছাত্রী এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে খামে আঁটা একখানা চিঠি। চিঠিখানা মাস্টারমশাইয়ের পায়ে রেখে সভয় সলজ্জ কণ্ঠে অঞ্জনা সেদিন দুটি মাত্র কথা বলেছিল তাঁকে—'এ চিঠিখানা এখানে খুলবেন না মাস্টারমশাই, বাড়ি গিয়ে পড়বেন।' এই বলেই বিদায়-কালীন চায়ের কাপটি এনে দিয়ে অঞ্জনা সরে গিয়েছিল। তার পরে যে কাণ্ড ঘটেছিল তা ভেবে শিউরে ওঠেন বিনায়কবাবু। বাস্তবিকই চা খাওয়া শেষ করে কী ভাবে যে তিনি ভুলে অঞ্জনার চিঠিখানা গানের ঘরে ফেলে রেখেই চলে এসেছিলেন সে রহস্যের মীমাংসা তিনি করে উঠতে পারেন নি। রাস্তায় এসে ট্রামে উঠতে যাবার মুখে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল সেই চিঠির কথা। ছুটতে ছুটতে আবার আচার্যকে ছুটে যেতে হয়েছিল অঞ্জনাদের বাড়িতে।

কী হয়েছে মাস্টারমশাই, আবার ফিরে এলেন?—সিঁড়ির মুখে দোতলায় দেখা হতেই অঞ্জনা জিজ্ঞেস করেছিল।

কিছু নয়।—বলে সরাসরি কোণার দিকে গানের ঘরে ঢুকেই চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন মাস্টারমশাই। অন্য কেউ আর টের পায় নি।

কিন্তু কী ভীষণ রকমের কেলেঙ্কারিই না সেদিন হয়ে যেত, যদি অঞ্জনার বিয়ের প্রায় বছর দুই আগে সেদিনের ঐ চিঠিখানা বাড়ির অন্য কারুর হাতে গিয়ে পড়ত!—ভাবতে ভাবতে উঠে বসেন বিনায়কবাবু।

ভাবে ভাষায় আবেগে অপূর্ব সেই চিঠিখানা অতি সঙ্গোপনে নিজের হেফাজতে অনেকদিন রেখে দিয়েছিলেন আচার্য। কিন্তু কবে গিয়ে আবার স্ত্রীর হাতে পড়ে এ ভয়ে নিজের হাতেই একদিন টুকরো টুকরো করে তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন চিঠিখানা।

কিন্তু আচার্য যে বিবাহিত সে কথা তিনি তিন বছর ধরে গোপন রেখেছিলেন কেন অঞ্জনাদের বাড়িতে? এত কাল পরে নিজের মনেই আজ হঠাৎ সে প্রশ্ন জেগে ওঠে। নিজের কাছেই নিজে আবার সন্তোষজনক উত্তর দেন তিনি সে প্রশ্নের।

সে তথ্য প্রকাশের কোনো কারণই ঘটে নি অঞ্জনার সে চিঠি পাবার আগে। কাজেই তা গোপন রাখার কোনো কথাই ওঠে না। অঞ্জনাকে গান শেখাতে আরম্ভ করবার পর বছর পার হবার আগেই ছাত্রীর চালচলন দেখে আচার্য টের পেয়েছিলেন তার মনোলোকের ভাবনা-চিন্তার। আর ক্রমশই যে ছাত্রীর সেই রকমসকম বেড়ে চলছিল তাও তিনি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এক দিন যে অঞ্জনা এমনি এক চিঠির মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে বসবে, এতটা দুঃসাহস যে কোনো দিন অঞ্জনার হতে পারবে বিনায়ক তা স্বপ্নেও ভাবেন নি। বাড়ি পৌঁছে নয়, ট্রামে বসেই সেদিন ঐ চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন

আচার্য। তাঁর মনে হয়েছিল, কোনো কোনো ব্যাপারে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের সাহস বেশি এবং শুধু সাহস নয়, বুদ্ধিও। এবং প্রেমের ব্যাপারে তো বটেই। তবে এ কথাও মনে হয়েছিল, তিনি যে বিবাহিত ঘুণাক্ষরে তার হদিস পেলে অঞ্জনা ওরকম ভুল করত না। এ শুধু মনে হওয়া নয়, সত্যি তাই। কারণ পরদিন গান শেখাতে গিয়ে আচার্য যখন কথাচ্ছলে তাঁর ছাত্রীকে বললেন, 'এক বছর কমাস পর আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে এই কদিন মাত্র আগে ফিরেছেন, তোমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে নিয়ে আসব।' সে কথা শুনে অঞ্জনার প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম, লজ্জায় একেবারে যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিল সে।

তার পর থেকেই ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসতে থাকে অঞ্জনার মধ্যে। তা হলেও তাঁর প্রতি অঞ্জনার শ্রদ্ধাপূর্ণ গভীর ভালবাসার যে অভাব ঘটেছে কোনো দিন এমন কথা কখনো মনে হয় নি আচার্যের।

এই সব পুরনো স্মৃতিই মনের ওপর চাবুক মেরে মেরে বিনায়ককে সারাক্ষণ জাগিয়ে রাখছে, মুহূর্তের জন্যেও দু-চোখের পাতা মিলতে দিচ্ছে না। অঞ্জনার অতীত দিনের মিনতি-মুখর চোখের মণি দুটি আজও যদি আবার তেমনি তাঁর সামনে বার বার জ্বলে জ্বলে ওঠে, তা হলে কী করেই বা ঘুমোবেন আচার্য বিনায়ক?

॥ ৫ ॥

ঠিক রাত তিনটে। ঘড়িতে এলার্ম বাজতেই ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে বসেন অমরেশবাবু। তার পর চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে বেরিয়ে এসে এক এক করে ডেকে তোলেন সবাইকে।

সবাইকে আর কি, বিনায়ক দস্তিদার তো জেগেই কাটিয়েছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ওদিকে রাত দেড়টা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেছে শিখাব। মাকেও জাগতে হয়েছে মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে। তাকে ঘুম পাড়াতে গিয়েই লক্ষ্য করে অঞ্জনা তাঁব আচার্য তখনো পায়চারি করছেন ছাদের ওপব। খুবই দুঃখ লাগে তার মনে। বাইরে ছুটে যেতেও ইচ্ছে হয়। কিন্তু ভয়ও আবার নাড়া দেয় তার মনকে। তার পর থেকে তারও আর ঘুম হয় নি। তাব দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আচার্য যে মনেব দুঃখে আবার তাঁর ঘরে ফিরে গিয়েছেন সে পর্যন্তও অঞ্জনা চুপি চুপি লক্ষ্য করেছে। তার পর আর কিছু জানে না।

সেই নির্বোধ নীরবতার মধ্যে ডাকাডাকি করে সবাইকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হবার তাগিদ দিলেন অমরেশবাবু। বলাই ছিল, ভোর চারটা না বাজতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। অন্ধকার থাকতে গিয়ে জায়গা মতো পৌঁছুতে না পারলে কোনো শিকারই মিলবে না। মোটরলঞ্চেও অন্তত এক ঘণ্টার পথ। কাজেই চারটায় লঞ্চ না ছাড়লে চলবে কেন?

কিন্তু সত্যি সত্যি তা আর হয়ে ওঠে না। তৈরি হয়ে নিতে নিতেই ঘণ্টাখানেক সময় কাটে। তার পর ফেরিঘাটে গিয়ে পৌঁছুতেও তো কিছুটা সময় লাগে। তাই মোটরলঞ্চের যাত্রা শুরু হতে যদি চারটা বেজে সতেরো হয়ে যায় তার জন্যে কাউকেই দোষী করা চলে না। তবু শৈবাল অঞ্জনাকেই এই দেরির জন্যে দায়ী করে।

সাজগোজ করতে করতে সে-ই নাকি বাড়তি সময়টা নষ্ট করেছে। কিন্তু সেটা তো আর অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভবও নয়। তাই সে অভিযোগের কোনো উত্তরই দেয় অঞ্জনা। ভোর রাতের শান্ত আবহাওয়ার মতোই সে চুপচাপ বসে থাকে।

শিখার চোখে তখনো ভীষণ ঘুম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাবার ফল। এতগুলো লোকের হট্টগোলেও শিখা জেগে উঠছে না, আশ্চর্য! লঞ্চে ওঠবার পর তাই মায়ের কোল থেকে নামিয়ে একদিকে বসবার বেঞ্চির এক কোণে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

কিন্তু শীতের রাত, নদীর হাওয়ায় মেয়েটার আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে না তো! গরম পোষাক-পরিচ্ছদে জড়িয়ে ভয় কাটে না অঞ্জনার। নিজের গা থেকে স্কার্ফটা খুলে নিয়ে ভাল করে সে ঢেকেঢুকে দেয় শিখাকে।

এটা কী হচ্ছে! শিখা তো দিব্যি ভালই আছে। ওর ওপর আবার ওটা চাপানো কেন? দমবন্ধ হয়ে যাবে যে! তা ছাড়া নিজেরও হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে সে খেয়ালটাও থাকা উচিত।—শৈবাল এই বলে প্রকারান্তরে সাবধান করে স্ত্রীকে।

কিছুই হবে না। লোনা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই কোনো। সুন্দরবনে ভয় শুধু বাঘ-ভালুকের আর হাঙর কুমীরের। আর কিছুর নয়।—অমরেশবাবুর আশ্বাসে স্বস্তি পায় সবাই।

বাঘের কথাই আগে বলুন শুনি।—বাঘের নামে উল্লসিত হয়ে ওঠে একমাত্র শৈবাল।

শুধু বাঘের কেন, সুন্দরবনের কুমীরের কাহিনীও জানবার মতো। বরং আমার মতে কুমীরদের বলা যায় এ অঞ্চলের আদি কুলীন।

সে আবার কেমন?

তাই বলছি, শুনুন। সুন্দরবনে আগে তো আর কোনো মানুষের বাস ছিল না। কাজেই মানুষ যে তাদের খাদ্য হতে পারে

এ ধারণাই ছিল না এখানকার বাঘদের। বনের শূয়র আর হরিণই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। শুধু বাঘদের নয়, কুমীরদেরও।

সে কি রকম কথা?—বিস্ময় প্রকাশ করেন আচার্য বিনায়ক।

হ্যাঁ, তাই। এবং তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কয়েক শ বছর আগে সুন্দরবনের জমি এতটা উঁচু ছিল না। মাঝে মাঝেই বান এসে ডুবিয়ে দিত সারা অঞ্চল। আর হরিণ-শূয়র জাতীয় পশুগুলো বেশির ভাগই কুমীরের পেটে চলে যেত। যে কোনো বন্যপশু শিকারে বাঘদের কিছুটা দৌড়োদৌড়ি বা শ্রমস্বীকার করতে হত। কিন্তু বানের সময় খাদ্য সংগ্রহে কুমীরদের কোনো রকম কষ্টই করতে হত না। কি জীবিত কি মৃত অসংখ্য হরিণ-শূয়র ইত্যাদি জীবজন্তু ভোজ্যবস্তু হিসেবে আপনা থেকেই ভেসে ভেসে আসত তাদের মুখের সামনে। এ তাদের কৌলীন্যের নমস্কারী ছাড়া আর কি!

ঠিকই বলেছেন কর্তাবাবু, কুমীরমশাইরাই আমারগো এই রাজ্যের আসল কুলীন।—বুড়ো সারেঙ বৈরাম অমরেশবাবুকে সমর্থন জানিয়ে মন্তব্য করে।

কেন, সুন্দরবনের শূয়র বা হরিণের মতো বাঘরা কখনো ভেসে যেত না বন্যায়?—এই বিচিত্র জিজ্ঞাসাও আসে অঞ্জনার তরফ থেকে। তার ধারণা বাঘ যদি জীবিত অবস্থায় বানে ভেসে যেত তা হলে বাঘে-কুমীরে অন্তত মাঝে মাঝে বেশ লড়াই হত।

তা সাধারণত হত না। তার কারণ, বাঘের নখ থাকার সুবিধে। বেশি জলে দাঁড়াবার উপায় না থাকলেও আগের দিনে বানের সময় নখ দিয়ে হেলানো গাছ আঁকড়ে ধরে বা তার ওপরে উঠে কোনো রকমে বেঁচে থাকত তারা। একালেও বন্যার সময় তারা তাই করে। তবে এখন জমি উঁচু হয়ে যাওয়ায় আগের মতো আর ঘন ঘন বন্যা হয় না। কিন্তু সে-যুগে পর পর এক একটা বড় বড় প্লাবনের শেষে ভারি অসুবিধেয় পড়তে হত তাদের।

সেই অসুবিধে কি করে কাটিয়ে উঠত তারা?—এবারও প্রশ্ন করে অঞ্জনা।

এমনি অবস্থায় পড়ে খাদ্য সম্বন্ধে যা হোক একটা গবেষণা না আরম্ভ করে আর উপায় কি? আশপাশে তখন এমন কোনো জনবসতিও ছিল না যে, মাঠময়দানে গিয়ে সেখান থেকে মাঝে মাঝে দু-চারটে করে গৃহপালিত পশু বা এক-আধটা করে মানুষ শিকার করে নিয়ে আসবে।

তাই তো, ঠিক বলেছেন কর্তামশাই। সেই আমলে কি আর মানুষ থাকত নাকি এই সুন্দরবনে!—বুড়ো সারেঙ আরেকবার তার সমর্থন জানায় অমরেশবাবুকে।

অগত্যা বাধ্য হয়েই সুন্দরবনের বাঘবা প্রথমে শুরু করল গোসাপ জাতীয় জলজন্তু আহার করতে। কিন্তু এত সামান্য আহারে বাঘের আগুনে-খিদের নিবৃত্তি হয় কখনো! তাই কিছুদিন বাদেই নতুন খাদ্যের গবেষণায় আবার মশগুল হয়ে ওঠে সুন্দরবনের বাঘের দল।

এই যা দেখছি, পশুজগতেও ডক্টরেট বিতরণের একটা ব্যবস্থা করে ফেললে মন্দ হয় না বোধ হয়।—হাসতে হাসতে বলে শৈবাল।

একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয় শৈবালবাবু, এ বিষয়টা সত্যি সত্যি ভারি ইন্টারেস্টিং।—অমরেশবাবুর এ জবাবের পর আর ব্যঙ্গ-কৌতুক চলে না। সেই আবহাওয়া ভেঙে দিয়ে আচার্য বিনায়ক গুরুগম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন বাঘদের শেষবারের গবেষণার ফলাফল।

এবারের গবেষণায় কোন্ জাতীয় আহার আবিষ্কার করল বাঘরা?

অমরেশবাবু বললেন, মানুষ।

গোসাপের পরেই একেবারে মানুষ! মাঝামাঝি আর কিছু

নেই ?—আর যেন প্রশ্ন না করে থাকতে পারে না অঞ্জনা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে শুধু শুনেই যাচ্ছিল। আর তার লক্ষ্য শিখার দিকে, কখন আবার মেয়েটার ঘুম ভাঙে।

গোটা বিষয়টি এবার বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন অমরেশবাবু। তিনি বললেন, হ্যাঁ, মানুষ ছাড়া আর কি! মানুষ ছাড়া আর যা কিছু জীবজন্তু তার প্রায় সবই তো আগে থেকেই বাঘের খাদ্য। তবে মানুষ দেখলে সুন্দরবনের যে বাঘ আগে ভয়ে পালিয়ে যেত, তারা যখন একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে আর মানুষ শিকার করা যে কত সহজ তা বুঝতে পারলে তখন আর তাদের পায় কে? ভয় ভেঙে যাবার পর এমন কি ছোট ছোট বাঘের বাচ্চারাও তাদের মায়েদের সঙ্গে গিয়ে মানুষ শিকারের শিক্ষা নিতে লাগল।

তাই নাকি?—বাঘের কাহিনী শুনতে শুনতে চোখের তারা দুটো যেন বড় হয়ে ওঠে অঞ্জনার। সেই বড় বড় চোখেই সে একবার তাকায় তার আচার্যের দিকে এবং জিজ্ঞেস করে অমরেশবাবুকে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এমনি করেই সুন্দরবনের সমস্ত বাঘই নরখাদক হয়ে ওঠে। এখন মানুষই হল তাদের প্রধান ও প্রিয় খাদ্য।

কিন্তু সুন্দরবনে তো আর একটি দুটি বাঘ থাকে না বা থাকত না। তা ছাড়া তেমন লোকবসতিও যখন ছিল না সুন্দরবনে, এত বাঘের জন্যে তখন বিপুল পরিমাণ নরমাংসের খোরাক জুটত কোত্থেকে ?—জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে ওঠে শৈবাল।

কেন, সুন্দরবনে আগে লোকবসতি ছিল না বটে, তবে লোকের আনাগোনা সেখানে মোটেই নতুন নয়। মধু সংগ্রহের জন্যেই তো রোজ কত লোক আসে এই সুন্দরবনে! এ শুধু আজকের কথা নয়, বহুকাল ধরেই এ কাজ চলে আসছে। এ ছাড়া কাঠুরে ও জেলে শ্রেণীর লোকেরা তো আছেই। এরাই দীর্ঘকাল ধরে রয়াল বেঙ্গল টাইগারদের নরমাংসের খিদে মিটিয়ে আসছে এবং মানুষের রক্তের

স্বাদের আকর্ষণ যে কী ভয়ঙ্কর সুন্দরবনের বাঘ এদের কাছ থেকেই প্রথম তা বুঝতে পেরেছে।—নিশ্চলভাবে অমরেশবাবুর মুখে এতক্ষণ বাঘের গল্প শুনে যেতে থাকলেও 'নরমাংস' এবং 'মানুষের রক্তের স্বাদ' ইত্যাদি কথাগুলো কানে আসতেই হকচকিয়ে ওঠে অঞ্জনা, ভয়ে একেবারে যেন জড়সড় হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, আতঙ্কিত সুরে বলেই ফেলে—থাক অমরেশবাবু, বাঘ-টাগ দেখবার আর দরকার নেই, বরং ফিরেই চলুন। আপনার কথাবার্তা শুনে আর ভরসা পাচ্ছি নে। কে জানে কোথায় কোন্ ঝোপঝাড়ে আবার রয়াল বেঙ্গল টাইগার লুকিয়ে আছে, ঘাড়ের ওপর হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো খতম! দরকার নেই বাবা, আর আমার দেখার সখ নেই।

সে কি মা, গল্প শুনেই এত ভয়! বাঘের চেয়ে মানুষ বড় কম যায় না হিংস্রতায় এ কথা মনে রাখলে ভয় অনেকটা কেটে যাবে দেখবেন। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, ক্রমে ক্রমে সাহস বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের বাঘ ইদানীং আশপাশের গ্রামাঞ্চলে গিয়েও হামেশাই হানা দিচ্ছে। মানুষ পেল তো ভাল, আর না পেল তো গোরু-বাছুর নিয়েই দে চম্পট! সেই দুঃসাহসই ধীরে ধীরে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আজকাল এমন সব ঘটনা ঘটছে যা সহজে বিশ্বাস করাটাই মুশকিল।

কী রকম, বলুন না তেমন দু-একটা কাহিনীই শোনা যাক!

মনের বাঘ পালিয়েছে তা হলে। নিজেকে কিছুটা সামলে নিতে পেরেছ দেখছি। বহুত আচ্ছা!—কিঞ্চিৎ খোঁচা দিয়ে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত আচার্য বিনায়ক বাহবাই দেন তাঁর ছাত্রীকে। অঞ্জনার সঙ্গে অমরেশবাবুর আলোচনার গতি তাঁর মনকেও কিছুটা চঞ্চল করে তুলেছিল যে!

ঠিক এই সময়েই শিখা পাশ ফিরে শোয়। অঞ্জনা তার পাতলা ঘুমকে নিবিড় করে তোলার চেষ্টা করে আস্তে আস্তে পিঠ

চাপল্যে। একটু বাদেই অমরেশবাবু আবার তাঁর গল্প বলা আরম্ভ করেন।

এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল। রাজ্যপাল দলবল নিয়ে এসেছিলেন সুন্দরবনে বেড়াতে। মাঝনদী থেকে হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একজন জেলে মারা পড়েছে বাঘের হাতে।

কী করে মারা পড়ল?—শৈবাল জিজ্ঞেস করে।

অনেকগুলো মাছধরা নৌকো নদীর এদিক-ওদিক রাত থেকে ছড়ানো ছিল। একটিমাত্র জেলে-নৌকো নোঙর করেছিল একটা খাড়ির মধ্যে। নিয়মমতো কিছু খেয়েদেয়ে মাছধরা শুরু করা হবে সকালবেলা, সব ব্যবস্থাই ঠিকঠাক। সেই ব্যবস্থা মতোই সকালে খাওয়া সেরে নোঙরের দড়ি খুলে আনতে খাড়ির একপারে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি জোয়ান ছেলে।

তার পর?—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে অঞ্জনা।

তার পর দড়ি খুলে আনতে গিয়ে যেই সে একটু মাথা উঁচু করেছে আর অমনি কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। হাত-পা নাড়বার কিংবা ডাকাডাকি করবার কোনো সুযোগই পায় নি ছেলেটি। আক্রমণকারী বাঘ সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘাড় মটকে ফেলেছে আর সঙ্গে সঙ্গেই তার ভবলীলা শেষ।

কী সাংঘাতিক ব্যাপার!—অঞ্জনার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শুনে। ভয়ে ভয়ে তবু সে জিজ্ঞেস করে, ওর সঙ্গী-সাথীরা কোনো চেষ্টাই করল না ছেলেটাকে বাঁচবার জন্যে?

তা করেছিল বৈ কি! সঙ্গীরা সব বিপদ টের পেয়েই হৈ-হল্লা করে বাঘটাকে তাড়া করার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কে কাকে ভ্রূক্ষেপ করে! সুন্দরবনে যারা আসে তাদের সকলের রীতিনীতি এবং স্বভাবচরিত্র সবই বাঘদের জানা। আর জানা বলেই বাঘটিও সকাল বেলার নিশ্চিত আহারের আশায় ঠিক জায়গা মতো এসেই

একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছিল। তার পর শিকার যখন জুটে গেল তখন জেলেদের চেঁচামেচি আর কে পরোয়া করে? নবাবী মেজাজে আরেকটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে ব্যাঘ্র মহানন্দে প্রাতরাশ সমাধা করে গহন সুন্দরবনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তার খোঁজ পাওয়া চারটিখানি কথা! প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে রাজ্যপালের দলবল এসে আধ-খাওয়া মানুষের লাশটাকে উদ্ধার করেছিল বটে, কিন্তু তারাও ঐ বাঘটার আর কোনো হদিসই করতে পারে নি। মাটিতে রক্তের দাগ ধরে ধরে বন্দুক নিয়ে তারা অনেক দূর অবধি এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোনো ফলই হয় নি তাতে—সব বৃথা!

বাঘ, বাঘ, বাঘ!—হঠাৎ চিৎকার করতে করতে উঠে বসে শিখা।

সেই গোসাবায় এসে পৌঁছনো থেকে বার বার বাঘের কথা শুনে শুনে শিশুমনে একটা প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে হয়তো। তাই শিখা এমনি আচমকা চিৎকার করতে করতে উঠে বসেছে। তা ছাড়া তার কাছে বসেই তো প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে অমরেশবাবু অনবরত বাঘের গল্পই করে চলেছেন। ঘুমের মধ্যে সেই সব কথা বাচ্চা মেয়ের কানে গিয়ে থাকবে হয়তো। এ তারও জের হতে পারে। আর নয়তো স্বপ্ন দেখেই জেগে উঠেছে।

ভোরও হয়েছে। সুন্দরবনের নদীতে লঞ্চ বা নৌকোয় বসে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখতে চমৎকার! ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান সেরে সূর্যদেব যেন নদী থেকেই আকাশ বেয়ে ওপরে উঠছেন। আরেকটু পরে শিখার হয়তো এমনিতেই ঘুম ভাঙত।

আচ্ছা, ঐ গাছটার তলায় বাঘের পিঠে ঐ দেবতাটি কে?—চা-পর্ব শেষ করে মনটাকে একটু ঘুরিয়ে নেবার জন্যেই হয়তো বাইরের দিকে একবার তাকিয়েছিলেন বিনায়ক। মনের সঙ্গে একটু-আধটু জোর-জবরদস্তিও করতে হচ্ছিল তা নিয়ে। তারই মধ্যে হঠাৎ জঙ্গলে একটা দেবমূর্তি চোখে পড়তেই সেই দেবতার পরিচয় জানতে চাইলেন তিনি অমরেশবাবুর কাছে।

ইনি বাঘেরই দেবতা দক্ষিণ রায়। বাঘের হাত থেকে রেহাই পাবার আশাতেই এ দেবতার পুজো দেয় স্থানীয় লোকেরা। জেলে কাঠুরে আর যারা মধু নিতে আসে সুন্দরবনে, তারা সবাই এ দেবতাকে স্মরণ করেই তাদের দিনের কাজ আরম্ভ করে।—বিচিত্র এই দেবতার পরিচয় পেয়ে দলের সবাই খুশি। বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও একটা আছে তা হলে!

তা হলে আমাকেও দেখছি দক্ষিণ রায়কে একটা প্রণাম জানিয়েই বন্দুক ধরতে হচ্ছে। এই বলেই বন্দুকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শৈবাল। এগিয়ে যায় সামনের দিকে। নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ থাকতে বলে সবাইকে।

মুখ বুজে সবাই গিয়ে শৈবালের পাশে দাঁড়ায়, শুধু অঞ্জনা আর তার মাস্টারমশাই ছাড়া। শিখাকে নিয়ে ব্যস্ত অঞ্জনা। খাওয়ানোর জন্যেই তাকে জাগাতে হয়েছে। অঞ্জনাকেও তাই লঞ্চের ভেতরেই থাকতে হচ্ছে। তা ছাড়া শিকার দেখে শিখার ভয়ও লাগতে পারে। তাই শৈবাল নিজেই তাকে বারণ করে দিয়েছে, শিখাকে নিয়ে সে যেন লঞ্চের ভেতর থেকে বাইরে না আসে।

বিনায়কও বেরোন নি গোলাগুলির কারবার তাঁর মোটেই ভাল লাগে না বলে। অন্তত সে কথাই তিনি সবাইকে জানিয়েছেন। অঞ্জনা অবশ্য তা বিশ্বাস করে নি। কারণ সে বেশ ভাল করেই বুঝে নিয়েছে এ তার আচার্যের মনের কথা নয়। আচার্যের অন্তর-লোকে যে ঝড় শুরু হয়েছে তার প্রচণ্ডতায় অঞ্জনারও যে ভেঙে পড়ার উপক্রম! দশ দিক থেকে বিশ বাহুতে রাবণ জড়িয়ে ধরেছিল সীতাকে। তারও প্রায় সেই অবস্থা। সীতা কী ভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন সীতাই জানেন, কিন্তু সে কী করবে? অঞ্জনা গভীর ভাবে ভাবছিল।

শৈবাল তাক করে। বুকের কাছে তুলে ধরে সে বন্দুকটাকে। কিন্তু শিকার কোথায়? কারুর চোখে কিছু পড়ছে না যে!

মৃত্যুর মতো স্তব্ধ পরিবেশ। মুখ ফুটে টুঁ শব্দটিও করছে না কেউ। শৈবালের লক্ষ্যের দিকেই আর সবার দৃষ্টি। কিন্তু বিনায়কের? তাঁর চিন্তা বইছে অন্য খাতে, দৃষ্টিও তাই অন্য দিকে।

গুড়ুম! বন্দুকের মুখে অকস্মাৎ আগুন জ্বলে ওঠে।

শৈবাল ফায়ার করে। কিন্তু গুলি তার লক্ষ্যভ্রষ্ট।

প্রকাণ্ড একটা ডোরাকাটা বাঘ প্রচণ্ড গর্জন করে ছুটে পালিয়ে যায় একটা কাঁটা ঝোপ থেকে আর একটা কাঁটা ঝোপে। দলের প্রায় সকলেরই বাঘটাকে চোখে পড়ে এক লহমার জন্যে।

গুলি হয়তো লেগেও থাকতে পারে। বাঘটার দৌড়বার ভঙ্গি দেখে সন্দেহ করেন অমরেশবাবু।

ভীষণ উত্তেজনায় সবাই নেমে পড়ে জালিবোট বেয়ে। সকলের হাতেই লাঠিসোটা। অংশুর হাতে একটা সেকেলে বন্দুক। তা হোক, খেলনা বন্দুককেও বাঘ নাকি কিছুটা ভয় পায়।

গুলি ছুঁড়েই একটু দেখে নিয়ে লঞ্চ থেকে জালিবোটে এবং জালিবোট থেকে তীরের মাটিতে সব চেয়ে আগে লাফিয়ে পড়ে শৈবাল। কিন্তু একা তো আর তাকে এগুতে দেওয়া যায় না। তাই অমরেশবাবুর ডাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-ছোকরারা সবাই শৈবালকে অনুসরণ করে।

গুলির শব্দে কী ভয়ঙ্করভাবেই না বুকটা কেঁপে উঠেছিল অঞ্জনার। ভয়ত্রস্ত শিখাকে দু হাতে সে চেপে ধরেছিল সেই বুকে। সেই অবস্থায় ভয়ে শিখা চোখ বুজেছিল অনেকক্ষণ। ভয় কাটলে সে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

যান, আপনিও যান। তা নইলে কী মনে করবেন ওঁরা?— অঞ্জনা বলে তার মাস্টারকে।

কিন্তু কোনো কথাই যেন কানে যায় না বিনায়কের। পুতুলের মতোই নির্বাক আচার্য। চোখ দুটো তার দপদপ করে জ্বলছে দুটো আগুনের গোলার মতো।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়।

অঞ্জনা!—কামনা-কাতর কণ্ঠে হঠাৎ ডাকেন আচার্য বিনায়ক। দিগ্বিদিক জ্ঞানহারার মতো তক্ষুনি দাঁড়িয়ে উঠে জড়িয়ে ধরতে যান অঞ্জনাকে।

মা, ঐ যে বাঘ, প্রকাণ্ড বাঘ!—ঠিক সেই মুহূর্তেই জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে ওঠে শিখা। আচার্যও চমকে ওঠেন শিখার চিৎকারে। তাঁর উদ্যত হাত দুখানা আপনা থেকেই নেমে আসে নিস্তেজ হয়ে যায়।

বাঘ, কৈ কোথায়!—আচার্য নির্বাক বিস্ময়ে একবার এদিক-ওদিক তাকান।

অঞ্জনা এগিয়ে যায় জানালার কাছে মেয়ের ডাক শুনে।

বাঘ নয় রে বোকা মেয়ে, এগুলো হরিণ।

মা, দেখব! হরিণগুলো একটু আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। সেগুলো দেখবার জন্যে আবদার ধরে শিখা।

মেয়ের সে আবদার রক্ষা করার জন্যেই অঞ্জনা লঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যায় শিখাকে নিয়ে।

আচার্যও যান তাদের পিছে পিছে।

একেবারে পাড়ে নেমে এসে হরিণ তিনটিকে জল খেতে দেখে ভারি আনন্দ শিখার। মানুষ দেখতে পেয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গিয়েছিল ওরা। বেশ খানিকটা ঘুরে এসে অনেকটা দূরে জল খেতে নেমেছে। ভেবেছে আর কেউ ওদের দেখতে পাবে না। মানুষকে ওদের ভীষণ ভয়!

হরিণ কটা মনের আনন্দে জল খাচ্ছে।

জানেন মা, এগুলোকে বলে চিতল হরিণ। তেষ্টা পেয়েছে, বাচ্চাটাকে নিয়ে বাপ-মা এসেছে তেষ্টা মেটাতে।—বুড়ো সারেঙ বলে।

কোন শিকারীর অব্যর্থ গুলিতে হয়তো একদিন খান খান হয়ে

যাবে এই বনহরিণীর সুখের সংসার!—অনেকটা যেন নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ অঞ্জনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই ছোট্ট কথাটি।

কিন্তু আমি তো শিকারী নই, আমি যে সুরকার! জীবন-শিল্পী!—চমক ভাঙে বিনায়কের।

আমাকে লক্ষ্য করেই কি এ কথা বললে অঞ্জনা?—সন্দেহের দোলা লাগে আচার্যের মনে। দাঁড়িয়ে থাকার মতো পায়ে আর শক্তি পান না তিনি। ধপাস করে বসে পড়েন। তাঁর মনে হতে থাকে শৈবালের গুলিটা যদি তাঁর বুকে এসে লাগত তা হলেই যেন ভাল হত। এ কি তিনি করতে যাচ্ছিলেন! তিনি না শিল্পী? লজ্জায় যেন মরে যান আচার্য।

মাস্টারমশাই!—অঞ্জনা ছোট্ট গলায় ডাকে তার আচার্যকে। কণ্ঠস্বরে তার গভীর সহানুভূতি।

অঞ্জনা!—আরো নিচু গলায় উত্তর দেন বিনায়ক। কিন্তু আর কোনো কথাই যেন মুখ থেকে বেরোয় না তাঁর। তবু আরো কত কথা তাঁর বলার সাধ। বলতে গিয়ে বার বার তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসে।

বলুন মাস্টারমশাই, বার বার থেমে যাচ্ছেন কেন?—ছলছল চোখে অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে।

বলব, তুমি শুনবে অঞ্জনা? জান, আমার দীপ্তি আর নেই!

কিন্তু আমিও যে আজ পুরোপুরি আরেকজনের মাস্টারমশাই। —গভীর বেদনা-কাতর কণ্ঠে এ উত্তরটুকু দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অঞ্জনা। সে-ই তো একদিন মন-প্রাণ উজাড় করে দিতে চেয়েছিল বিনায়ককে। তখন তার জানা ছিল না যে বিনায়ক বিবাহিত। আচার্য তখন তাই কেবলই এড়িয়ে চলতেন তাকে। শেষ পর্যন্ত অঞ্জনা তার চিঠির উত্তরে জানতে পেরেছিল তার আসল কারণ।

দু জোড়া চোখই তখন অশ্রুসজল। শিখা তখনো হরিণ

দেখায়ই মত্ত। বাচ্চা কেমন লাফিয়ে যাচ্ছে তার বাপ-মার সঙ্গে তাই দেখছে।

শৈবাল সদলবলে বন থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে খালি হাতে। মনে মনে সে ধিক্কার দেয় তার ৪৭৫ ম্যাগনাম বন্দুকটাকে।

এর পর সেদিন আর কোনো শিকারই জমে নি। ওরা ফিরে আসে।